বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম

ভূগোল ও পরিবেশ - ৪

বাংলাদেশ ভূগোল ও সংখ্যাতাত্ত্বিক ভূগোল

(Geography of Bangladesh & Techniques in Geography)

কোর্স কোড: BGE 5304

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম

ভূগোল ও পরিবেশ -৪

বাংলাদেশ ভূগোল ও সংখ্যাতাত্ত্বিক ভূগোল

(Geography of Bangladesh & Techniques in Geography)

রচনায়

ফারজানা হোসেন
প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক (ভূগোল ও পরিবেশ), বাউবি

ড. মোঃ আবু হানিফ শেখ
অধ্যাপক
ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড.মোঃ শহীদুল ইসলাম
অধ্যাপক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. কে মওদুদ এলাহী
অধ্যাপক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সায়মা আহমদ
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাউবি

কোর্স সমন্বয়কারী ও রচনাশৈলী সম্পাদক
সায়মা আহমদ
সহকারী অধ্যাপক (ভূগোল ও পরিবেশ), বাউবি

বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম

ভূগোল ও পরিবেশ - ৪

বাংলাদেশ ভূগোল ও সংখ্যাতাত্ত্বিক ভূগোল

(Geography of Bangladesh & Techniques in Geography)

(সকল সত্ব বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ : ২০০৭
দ্বিতীয় প্রকাশ : ২০১৩
তৃতীয় প্রকাশ : ২০১৪
চতুর্থ প্রকাশ : ২০১৫
পঞ্চম প্রকাশ : ২০২০

কভার ডিজাইন
মাসুদ মাহমুদ মল্লিক

কভার গ্রাফিক্স
আবদুল মালেক

অক্ষর বিন্যাস ও পেইজ লে-আউট
মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম সরকার

প্রি-প্রেস কার্যক্রম
ডিটিপি পুল, পিপিডি বিভাগ,বাউবি

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রন ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রন
মাস্টার সিমেক্স পেপার লিমিটেড
৬৫/২/১, বক্স কালভার্ট রোড
পুরানাপল্টন, ঢাকা-১০০০।

ISBN 984-34-1058-0

প্রিয় শিক্ষার্থীগণ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল পরিচালিত বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ পর্যায়ে আপনারা যারা কোর কোর্স হিসাবে মানবিক ভূগোল ও পরিবেশকে নির্বাচন করেছেন তাদের জ্ঞাতার্থে কিছু তথ্য, নিয়ম ও করণীয় জানিয়ে দিচ্ছি।

ভূগোল ও পরিবেশ বর্তমান আধুনিক যুগের জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী বিষয়। এর আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়সমূহ এবং ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের প্রপঞ্চ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রত্যেক ভূগোল শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন। একইভাবে ভূগোলে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশলের প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষিতে জরুরি।

বাংলাদেশের ভূগোল ও সংখ্যাতাত্ত্বিক ভূগোল বইটির দুটি অংশে বাংলাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয়াদি এবং ভূগোলে সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশলের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম খন্ডের ১ম ইউনিটে বাংলাদেশের অভ্যূদয় এবং ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু আলোচনা করা হয়েছে। ইউনিট-২ এ বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা এবং বন্যার উপর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। ইউনিট-৩ এ আপনারা বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রাকৃতিক বনজ এবং খনিজ সম্পদ সম্পর্কে ধারণা লাভের পাশাপাশি শিল্প, যাতায়াত এবং বাণিজ্য বিষয়ে ধারণা লাভ করবেন।

সংখ্যাতাত্ত্বিক ভূগোল অংশের ১ম ইউনিটে ভৌগোলিক তথ্য এবং তার প্রকারভেদসহ তথ্যের বিভিন্ন উৎস ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। ইউনিট-২ এর আলোচনায় স্থান পেয়েছে- তথ্যের একক ও শ্রেণীবিভাগ, তথ্য শ্রেণীকরণ এবং গণসংখ্যা নিবেশন ও তার প্রস্তুত প্রণালী। ইউনিট-৩ এর পাঠসমূহে মূলত: তথ্যের মধ্যগামিতা ও তার পরিমাপক হিসেবে চলক, মধ্যমা এবং যোজিত গড়ের নির্ণয় পদ্ধতি ও ব্যবহার আলোচনা করা হয়েছে। তথ্যের বিস্তার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে ইউনিট-৪ এর পাঠসমূহে। এখানে সাধারণ বিস্তৃতির পরিমাপসমূহ, আপেক্ষিক বিস্তৃতির পরিমাপসমূহ এবং বিস্তারের আকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইউনিট-৫ এর দুটি পাঠে যথাক্রমে সহসংস্রব এবং নির্ভরণ আলোচিত হয়েছে। শেষ ইউনিটে তথ্যচিত্র, প্রতীক এবং ভূগোলে কম্পিউটারের ব্যবহার বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের ভূগোল ও সংখ্যাতাত্ত্বিক ভূগোল বইটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত হয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতির বইয়ের চেয়ে এখানে পাঠসামগ্রী ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনের এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এখানে পাঠ্যপুস্তক এক সাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে হয়। এ কারণেই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বোঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে এই বই পড়ে পাঠ সহজে আয়ত্ব লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল:

১। এই বই এর প্রথম অংশে ৪টি এবং দ্বিতীয় অংশে ৬টি ইউনিট আছে এবং প্রতিটি ইউনিটে কয়েকটি করে পাঠ আছে।

২। প্রতিটি ইউনিট শুরুর আগে এ ইউনিট এর পাঠগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া আছে।

৩। প্রতিটি পাঠে প্রথমেই পাঠের শিরোনাম রয়েছে, এরপর ঐ পাঠ শেষে যা জানা যাবে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৪। এর পরে পুরো পাঠ, বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে ভাগভাগ করে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫। বর্ণনা অংশের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়ন অংশে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে নিজের শিক্ষণকে (Self Assesement) পরীক্ষা করে নিতে পারবেন। যদি উত্তরটি ঠিক মত আয়ত্ব না হয় তবে ঐ অংশটুকু আবার পড়ে বিষয়টি নিজের আয়ত্বে আনতে সক্ষম হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন অংশটুকু পুরোপুরি নিজেকে পরীক্ষা নেয়ার মত। এই অংশে তিনভাবে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা আছে-

ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন (MCQ): ছোট ছোট টিক (√) চিহ্ন, শূন্যস্থান পূরণ, সত্য/মিথ্যা, হ্যাঁ অথবা না প্রভৃতির মাধ্যমে যাচাই।

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: ঐ পাঠের উপর কিছু এক/দুই লাইনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

গ) রচনামূলক প্রশ্ন: ঐ পাঠের জন্য প্রযোজ্য রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে যাচাই।

৬। বর্ণনা অংশ শেষে পাঠ সংক্ষেপে ঐ পাঠটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরা হয়েছে।

৭। প্রতিটি ইউনিটের শেষে উক্ত ইউনিটের পাঠসমূহের সব নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরগুলো দেয়া আছে। যার মাধ্যমে সে তার প্রতিটি পাঠের উপর দেয় পরীক্ষার যাচাই নিজে করে নিজেই ফলাফল জানতে পারবে।

৮। অবশেষে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি দেয়া আছে। এর মাধ্যমে যে তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বইগুলোর সহায়তা নিতে পারবে। বইটি লেখার ক্ষেত্রেও বই বইগুলোর সাহায্য নেয়া হয়েছে।

৯। বইটি পড়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হলে টিউটোরিয়াল কেন্দ্রের টিউটরের (শিক্ষকের) সহায়তা নিন। তবে মনে রাখবেন আপনি দূরশিক্ষণের একজন শিক্ষার্থী, এই বইটি আপনার বড় শিক্ষক। এই বই-ই আপনার সকল জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে। কাজেই আশাকরি বইটি আপনাকে পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিতে সহায়তা করবে। মনে রাখবেন বাজারের কোন নোট বই নয়, বরং এই বই এবং এতে উল্লেখ আছে এমন বই-ই আপনি পড়বেন।

➢ কোর্স সমন্বয়কারী

বাংলাদেশ ভূগোল

সূচিপত্র

ইউনিট-১	**:**	**বাংলাদেশ ঃ একটি সমীক্ষা**	**১**
পাঠ-১.১	:	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি	২
পাঠ- ১.২	:	বাংলাদেশের ভূসংস্থান	৯
পাঠ-১.৩	:	বাংলাদেশের জলবায়ু	১৬
পাঠ-১.৪	:	বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন	২৪
উত্তরমালা	**:**	**ইউনিট-১**	**২৮**
ইউনিট-২	**:**	**বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা**	**২৯**
পাঠ-২.১	:	বাংলাদেশের নদ-নদী ব্যবস্থাঃ একটি প্রেক্ষিত	৩০
পাঠ-২.২	:	গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা	৩৭
পাঠ-২.৩	:	ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা	৪১
পাঠ-২.৪	:	মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা	৪৫
পাঠ-২.৫	:	বাংলাদেশে বন্যা	৫২
উত্তরমালা	**:**	**ইউনিট-২**	**৫৯**
ইউনিট-৩	**:**	**বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সম্পদসমূহ**	**৬১**
পাঠ- ৩.১	:	বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি	৬২
পাঠ- ৩.২	:	বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শস্যসমূহ	৬৫
পাঠ- ৩.৩	:	কৃষিক্ষেত্রের সমস্যা ও প্রতিকার সমূহ	৭০
পাঠ- ৩.৪	:	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ	৭৪
পাঠ- ৩.৫	:	বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ	৭৭
পাঠ- ৩.৬	:	বনজ সম্পদ	৮২
পাঠ- ৩.৭	:	মৎস্য সম্পদ	৮৮
পাঠ- ৩.৮	:	শিল্প	৯৪
পাঠ- ৩.৯	:	বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও বাণিজ্য	১০১
উত্তরমালা	**:**	**ইউনিট-৩**	**১০৮**
গ্রন্থপুঞ্জি	**:**		**১০৯**

সংখ্যাতাত্ত্বিক ভূগোল
সূচিপত্র

ইউনিট-১: তথ্যের উৎস ---------- **১১১**

পাঠ-১.১: তথ্য এবং তথ্য উৎস ---------- ১১২

পাঠ-১.২: প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য -২ ---------- ১২২

পাঠ-১.৩: মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য ---------- ১২৭

উত্তর মালা: ইউনিট-১ ---------- **১৩৩**

ইউনিট-২: তথ্যের প্রকারণ ---------- **১৩৫**

পাঠ-২.১ তথ্যের একক ও শ্রেণীবিভাগ ---------- ১৩৬

পাঠ-২.২ তথ্য শ্রেণীকরণ ---------- ১৪১

পাঠ-২.৩ গণসংখ্যা নিবেশন ---------- ১৪৪

পাঠ-২.৪ তথ্য শ্রেণীকরণ পদ্ধতি ---------- ১৪৯

উত্তরমালা : ইউনিট-২ ---------- **১৫২**

ইউনিট-৩ : মধ্যগামিতা পরিমাপ ---------- **১৫৩**

পাঠ-৩.১ চলক ও মধ্যমা ---------- ১৫৪

পাঠ-৩.২ গড় (যোজিত গড়) ---------- ১৫৮

উত্তরমালা: ইউনিট-৩: ---------- **১৬২**

ইউনিট-৪: বিস্তৃতির পরিমাপ ---------- **১৬৩**

পাঠ-৪.১ সাধারণ বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ ---------- ১৬৪

পাঠ-৪.২ আপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ ---------- ১৭৪

পাঠ-৪.৩ বিস্তারের আকার ---------- ১৭৯

উত্তরমালা: ইউনিট-৪: ---------- **১৮৪**

ইউনিট-৫: সম্পর্ক পরিমাপক ---------- **১৮৫**

পাঠ-৫.১ সহসংস্রবের পরিমাপক ---------- ১৮৬

পাঠ-৫.২ নির্ভরণ বিশ্লেষণ ---------- ১৯১

উত্তরমালা: ইউনিট-৫: ---------- **১৯৫**

ইউনিট-৬: তথ্যের পরিদৃশ্যমাণতা ---------- **১৯৬**

পাঠ-৬.১ তথ্য চিত্র ---------- ১৯৭

পাঠ-৬.২ প্রতীক ---------- ২০৩

পাঠ-৬.৩ ভূগোলে কম্পিউটার ব্যবহার: একটি প্রাথমিক ধারণা ---------- ২০৮

উত্তরমালা: ইউনিট-৬: ---------- **২১৬**

পরিশিষ্ট ---------- ২১৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ---------- ২১৮

ইউনিট-১

বাংলাদেশ ভূগোল

বাংলাদেশঃ একটি সমীক্ষা

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত উষ্ণ-আর্দ্র নদী মার্তৃক ব-দ্বীপ বিশিষ্ট একটি সমভূমি। ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাসের একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম মাত্র ৪২ বছর পূর্বে হলেও, প্রায় পাঁচ হাজার বছর ব্যাপী এদেশে স্থায়ী জনপদ গড়ে উঠেছে। বৈদিক যুগের শেষ ভাগের সাহিত্য কর্মে প্রথম বাংলা জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের উপরিভাগের দৃশ্যমান ভূ-উপাদানের বয়স কয়েক কোটি বছর। তবে এদেশের দক্ষিনাংশের বিস্তীর্ণ নিম্ন সমতল ভূমির গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় মাত্র ২০-২৫ হাজার বছর আগে। বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ২০°৩৪ উত্তর ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ পূর্ব থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। কর্কট ক্রান্তি রেখা (২৩ ১/২° উত্তর অক্ষাংশ) বাংলাদেশের প্রায় মাঝ বরাবর অবস্থানে আছে। বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর দেশ। নদী মার্তৃক এই দেশের বুকে জালের মত বিস্তৃত রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল ও ছোট বড় নানা ধরণের জলাশয়। এই সকল নদী-নদী ও নানান জলাশয় এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। গঙ্গা-পদ্মা, ব্রক্ষপুত্র-যমুনা, সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থা হাজার বছর ধরে বিপুল পরিমান পলি বয়ে নিয়ে বঙ্গখাতে অবক্ষেপন করে গড়ে তুলেছে পলল সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ সমভূমি বাংলাদেশ। মৌসুমী জলবায়ু, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও অসংখ্য নদ-নদীর উপস্থিতি বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে দিয়েছে অনন্য স্বকীয়তা।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে-
পাঠ ১.১: বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের কালক্রমিক ইতিহাস
পাঠ ১.২: বাংলাদেশের ভূ-সংস্থান
পাঠ ১.৩: বাংলাদেশের জলবায়ু
পাঠ ১.৪: বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

পাঠ ১.১

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের কালক্রমিক ইতিহাস:
(Chronological History of Geo-Political Evolution of Bangladesh)

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের কালক্রমিক ইতিহাস;
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় : অবস্থান, আয়তন, সীমারেখা, ও প্রশাসনিক গঠন; এবং
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী।

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের কালক্রমিক ইতিহাস (Chronological History of Geo-Political Evolution of Bangladesh) ঃ

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পুরোনো বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ ও মহাভারত ও বৌদ্ধ যুগে বঙ্গদেশ অথবা বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে জানা যায়। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের ক্রমবিকাশের একটি চিত্র পরবর্তী অনুচ্ছেদে তুলে ধরা হলো।

প্রাচীন যুগ ঃ

বৈদিক যুগের শেষভাগে 'বঙ্গ' নামে বর্তমান বাংলাদেশের কিয়দংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই 'বঙ্গ' শব্দটি নিম্ন গাঙ্গেঁয় উপত্যকার একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডকে বুঝাতো। প্রাচীন এই বঙ্গ দেশের নিজস্ব ভৌগোলিক সীমানা ও জাতি সত্ত্বা ছিল। এই অঞ্চলটি পুন্ড্র, বরেন্দ্র, গৌড়, হরিকেল, সমতট ও বঙ্গাল নামক বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য জনপদ বেষ্টিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গদেশ বা বাংলার সীমানা উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে-গারো, লুসাই পর্বত হতে পশ্চিমে ছোট নাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল বলে পন্ডিতগণ ধারণা করেন।

খৃষ্টপূর্ব ৩২১ সালে বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্রে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে খৃষ্টপূর্ব ৬৮ সালে টলেমী (Ptolemy) তাঁর অঙ্কিত মানচিত্রে গঙ্গারিডই বা গঙ্গারিডাই নামে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে এক শক্তিশালী জাতির আবাসস্থল হিসেবে বাংলা অঞ্চলের উল্লেখ করেন। তবে ঐ মানচিত্র বঙ্গদেশের কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানা চিহ্নিত করা হয়নি (Sultana,S,1991)।

মৌর্য যুগ ঃ

পন্ডিতদের মতে. মৌর্য যুগে (৩২১-১৮১ খৃষ্টপূর্ব) গঙ্গারিডই ও প্রাসই নামক দুটি শক্তিশালী জাতি বাংলা অঞ্চলে বসবাস করতো। তবে গুপ্ত বংশের (৩২০-৪৬৭ খৃষ্টাব্দ) উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস স্পষ্টভাবে জানা যায় নি।

গুপ্ত যুগ (৫০০ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দ) ঃ

গুপ্ত যুগের ৫০০ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দ সময়কালে রাজা শশাঙ্ক দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় (বর্তমান উড়িষ্যা) এবং বর্মন রাজন্য বর্গ উত্তর পূর্ব বঙ্গে একটি পৃথক স্বাধীন ভূখন্ড স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সময়কালে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উত্থান ঘটে।

পাল রাজত্ব (৭০০-৯২৫ খৃষ্টাব্দ) ঃ

খৃষ্টাব্দ ৭০০ থেকে ৯২৫ সময়কালে পাল বংশ বাংলা ভূখন্ড শাষণ করে। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপাল-এর শাষণামলে (৭৫০-৭৭০ খৃষ্টাব্দ) বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। পাল বংশ সুদীর্ঘ ৪০০ বছর বাংলা শাষণ করে। 'মাৎস্য ন্যয়' অবস্থা ও গোপালের নির্বাচন প্রক্রিয়া এক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অবস্থা।

সেন রাজত্ব (৯২৬-১২০৪ খৃষ্টাব্দ) ঃ

বাংলায় সেন রাজবংশ রাজত্ব করে ৯২৬ থেকে ১২০৪ খৃষ্টাব্দ সময়কালে। এ সময়ে সমগ্র বাংলা তাদের শাষণাধীন হলেও বর্ণ বিরোধ চরম হয়ে উঠে। সেনদের রাজত্বকালে নিপীড়িত বৌদ্ধ এবং নিচু বর্ণের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ক্রমশ: আরব ও পারস্য থেকে আগত মুসলিম ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারকদের অনুপ্রেরণায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ ত্যাগ করে শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বর্হিগমন করে।

মুসলমানদের বঙ্গ বিজয় (১২০৪-১২৪৫) ঃ

সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ সালে উত্তর-পশ্চিম বাংলায় প্রথম মুসলিম শাষণ প্রতিষ্ঠা করেন (১২০৪-১২৪৫ খৃষ্টাব্দ)। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শাসনামলে বাংলার ভূ-রাজনৈতিকভাবে একটি সুস্পষ্ট পরিচিতি লাভ

(আহমেদ, ১৯৭৫)। এই সময়কালে বাংলার সীমানা ছিল উত্তরে নেপালের সীমানা থেকে উত্তর উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। অন্যদিকে পশ্চিমে বিহার থেকে পূর্ব আসাম পর্যন্ত।

মোঘল রাজত্ব (১৫৭৬-১৭০৭ খৃষ্টাব্দ) ঃ

এই সময়কালে সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বেশ কয়েকটি নগর-জনপদ গড়ে উঠে। পাটনা, মুঙ্গের, পান্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, সোনারগাঁও, সিলেট, বাগেরহাট, চাটিগাঁও (চট্টগ্রাম) ও সন্দীপ এই জনপদ গুলোর অন্যতম।

বৃটিশ শাষণামলে বাংলা (১৭৬০ থেকে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ) ঃ

বাংলা ভূখন্ড বৃটিশ শাষণামলে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' নামে পরিচিত ছিল। এ সময়ে বাংলা, বিহার, উত্তর-পূর্ব উড়িষ্যার কিয়দংশ, আসাম ও আরাকানের কিয়দংশ নিয়ে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' গঠিত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১৯১১) ঃ

প্রশাসনিক কার্যার্থে বৃটিশ শাসকেরা বাংলাকে দু'টি প্রশাসনিক ভাগে বিভক্ত করেন। তদানুযায়ী বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ এবং আসাম নিয়ে নব গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অন্যদিকে, পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে নবগঠিত প্রদেশ পশ্চিম বাংলার রাজধানী হয় কলকাতা। তবে কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধীতার ফলে ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। বঙ্গভঙ্গ প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীতে গঠিত ' ইষ্ট বেঙ্গল' বা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান এবং কালক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশে গঠনের সূত্রপাত হিসেবে কাজ করে।

পাকিস্তান শাষণাধীন পূর্ব পাকিস্তান (১৯৪৭-১৯৭১) ঃ

১৯৪৭ সালে সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাসমূহ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র। পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে 'পূর্ব বাংলা'-এর পরিবর্তে 'পূর্ব-পাকিস্তান' নাম প্রচলন করা হয়। এ সময়কালে পূর্ব বাংলায় 'উর্দু'-কে রাষ্ট্রীয় ভাষা প্রচলনের চেষ্টা করা হয়। অপরদিকে সমগ্র পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্ব বাংলার অবদান অধিক সত্ত্বেও এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তেমন ঘটেনি। প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও পশ্চিম ও পূর্ব অংশের মধ্যে বৈষ্যম্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। এ সময় পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং প্রশাসনিক বৈষম্য রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন ঃ

স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রাম (১৯৪৮-১৯৭১) ঃ

১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা 'উর্দু' ঘোষণার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান সর্ব প্রথম আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, আরও অনেক বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয় পূর্ব পাকিস্তান বাসী।

অনেক আন্দোলন ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানী শাষক গোষ্ঠীর পক্ষপাতমূলক ও অত্যাচারী আচরণ বন্ধ না হওয়ায় প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এক বিশাল জনসভায় জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানান। পূর্ব পাকিস্তান বাসী ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ ব্যাপকভাবে গণহত্যার শিকার হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এই দিন মধ্যরাতেই পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবি ও পুলিশ বাহিনীকে নির্বিচারে হত্যা করে। এ সময়ে ২৬ শে মার্চ মধ্য রাতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র চট্টগ্রাম আওয়ামী লিগ নেতৃবৃন্দকে প্রচার করার লক্ষ্যে প্রেরণ করেন, যা কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার হতে থাকে। ইতিমধ্যে, পরদিন অর্থাৎ ২৭ শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান শেষ মুজিবর রহমান-এর পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেন (বেলাল মোহাম্মদ, ২০০৬)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শত্রুর বিরুদ্ধে নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ। আনুমানিক ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময় ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পায়, পরিপূর্নতা লাভ করে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যূদয়ের ক্রম বিকাশ।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় : অবস্থান, আয়তন, সীমারেখা, ও প্রশাসনিক গঠন

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location) ঃ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান আলোচনা করতে হলে, প্রথমে এদেশের প্রকৃত অবস্থানের (Absolute Location) প্রসঙ্গ উল্লেখ প্রয়োজন। বাংলাদেশ ২০°৩৪ উত্তর থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ পূর্ব থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থান হলো এদেশের তিন দিকে ভারত রাষ্ট্র,উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মায়ানমার-এর অংশ বিশেষ পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত (মানচিত্র ১.১)।

বাংলাদেশের আয়তন ও সীমারেখা ঃ

বাংলাদেশের মোট আয়তন প্রায় ১৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটার অথবা ৫৬৯৭৭ বর্গ মাইল এবং দেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪৬৮৫ কি. মি. (২৯২৮ মাইল) এবং জলসীমা ১২ ন্যটিকাল মাইল। বাংলাদেশের মোট আয়তনের মধ্যে

২২,১৫৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নদ-নদী বিশিষ্ট এবং ১৬,৫৪২ কিলোমিটির জুড়ে বনভূমির অবস্থান (BBS, 2008) (সারণী ১.১)।

সারনী ১.১ : বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে স্থল ও সমুদ্র সীমানার দৈর্ঘ্য ঃ

সীমারেখার ধরণ	দৈর্ঘ্য কি. মি./মাইল
মায়ানমারের সাথে সামুদ্রিক সীমানা	৪৪৫ কি.মি /২৬৭ মাইল
ভারতের সাথে স্থল সীমারেখা	২,৩০৬ কি.মি./ ১৩৮৩ মাইল

উৎস্য: হারুন অর রশিদ, ১৯৯১

* ২০১২ সালে United Nations Convention on the Law of the SEA (UNCLOS) বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানের ২০০ নটিক্যাল মাইল সহ ১.১১ লক্ষ বর্গ মাইল এলাকার অধিকার অনুমোদন করে। এই এলাকা বাংলাদেশের স্থল আয়তনের প্রায় দ্বিগুন (খুরশীদ আলম, ২০১২)।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক গঠন

বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে। যেমন- ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট বিভাগ। এই ৭টি বিভাগে মোট ৬৪টি জেলা রয়েছে।

সারণী ১.২: বাংলাদেশের বিভাগ অনুযায়ী জেলার সংখ্যা

বিভাগ-এর নাম	জেলার সংখ্যা
ঢাকা	১৭ টি
রাজশাহী	৮ টি
চট্টগ্রাম	১১ টি
খুলনা	১০ টি
বরিশাল	৬ টি
সিলেট	৪ টি
রংপুর	৮ টি
মোট জেলার সংখ্যা	৬৪ টি

উৎস্য : BBS, ২০১১

এছাড়া এদেশে মোট ৫০৯ টি থানা বা উপজেলা, ৪৪৬৬ টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৫৯২২৯ টি মৌজা, ৮৫,৬৫০ টি গ্রাম, ১১টি সিটি কর্পোরেশন (গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সহ) এবং ১২০টি পৌরসভা রয়েছে। ১৯৮৪ সালে পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ প্রশাসনিক একক হিসেবে মোট ২০টি জেলা ছিল। এর পরবর্তী ক্ষুদ্রতর প্রশাসনিক একক ছিল থানা। ১৯৮৪ সালে এদেশের বৃহত্তম জেলাগুলো ভেঙ্গে সর্বমোট ৬৪টি জেলায় উন্নীত করা হয় এবং ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি পূর্বের থানাসমূহ ও সেই সাথে বেশ কিছু সংখ্যক নতুন থানাসহ মোট ৪৯৫টি উপজেলা করা হয়। এছাড়া মোট ৮৫,৬৫০টি গ্রাম ও ৬০,৩২৫ টি মৌজা বিদ্যমান আছে। ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক হিসেবে ২০০৯ সালে মোট ৪,৪৯৮ টি ইউনিয়ন বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক হলো উপজেলা এবং বৃহত্তম একক হলো জেলা। (BBS, ২০১০)

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

রাজনৈতিক তথ্যাবলী ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। ১৯৯১ সালে সরকারি ও বিরোধী দলের ঐক্যমতে ১৯৭৫ সালে কায়েম হওয়া রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে পুনরায় সংসদীয় পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। দেশের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সাল থেকে ক্ষমতাসীন রয়েছেন। সারণী ১.৩ ও ১.৪-এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী গণের নামের ও দায়িত্বকাল-এর তালিকা দেয়া হলো।

সারণী ১.৩ : বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টগণ এর নাম ও দায়িত্বকাল

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট গণ	দায়িত্বকাল
সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)	১০ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
শেখ মুজিবুর রহমান	১০ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ১২ জানুয়ারি ১৯৭২
বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১২ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩
মোহাম্মদউল্লাহ	২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৩ থেকে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ থেকে ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫
খন্দকার মোশতাক আহমদ	১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ থেকে ৫ নভেম্বর ১৯৭৫

বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম	৬ নভেম্বর ১৯৭৫ থেকে ২১ এপ্রিল ১৯৭৭
লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান	২১ এপ্রিল ১৯৭৭ থেকে ৩০ মৈ ১৯৮১
বিচারপতি আবদুস সাত্তার (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)	৩০ মৈ ১৯৮১ থেকে ২০ নভেম্বর ১৯৮১
বিচারপতি আবদুস সাত্তার	২০ নভেম্বর ১৯৮১ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৮২
বিচারপতি এ.এফ.এম. আহসান উদ্দিন চৌধুরী	২৭ মার্চ ১৯৮২ থেকে ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৩
লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ থেকে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০
বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)	৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ থেকে ৯ অক্টোবর ১৯৯১
আব্দুর রহমান বিশ্বাস	৮ অক্টোবর ১৯৯১ থেকে ৮ অক্টোবর ১৯৯৬
বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ	৯ অক্টোবর ১৯৯৬ থেকে ১৪ নভেম্বর ২০০১
প্রফেসর এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৪ নভেম্বর ২০০১ থেকে ২১ জুন ২০০২
ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি)	২২ জুন ২০০২ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর ২০০২
প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ	৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯
জিল্লুর রহমান	১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ থেকে ২০ মার্চ ২০১৩
মো.আব্দুল হামিদ	১৪ মার্চ ২০১৩ থেকে ২৪ এপ্রিল ২০১৩
মো.আব্দুল হামিদ	২৪ এপ্রিল ২০১৩ থেকে অদ্যাবধি

উৎস্য: বাংলাপিডিয়া

সারণী ১.৪: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা গণের নাম ও দায়িত্বকাল

ক্রমিক নং	প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা গণের নাম	দায়িত্বকাল
১	বেগম খালেদা জিয়া	২০ মার্চ, ১৯৯১-৩০ মার্চ, ১৯৯৬
২	মো.হাবিবুর রহমান (প্রধান উপদেষ্টা)	৩০ মার্চ, ১৯৯৬-২৩ জুন, ১৯৯৬
৩	শেখ হাসিনা	২৩ জুন, ১৯৯৬-১৬ জুলাই, ২০০১
৪	লতিফুর রহমান (প্রধান উপদেষ্টা)	১৫ জুলাই, ২০০১-১০ অক্টোবর, ২০০১
৫	বেগম খালেদা জিয়া	১০ অক্টোবর, ২০০১-২৯ অক্টোবর, ২০০৬
৬	ইয়াজউদ্দীন আহমদ (প্রেসিডেন্ট ওপ্রধান উপদেষ্টা)	২৯ অক্টোবর, ২০০৬-১১ জানুয়ারী, ২০০৭
৭	ফজলুল হক (ভারপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টা)	১১ জানুয়ারী, ২০০৭-১২ জানুয়ারী, ২০০৭
৮	ফকরুদ্দীন আহমেদ	১২ জানুয়ারী, ২০০৭-৬ জানুয়ারী, ২০০৯
৯	শেখ হাসিনা	৬ জুন, ২০০৮ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ক্ষমতাসীন

উৎস্য: বাংলাপিডিয়া

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১) ঃ

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর আদেশে ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতে সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ, বুদ্ধিজীবি ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপক হারে হত্যা করে। ঐ দিন শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শত্রুর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘ যুদ্ধ। ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ সালে মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায় (মুজিবনগর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে বাঙালী পুলিশ, ই.পি.আই (বি.জি.বি), সিপাহী, আনসার সদস্য, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওসমানী। সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালিত হয় (সারণী ১.৫ ও মানচিত্র ১.১)।

সারণী ১.৫ ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর সমূহ ও সেক্টর কমান্ডারগণের নাম

সেক্টর নং	অঞ্চল (এলাকা)	সেক্টর কমান্ডারগণের নাম ও দায়িত্বকাল
১	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম	মেজর জিয়াউর রহমান (১০ এপ্রিল, ১৯৭১ - ২৫ জুন, ১৯৭১) রফিকুল ইসলাম (২৮ জুন, ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)
২	কুমিল্লা - নোয়াখালী	খালেদ মোশাররফ (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১) এটিএম হায়দার (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ - ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
৩	সিলেট - ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কে. এম. সফিউল্লাহ (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ২১ জুলাই, ১৯৭১) এ.এন.এম. নুরুজ্জামান (২৩ জুলাই, ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১)
৪	সিলেট ঃ হবিগঞ্জ অঞ্চল	চিত্তরঞ্জন দত্ত (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২) আব্দুর রব
৫	সিলেট ঃ দুর্গাপুর - ডাউকি-এর পূর্বসীমা	মীর শওকত আলী (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)
৬	রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিয়দংশ	এম খাদেমুল বাশার (এপ্রিল ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)
৭	দিনাজপুর - রাজশাহী - পাবনা - বগুড়া	নাজমুল হক (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১) কাজী নুরুজ্জামান (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২), আব্দুর রব

চিত্র ১.১ ঃ বাংলাদেশর অবস্থান ও মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর সমূহ

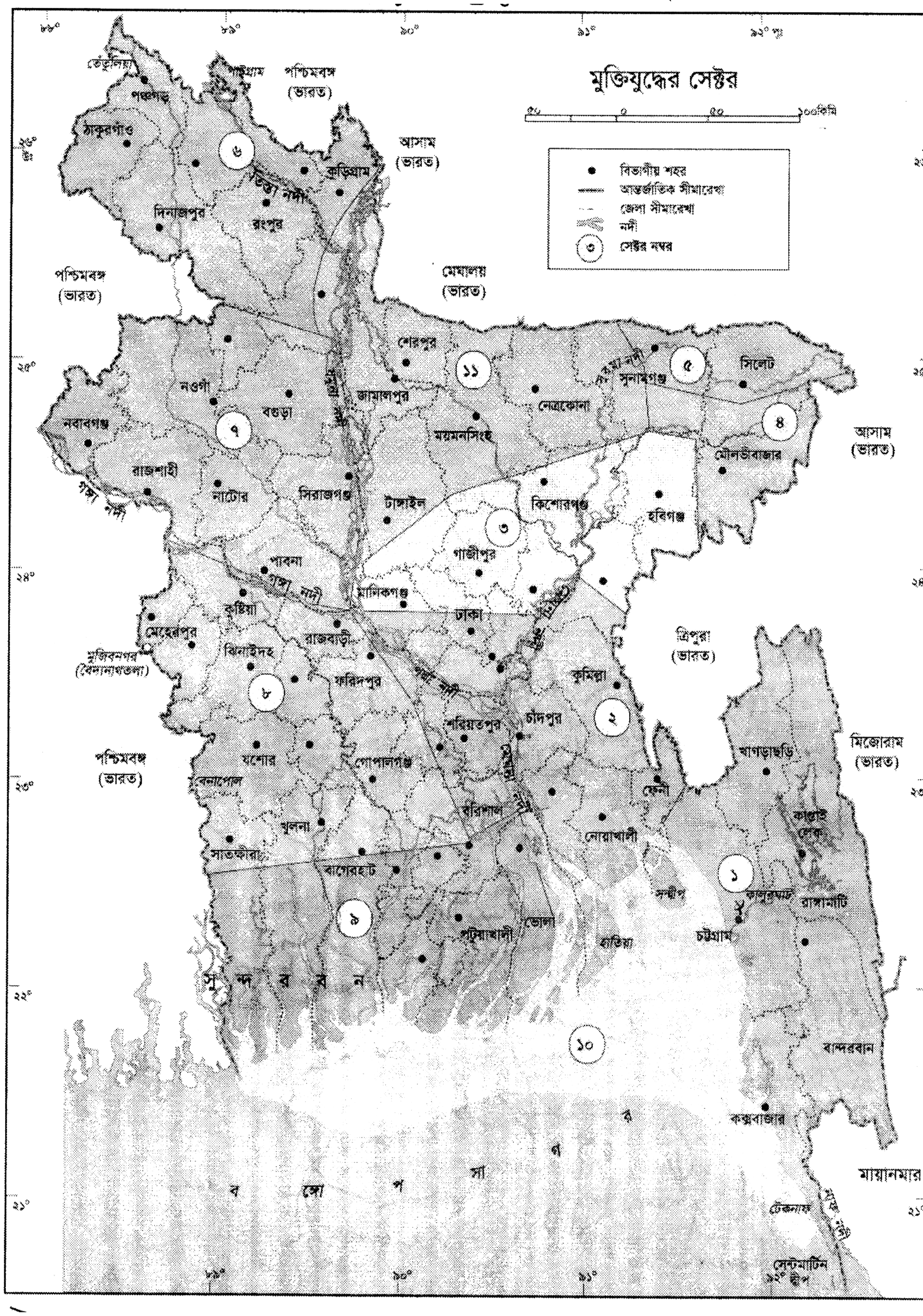

উৎস্য: বাংলাপিডিয়া

৮	কুষ্টিয়া - যশোর	আবু ওসমান চৌধুরী (১০ এপ্রিল ১৯৭১ - ১৭ জুলাই, ১৯৭১) এম. এ. মঞ্জুর (১৪ আগস্ট, ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)
৯	বরিশাল - পটুয়াখালী জেলা ও খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ	এম.এ. জলিল (১৭ জুলাই, ১৯৭১ - ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১) এম.এ. মঞ্জুর, জয়নাল আবেদীন
১০	বঙ্গোপসাগর অঞ্চল	বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্নেল ওসমানী ও ভারতীয় কমান্ডার এম.এন. সামন্ত -এর পরিচালনায় (৩-৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
১১	ময়মনসিংহ - টাঙ্গাইল	জিয়াউর রহমান (২৭ জুন, ১৯৭১ - ১০ অক্টোবর, ১৯৭১) আবু তাহের (১০ অক্টোবর, ১৯৭১ - ২ নভেম্বর, ১৯৭১) এম. হামিদুল্লাহ খান (২ নভেম্বর, ১৯৭১ - ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২)

Source: Banglapedia - War of Liberation and Wikipedia - List of sectors in Bangladesh Liberation War

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পুরণ করুনঃ**

১.১. বৈদিক যুগের শেষভঅগে .... নামে বর্তমান বাংলাদেশের কিয়দংশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১.২: .... সালে সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাসমূহ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র।

১.৩: বাংলাদেশে বর্তমানে .... টি প্রশাসনিক বিভাগ আছে।

১.৪: বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক হলো .... এবং বৃহত্তম একক হলো .... ।

১.৫: ১১ জন সেক্টর কমান্ডের .... মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়।

২. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে ঠিক এবং অঠিক উত্তরের পার্শ্বে অঠিক লিখুন:**

২.১: এদেশের দক্ষিণাংশের বিস্তীর্ণ নিম্ন সমতলভূমির গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় মাত্র ২০-২৫ হাজার বছর আগে।

২.২: কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধীতার ফলে ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়।

২.৩: পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত প্রদেশ পশ্চিম বাংলার রাজধানী হয় ঢাকা।

২.৪: বাংলাদেশের অবস্থান ২০°৩৪' উত্তর থেকে ২৮°৩৬' উত্তর অক্ষাংশ।

২.৫: অনেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ ত্যাগ করে শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বহির্গমন করে।

সংক্ষেপে উত্তর লিখুনঃ

১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে একটি বিবরণ দিন।

২. বাংলাদেশের সীমানা ও পারিসরিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।

৩. প্রাচীন বাংলাদেশের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলোর বিবরণ লিখুন।

অথবা

ব্রিটিশদের এদেশে আগমনের পূর্বে বর্তমানের বাংলাদেশের ভূ-ভাগসমূহের বিবরণ দিন।

৪. পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার উপর ব্রিটিশদের ক্ষমতা শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানের বাংলাদেশের প্রাথমিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ থেকে যায়। ব্যাখ্যা করুন।

৫. বাংলাদেশে ভূ-রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে সহায়ক ভূমিকার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয় সম্পর্কে যাহা জানেন লিখুন।

২. কি কি কারণে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয় বা বিকাশ লাভ ঘটে তা আলোচনা করুন।

পাঠ-১.২

বাংলাদেশের ভূ-সংস্থান
(Topography of Bangladesh)

এই পাঠ পড়ে আপনি-
- ◆ ভূ-সংস্থান ও ভূ-প্রকৃতি , এবং
- ◆ বাংলাদেশের ভূ-সংস্থানগত শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থান বা অঞ্চলের নিয়ম সিদ্ধভাবে সঠিক বর্ণনা কে ভূ-সংস্থান (Topography) বলে। অর্থাৎ কোন স্থানের ভূমিরূপের বিভিন্ন বিষয়াদি, যেমন- জলবায়ু, নদ-নদী, অন্যান্য মানবীয় কর্মকান্ড ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ এর অন্তর্ভূক্ত। অপর পক্ষে, ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনামূলক বিবরণকে ভূ-প্রকৃতি (Physiography) বলে। মূলতঃ ভূ-প্রকৃতি ও ভূ-সংস্থান সমার্থকবোধক। উত্তর আমেরিকায় ভূ-সংস্থান কথাটি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত থাকলেও ভূ-প্রকৃতি শব্দটি বিশ্বের সকল স্থানে ব্যবহার হয়। তাই বর্তমান পাঠে ভূ-প্রকৃতি ও ভূ- সংস্থান সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপভূমি এবং বঙ্গ অববাহিকা নামে বহুল পরিচিত ভূতাত্ত্বিক গঠনগত এককের প্রধান অংশ সীমায় এর অবস্থান। এটি পশ্চিমে রাজমহল পাহাড় (পশ্চিম বাংলা) ও উত্তরে শিলং মালভূমি (মেঘালয়) এবং পূর্বাংশে লুসাই ও আরাকান পাহাড়সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। বঙ্গ অববাহিকার উদ্ভব টারশিয়ারী যুগে যার সঙ্গে হিমালয় পর্বত গঠন প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সংস্পৃক্ততা বিদ্যমান রয়েছে। একই সময়ে সৃষ্ট অপর এক ভূ-আলোড়নের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, আসাম ও নাগাপাহাড় গঠিত হয়েছে এবং চট্টগ্রাম ব্যতীত অবশিষ্ট বাংলাদেশ প্রাচীন ও সাম্প্রতিক কালের নদীবাহিত পলল অবক্ষেপনের মাধ্যমে আজকের অবস্থানে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশের অবয়ব/আয়তনগত দিক ক্ষুদ্র হলেও যথেষ্ট ভূসংস্থানিক বৈচিত্র্য রয়েছে। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন ভূবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ, জরীপ ও শ্রেণীবিভাজন প্রক্রিয়ার অনন্য প্রয়াস। তাদের মধ্যে স্প্রেট (১৯৫৪), জনসন (১৯৫৭), ম্যাকিন্টার (১৯৫৯), এম আই চৌধুরী ও মনিরুজ্জামান মিঞা (১৯৮১), নাফিস আহমেদ (১৯৫৫), হারুন অর রশিদ (১৯৭৭) প্রমুখ। এখানে উল্লেখ্য যে নাফিস আহমেদ, হারুন অর রশিদ ও মনিরুজ্জামান মিঞা (১৯৮১) তাঁদের পুর্ববর্তী গবেষকগণের প্রদত্ত শ্রেণীবিভাজনের উপর ভিত্তি করে সূক্ষ্মতর শ্রেণীবিভাজন উত্থাপন করেন। নিন্মে এগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. ১৯৫৫ সালে নাফিস আহমেদ বাংলাদেশকে ভূপ্রাকৃতিক ভাবে দুটো ভাগে বিভক্ত করেন, যেমন- ক) বিস্তৃত প্লাবন সমভূমি এবং খ) পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বের সীমান্তবর্তী পাহাড় সমূহ।
২. এম আই চৌধুরী ও মনিরুজ্জামান মিঞা (১৯৮১) বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে নিন্মোক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন, যেমন- ক) টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ, খ) প্লেস্টোসিন যুগের উচ্চ ভূমি (চত্ত্বর) এবং গ) সাম্প্রতিক কালের সমতল ভূমি।
৩. সাধারভাবে ভূমির অবস্থা ও গঠনকাল অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূরূপকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথাঃ ক) টারশিয়ারী যুগের পাহাড়ী এলাকা, খ) প্লেস্টোসিন যুগের সোপান এলাকা গ) সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি এলাকা এবং ঘ) উপকূলীয় বদ্বীপ এলাকা।
৪. হারুন অর রশিদ (১৯৫৪, ১৯৭৭) বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধান ২৪ টি প্রধান ভাগ এবং তার সঙ্গে ৫৪ টি এককে বিভক্ত করেন।
৫. UNDP ও FAO সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে সর্বমোট ১৯ টি বিভাগে বিভক্ত করেন।

এই পাঠে হারুন অর রশিদ (১৯৫৪, ১৯৭৭) কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির প্রধান ২৪ টি ভাগ (ম্যাপ ১.২.১) সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিবরণ দেয়া হলো।

মানচিত্র ঃ ১.২.১ ঃ বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ

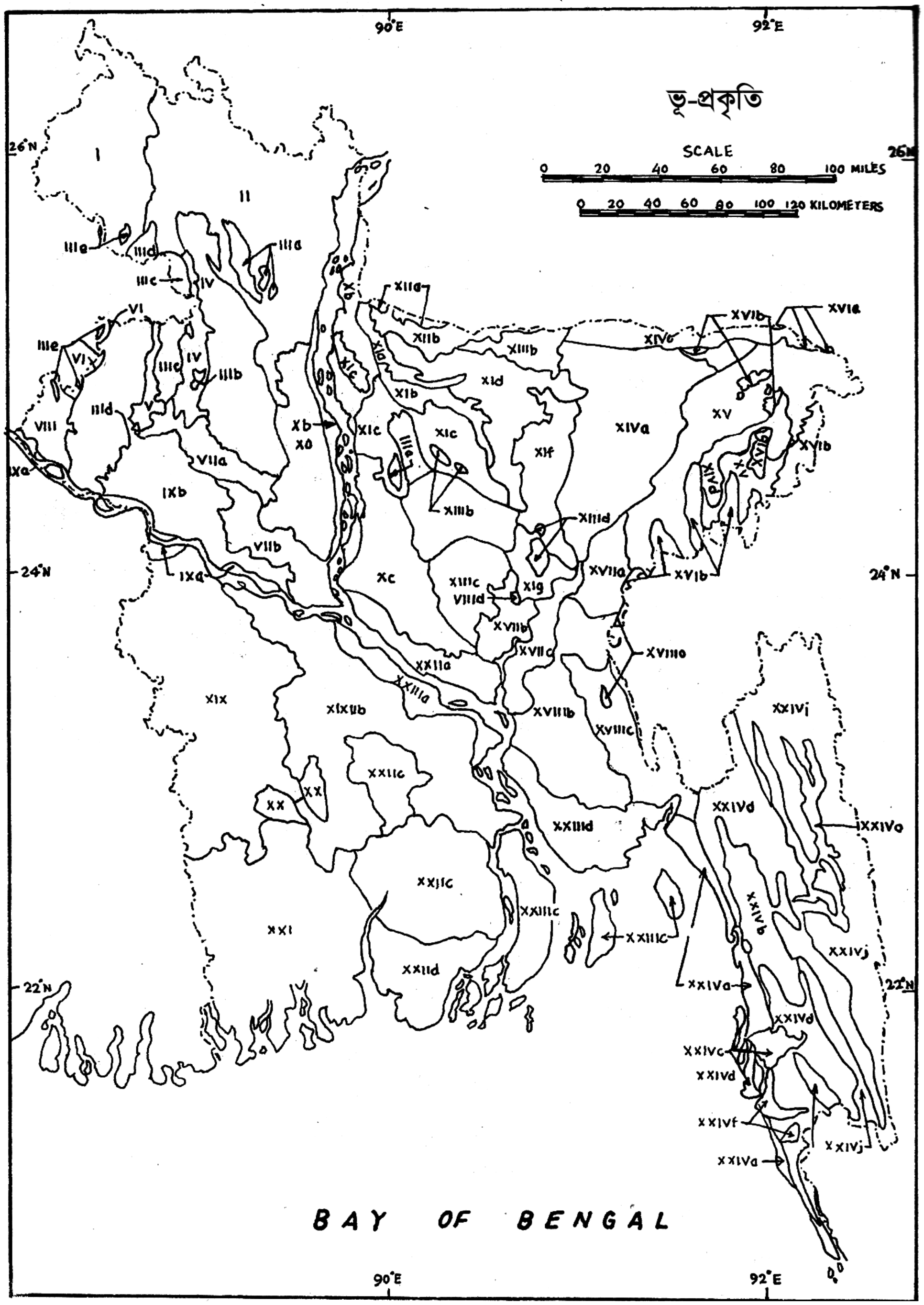

উৎস ঃ হারুন-অর-রশিদ, ১৯৯১ (ভূ-প্রকৃতির রোমান হরফ এই মানচিত্রে ১, ২, ৩, ... হিসেবে দেয়া হলো)

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের বিবরণ (Physiographic sub-regions in Bangladesh)

হারুন-অর-রশিদ ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী (physial features) ও পানি-নিষ্কাশন বিন্যাস ব্যবস্থার (Drainage pattern) ভিত্তিতে বাংলাদেশকে মোট ২৪ টি অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন (ম্যাপ ১.১)। নিম্নে অঞ্চলগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো। যেমন ঃ

(১) হিমালয় পাদদেশীয় সমভূমি (Himalayan Piedmont Plains)

হিমালয় পর্বতের পাদদেশীয় অঞ্চলে দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় অধিকাংশ স্থানব্যাপী এই ভূমিরূপ দেখা যায়। বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় পর্বত থেকে উদ্ভূত তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া, মহানন্দা,নাগর, টাঙ্গন ইত্যাদি নদী বাহিত পলল সঞ্চিত হয়ে পলল কোন ও পলল পাখা তৈরী করেছে। এই পলল কোন ও পলল পাখা জুড়ে গড়ে উঠেছে এদেশের প্রাচীনতম পলল সমভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চলটি পশ্চিমে মহানন্দা থেকে পূর্বদিকে দিনাজপুরের করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে তেতুলিয়া (৯৭ মি. উচ্চ) থেকে দক্ষিনে দিনাজপুর (৩৪ মি. উচ্চ) পর্যন্ত এ অঞ্চলের ঢালের নতিমাত্রা প্রায় প্রতি কি. মি. ০.৯১ মিটার (Rashid,1991)। ফলশ্রুতিতে, এই অঞ্চলের নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলটির অধিকাংশ স্থান তরঙ্গায়িত (undulating) ঢাল বিশিষ্ট, যার সুস্পষ্ট রূপ দেখা যায় এ অঞ্চলের দক্ষিণ পশ্চিমাংশের কুলীক নদীর দুই তীর এলাকা বরাবর।

(২) তিস্তা প্লাবন সমভূমি (Tista Flood Plain) ঃ

দিনাজপুর জেলার করতোয়া নদীর উচু বেলে মাটির প্রাকৃতিক বাঁধ (natural levee) থেকে ব্রক্ষ্মপুত্র নদ পর্যন্ত এই বিশাল প্রাকৃতিক অঞ্চলটি বিস্তৃত। এর একটি অংশ দক্ষিনে পুরাতন তিস্তা নদীর তীর বরাবর বর্ধিত হয়ে বগুড়ার শেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝারী উচ্চতার শৈল শিরা (ridges) জাতীয় ভূমিরূপ ও অগভীর নদী উপত্যকা (shallow basin) বিশিষ্ট এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান স্বল্প গভীরতায় প্লাবিত হয়ে থাকে। তবে ঘাঘট নদীর গতিপথে অবনমন (depression) রয়েছে যেখানে মাঝারী মাত্রার বন্যা হয়। তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদী এই প্লাবন সমভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বালুচর (sandy bars) ও দিয়ারা (diara) সমৃদ্ধ এই নদীগুলোর সক্রিয় প্লাবনভূমি প্রায় ৬ কি. মি. চওড়া।

(৩) বরেন্দ্রভূমি (Barind Tract) ঃ বঙ্গ অববাহিকায় (bengal basin) অবস্থিত প্লায়োষ্টোসিন চত্বরসমূহের মধ্যে বরেন্দ্রভূমি উল্লেখযোগ্য। এই চত্বরের সমোন্নতি রেখা (contour lines) গুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় - এর দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথমটি ৩৯.৭ মিটার উচ্চতায় এবং দ্বিতীয়টি ১৯.৮ থেকে ২২.৯ মিটার উচ্চতায়। বরেন্দ্র চত্বরটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ঃ অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চতা, লালচে ও হলদেটে কর্দম মৃত্তিকা, শাখা-প্রশাখা যুক্ত নদী নিষ্কাশন ব্যবস্থা (dendrite stream pattern), এবং উদ্ভিজ্জের স্বল্পতা। বরেন্দ্র চত্বরটি পাঁচটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত।

যেমন ঃ

ক. উত্তর-পূর্বাঞ্চল (North-eastern Outlier) ঃ

এই অঞ্চলের মাটি বরেন্দ্রভূমির অন্য অঞ্চলের মাটি অপেক্ষা গাঢ়তর লালচে খয়েরী বর্ণের। এই অঞ্চলের 'আশুলা বিল' অঞ্চল এলাকা ব্যতীত বাকী অংশ বেশ উঁচু। এই অংশটির সীমানায় কোনো কোনো অংশ বেশ খাড়া, যা স্তূপ চ্যুতির (block faulting) প্রমান দেয়।

খ. পূর্ব বরেন্দ্রভূমি (Eastern Barind) ঃ

বরেন্দ্রভূমির পূর্বাংশ তারাস, সিঙ্গারা, নদীগ্রাম, রানীনগর, আদমদীঘি, কাহালু, শেরপুর, বগুড়া, শিবগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, সৈয়দপুর ও হাকিমপুর অঞ্চলের প্রায় ১৯৩০ কি. মি. জুড়ে বিস্তৃত। অল্প কিছু তরঙ্গায়িত (undualating) ভূমিরূপ ব্যতীত সমতল এই ভূমির উত্তর-পূবাংশের কিছু অংশ করতোয়া চ্যুতি (Karatoa Fault) দ্বারা অবশিষ্ট্যাঞ্চল থেকে বিভক্ত। এই অঞ্চলে ১৮১২ সালে এক বিরাট ভূমিকম্পের ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের ফাটলগুলো তৈরী হয়েছিল বলে ধারনা করা হয় (Buchanan - Hamilton, 1833)।

গ. পূর্ব বরেন্দ্রভূমির মধ্যভাগ (East - Central Barind)

বরেন্দ্রভূমির এই অংশটির ৫০৭ বর্গ কি. মি. এলাকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। চিরির বন্দর উপজেলা থেকে মহাদেবপুর উপজেলা পর্যন্ত প্রায় ৯৭ কি. মি. দীর্ঘ এই ভূ-ভাগের পশ্চিমাংশ আত্রাই নদী উপত্যকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে এই ভূ-ভাগটি অকস্মাৎ নীচু হয়ে ভর অববাহিকায় (Bhar basin) মিলিত হয়েছে। উত্তরে পার্বতিপুর ও চিরির বন্দরের মধ্যবর্তী এলাকাটি ৩৯ মি উঁচু। অল্প কিছু তরঙ্গায়িত (undualating) ভূমিরূপ, শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট্য খাদ যুক্ত নদী নিষ্কাশন ব্যবস্থা (entrenched dendrite stream pattern) বিশিষ্ট্য এই অঞ্চলের মধ্যভাগ বরাবর উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব মূখী ৩২ কি.মি. দীর্ঘ একটি চ্যুতি (Fault) রয়েছে।

ঘ. পশ্চিম বরেন্দ্রভূমির মধ্যভাগ (West- Central Barind) ঃ

বরেন্দ্রভূমির এই অংশটি ১৭৭০ বর্গ কি. মি. এলাকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। প্রায় ১৪৫ কি. মি. দীর্ঘ এই ভূ-ভাগ গড়ে ১৬ কি. মি. থেকে ৩৭ কি. মি. প্রশ্বস্ত। উত্তরে এই অঞ্চলটি দিনাজপুরের দক্ষিণে হিমালয় পাদদেশীয় পলল সমভূমি পর্যন্ত ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠেছে। দক্ষিণে গঙ্গা নদীর সু-উচ্চ খাড়া পাড় এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রায় সমতল হলেও বাকী অংশ তরঙ্গায়িত ভূমিরূপ বিশিষ্ট্য। অসংখ্য খাঁড়ি (Gullies) দ্বারা সমগ্র অঞ্চলটি বিভক্ত হয়ে আছে। পুরোনো পলিসঞ্চিত এই চত্বরভূমি কোনো কোনো অংশে সামান্য ঢিবির ন্যায় (Dome-shaped) উঁচু হয়ে গড়ে।

ঙ. **পশ্চিম বরেন্দ্রভূমি (Western Barind) ঃ**
বাংলাদেশের গোমস্তাপুর ও পোরশা উপজেলায় চারটি ছোট ছোট অংশের সমন্বয়ে (প্রায় ৮১ বর্গ কি. মি.) গঠিত এই অঞ্চল পূণর্ভবা ও টাঙ্গন নদীর তীর ঘেষে অবস্থিত।

(৪) ছোট যমুনা প্লাবনভূমি (Little Jamuna Flood Plain)
ছোট যমুনা নদী অববাহিকা দিনাজপুরে সংকীর্ণ হলেও দক্ষিণে এর প্রশস্ততা ৮ থেকে ১৬ কি. মি.। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই প্লাবনভূমির আয়তন ৫৩১ বর্গ কি. মি.। এই অঞ্চলের ৩ থেকে ৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত ধুসর বেলে মাটির স্তর পরিলক্ষিত হয়।

(৫) মধ্য আত্রাই প্লাবনভূমি (Middle Atrai Flood Plain) ঃ
চিরির বন্দর উপজেলা, থেকে মহাদেবপুর পর্যন্ত ৮১ কি. মি. দীর্ঘ এই নদী উপত্যকাটির দু'পাশেই বরেন্দ্রভূমির উপস্থিতি দেখা যায়। অগভীর উপত্যকায় আকস্মিক বন্যা হলেও কিছু কিছু অংশে উঁচু ভূমিরূপ গুলো বন্যা মুক্ত উচ্চতায় রয়েছে। প্লাবনভূমিটির আকস্মিক বন্যা বাহিত বেলে মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত। আত্রাই নদী কোনো কোনো অংশে সর্পিলকার ও সুগভীর বাঁক বিশিষ্ট।

(৬) নিম্ন পূর্ণভবা প্লাবন সমভূমি (Lower Punarbhoba Flood Plain) ঃ
এই প্লাবন সমভূমি কেন্দ্রীয় বরেন্দ্র অঞ্চল ও পশ্চিম বরেন্দ্র অঞ্চল কে পৃথক করেছে। এই অঞ্চলটি ভারতের দিনাজপুর জেলার ২৬ কি. মি. দক্ষিণ থেকে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর রোহনপুর) উপজেলায় মহানন্দা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। পুরো সমভূমিটি ৮১ কি. মি. লম্বা ও ৩ থেকে ৮ কি.মি. চওড়া একটি নদী উপত্যাকা (Valley) অঞ্চল (region)। এই অঞ্চলের পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় জমির উর্বরতা কম।

(৭) নিম্ন আত্রাই (ভর) উপত্যকা (Lower Atrai (Bhar) Basin) ঃ
বরেন্দ্রভূমি ও গাঙ্গের সমভূমির মাঝামাঝি অঞ্চলে অবস্থিত এই অববাহিকাটি মূলতঃ একটি নীচু অঞ্চল (Depression), যা চলন বিল নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটিতে বরেন্দ্র এলাকা থেকে আগত পানি সঞ্চিত হয়। প্রায় জুন-থেকে অক্টোবর পয্ন্ত বর্ষা মৌসুমে প্রায় ৩১২০ বর্গ কি. মি. আয়তনের এই চলন বিল প্রায় ০.৬১ মি. থেকে ৩.৭ মিটার গভীর পানি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। শুষ্ক মৌসুমেও এই এলাকা আর্দ্র থাকে।

(৮) নিম্ন মহানন্দা প্লাবনভূমি (Lower Mahananda Flood Plain) ঃ
দিনাজপুর জেলার হিমালয় পাদদেশীয় প্লাবন সমভূমির অব্যবহিত পর থেকে নিম্ন মহানন্দা প্লাবনভূমি দক্ষিনে চাঁপাইনবাবগঞ্জে গাঙ্গেয় প্লাবনভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। মহানন্দা নদীর পশ্চিমে ৮ - ১১ কি. মি. এবং পূর্বে ১.৬০ - ৫ কি. মি. প্রশস্ত। বরেন্দ্রভূমি ও গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যবর্তী এই উপত্যকাটির আয়তন ৪০২ বর্গ কি. মি. নদীটি সর্পিল ও অগভীর নদী বাঁক বিশিষ্ট।

(৯) গঙ্গা নদীর প্লাবন সমভূমি (Ganges River Flood Plain) ঃ
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা অথবা পদ্মা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ কি. মি.। অসংখ্য শাখা নদী ও উপনদীর সমন্বয়ে বাংলাদেশে এই নদীর অববাহিকার মোট আয়তন ৩১০০ কি. মি.। বাংলাদেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সীমান্ত থেকে শুরু করে দক্ষিণে রাজেশ্বরপুরে মেঘনা নদী পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে গঙ্গা বা পদ্মার প্লাবনসমভূমি বিস্তৃত। এই প্লাবন সমভূমির প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো উত্তরাংশে নদীর তীরের উচু প্রাকৃতিক বাঁধ প্রাকৃতিক এবং দক্ষিনাংশে অগভীর জলাভূমি, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ও চর সমূহ। গঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এই ধরনের হ্রদ বা বিলের সৃষ্টি হয়েছে।

(১০) ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা প্লাবনভূমি (Brahmaputra - Jamuna Flood plain) ঃ
ব্রক্ষ্মপুত্র -যমুনা নদীর দ্বারা সৃষ্ট এই প্লাবনভূমি তিনটি উপ-অঞ্চল নিয়ে গঠিত। অঞ্চলগুলো হলো-(i)বাঙ্গালী-করতোয়া নদী বিধৌত প্লাবনভূমি, (ii) দিয়ারা ও চর ভূমি ও (iii) যমুনা-ধলেশ্বরী প্লাবনভূমি। ১৭৮৭ সালে পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্র নদী গতি পরিবর্তন করে বর্তমান গতিপথে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে এবং জেনাই ও কোনাই নদীর সমন্বয়ে বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বেশী চরোৎপাদী সুপ্রশস্ত যমুনা নদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পুরাতন ব্রক্ষ্মপুত্রের গতি পরিবর্তন করবার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ভূ-বিজ্ঞানী ও ভৌগলিকগণ বিভিন্ন মতামত দেন। তন্মধ্যে মর্গান ও ম্যাকিনটার (১৯৫৯) প্রদত্ত মতামত সর্বপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। তাঁদের মতে, বরেন্দ্রভূমি চত্বর এলাকা (৩ নং ভূ-প্রাকৃতিক এলাকা দ্রষ্টব্য) ও মধুপুরের গড় এলাকার (১৩ নং ভূ-প্রাকৃতিক এলাকা দ্রষ্টব্য) মধ্যবর্তী স্থানটি অবনমিত হয়ে স্রংস/স্রস্ত উপত্যকা (Rift valley) সৃষ্টি করে (হক, ১৯৮৮)। এই অবনমিত গ্রস্ত উপত্যকা দিয়ে বর্তমান ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা নদী প্রবাহিত হচ্ছে। ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা প্লাবনভূমি অঞ্চলটির তিনটি উপ-অঞ্চল সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হলো।

(i) **বাঙ্গালী-করতোয়া নদী বিধৌত প্লাবনভূমি:** পুরো প্লাবনভূমি জুড়ে ভারি পলি ও কর্দময় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। চওড়া উচ্চভূমি/উত্থিতভূমি (broad ridges) ও উপত্যকা সমূহ, মধ্য জুন থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে ০.৯১ মিটার গভীরতায় প্লাবিত হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের উত্থিতভূমি গুলো পলিসমৃদ্ধ হলেও অববাহিকা অঞ্চল কর্দমময়।

(ii) **দিয়ারা ও চর ভূমি:** ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা নদীর তীর ঘেঁষে রয়েছে অসংখ্য দিয়ারা ও চর। সর্ববৃহৎ দিয়ারা গুলো রাহুমারী উপজিলায় মেঘালয় মালভূমির পশ্চিম পার্শ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে প্রচুর সক্রিয় চর

রয়েছে। মৃত্তিকা ও ভূ-সংস্থানিক বৈচিত্রপূর্ণ এ সমস্ত দিয়ারা ও চর সমূহের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ উচ্চতার ব্যবধান ৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

(iii) **যমুনা-ধলেশ্বরী প্লাবনভূমিঃ** ব্রহ্মপুত্র-যমুনা প্লাবনভূমির বাম পার্শ্বস্থ অঞ্চলটি যমুনা-ধলেশ্বরী প্লাবনভূমি নামে অভিহিত। এই অঞ্চলটির দক্ষিণনাংশ এক সময় গাঙ্গেয় প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্ষা মৌসুমে এই উপভাগের অধিকাংশ অঞ্চল ০.৯১ মিটার গভীরতায় প্লাবিত হয়ে থাকে।

(১১) পুরাতন ব্রহ্মপুত্র প্লাবনভূমি (Old Brahmaputra Flood Plain) ঃ

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীটি গতি হারালে পলল সঞ্চিত হয়ে মাত্র ২ কি. মি. চওড়া একটি প্রণালী (Channel) এ পরিনত হয়। এই প্রণালীটির দু'ধারে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে আসা প্রাকৃতিক বাঁধ (Natural levee) রয়েছে। এই প্রাকৃতিক বাঁধ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে। উত্থিতভূমি (high ridges), প্লাবন ভূমি, সক্রিয় ব-দ্বীপ এলাকা, গভীর ও অগভীর নদী অববাহিকা, ছোট ছোট নদী বা প্রণালী, তরঙ্গায়িত ভূমি, ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।

(১২) সুসং পাহাড় ও পাদদেশীয় পলিজ সমভূমি (Susang Hills and Piedmont) ঃ

(i) **সুসং পাহাড়ঃ** বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জামালপুর থেকে সুনামগঞ্জ জেলা পর্যন্ত প্রায় ১৬১ কি.মি দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে সুসং পাহাড়ী (টিলা) ভূমিরূপ রয়েছে। মেঘালয় মালভূমির পাদদেশস্থ টিলা সমূহ এই অঞ্চলের অর্ন্তভূক্ত। বেলে পাথর, চুনাপাথর, সাদা কর্দম (White clay), শেল, এই অঞ্চলের প্রধান গাঠনিক শিলা। এ অঞ্চলের টিলাগুলোর সর্বোচ্চ উচ্চতা ৯২ মিটার ও উপত্যকার উচ্চতা ৩১ মিটারের উর্ধ্বে। অসংখ্য গভীর খাদ বিশিষ্ট্য (entrenched) পাহাড়ী নদী বাহিত বালু ও পলি সঞ্চিত হয়ে গড়ে উঠেছে নীচু জলাবদ্ধ ভূ-ভাগ। এই অঞ্চলের পূর্ব দিকে ভারতের মেঘালয়া মালভূমির পাদদেশে রয়েছে ৬১০ কি. মি. উচ্চতা বিশিষ্ট বেশ কতগুলো বৃহদাকার ফাটল (gigantic fault)।এই ফাটল গুলোর পাদদেশে রয়েছে নীচু হাওর অববাহিকা।

(ii) **পাদদেশীয় পলিজ সমভূমিঃ** সুসং পাহাড়ী অঞ্চলের পাদদেশীয় ভূমি (নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, কমলাকান্দা ও দূর্গাপুর উপজেলার কিয়দাংশ) সুষম ঢাল (gentle slope) বিশিষ্ট। দক্ষিণে সারি সারি নদী পর্যঙ্ক গুলো বর্ষা মৌসুমে স্বল্পমাত্রায় প্লাবিত হয়। তবে আকষ্মিক বন্যা গোটা অঞ্চলকে মাঝে মাঝে প্লাবিত করে।

(১৩) মধুপুর গড় অঞ্চল (Madhupur Tract) ঃ

বরেন্দ্রভূমির ন্যায় এই অঞ্চলটি বঙ্গ অববাহিকা (Bengal Basin) -এর অভ্যন্তরে আরেকটি প্লাইস্টোসিক কালের সোপান। প্রায় ২,৫৫৮ বর্গ কি. মি. (Rashid, 1991) বিশিষ্ট এই গড় অঞ্চলের বিস্তৃতি দক্ষিণে ঢাকার উত্তরাংশ থেকে উত্তরে জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলা পর্যন্ত। মধুপুর গড়ের ভিত্তি মধুপুর কর্দমের উপরে হলেও উপরিভাগে রয়েছে পুরাতন গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী বিধৌত পলল মৃত্তিকা। মধুপুর গড় মূলতঃ ভূ-গাঠনিক আন্দোলনের (Tectonic Movement) ফলে সৃষ্টি উত্থিত চ্যুতিস্তূপ (Fault Block) জাতীয় ভূমিরূপ। পুরো এলাকা জুড়ে গভীর খাদ বিশিষ্ট সর্পিলকার (Meandering) ও বৃক্ষসদৃশ (Dendritic) নদী প্রবাহিত হয়ে থাকে। এর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত উঁচু। মধুপুর অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মালভূমি সদৃশ ঢাল বিশিষ্ট উঁচু ভূমি (Chala) যেগুলোর উচ্চতা ৯ থেকে ১৮ মিটার, কালো রং এর পলল সমৃদ্ধ অববাহিকা (Baid/বাইদ) বিচুর্নীভূত (weathered) সমতল ভূমি, ছোট বড় আকারের বিক্ষিপ্ত চ্যুতি স্তূপ (blocks), মৃদু তরঙ্গায়িত (undualating) ঢাল ইত্যাদি ভূমিরূপ। কেন্দ্রীয় অঞ্চলের পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে ৬ থেকে ১৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট চ্যুতি (Fault)।

(১৪) সিলেট হাওর অববাহিকা (Sylhet Haor Basin) ঃ

সুরমা-কুশিয়ারা প্লাবনভূমি, বৃহত্তর সিলেট জেলা এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বাংশ জুড়ে সিলেট বেসিন বা হাওর অববাহিকা অবস্থিত। প্রায় ৪৫০৫ বর্গ কি. মি. আয়তন বিশিষ্ট এই অববাহিকাটি সুরমা-কুশিয়ারা নদীর প্লাবনভূমির পশ্চিমাংশ। সমগ্র অঞ্চলটি মধুপুর গড় উত্থিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। সিলেট অববাহিকায় সুরমা-কুশিয়ারা নদী বাহিত প্রচুর পলি সঞ্চিত হলেও অববাহিকাটির অবনমন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় হাওর বা বিল গুলো ভরাট হতে পারে না। গত কয়েক শত বছরে সিলেট অববাহিকা ৯ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত অবনমিত হয়েছে (মর্গান ও ম্যাকিনটার, ১৯৫৯)। সিলেট অববাহিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো হলো, দক্ষিনাংশের বিল (Bils) বা হাওর (Haor) সমূহ, নদী বিচ্ছেদ (cut off), বারি আর্বত গহ্বর (Scours), প্রাকৃতিক বাঁধ (Natural levee), ইত্যাদি। হালকা ধূসর (Light Great) ও পঙ্ক-পলিযুক্ত কর্দম (Silty Clay) এই অঞ্চলের প্রধান মৃত্তিকা।

(১৫) সিলেট উচ্চভূমি (Sylhet High Plains) ঃ

সিলেটের হাওর অববাহিকার নীচু উপত্যকা সমূহের মাঝে সিলেট উচ্চভূমি অবস্থিত। এই অঞ্চলের উচ্চতা ৯ মিটার। ক্ষুদ্র নদী প্রবাহগুলো (Streams) বেশ গভীর খাদ যুক্ত। এই উচ্চভূমিতে কয়েকটি হাওর ও বিল রয়েছে, তবে এগুলো সিলেট হাওর অববাহিকার হাওর ও বিলগুলো অপেক্ষা অধিকতর উঁচুতে অবস্থিত। শীত মৌসুমের প্রারম্ভে এই হাওর ও বিলগুলো শুস্ক হয়ে পড়ে।

(১৬) সিলেট পাহাড়সমূহ (Sylhet Hills) ঃ
সিলেট জেলার উত্তর সীমান্ত বরাবর মেঘালয়া মালভূমির (Meghalaya Plateau) পাদদেশে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত কতিপয় ছোট আকারের পাহাড় (Foot Hills) পরিলক্ষিত হয়। এই পাহাড়গুলোর দক্ষিণ পূর্বাংশে রয়েছে ছাতক টিলা বা ছোট পাহাড়সমূহ যা মূলতঃ উত্তরের সিলেট পাহাড়ের বর্ধিতাংশ। সিলেট জেলায় প্রায় ১৮৬.৪৮ বর্গ কি. মি. এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই ছোট পাহাড়গুলোর উচ্চতা ৬১ মিটার থেকে ৯১ মিটার (চৌধুরী, ১৯৯৫)। এই সকল পাহাড়ের উপরিভাগ, গভীর খাদ যুক্ত স্রোতধারার (entrenched streams) দ্বারা ক্ষত বিক্ষত। পাহাড়গুলোর গাঠনিক উপাদান টারশিয়ারী যুগের বেলে পাথর, চুনাপাথর, কর্দম পাথর ইত্যাদি হলেও এর উপরিভাগ প্লায়োস্টোসিন কালের পলল দ্বারা আবৃত। পাহাড়গুলোয় সিলেট পাহাড় ও ছাতকের টিলা সমূহ ব্যতীত সিলেট জেলার দক্ষিনাংশে ছয়টি পাহাড় শ্রেনী (Hill Ranges) (Rashid,1991))। সিলেট জেলার পূর্ব সীমানায় প্রায় ৪০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত এই পাহাড় শ্রেনী চট্টগ্রাম পাহাড় শ্রেনীর বর্ধিতাংশ। এই পাহাড়শ্রেনীর উচ্চতা গড়ে ১৮৩ মিটার হলেও সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ২০৮ মিটার (কুলেরাল টিলা) (Rashid,1991)

(১৭) মেঘনা প্লাবনভূমি (Meghna Flood Plain) ঃ
মেঘনা প্লাবনভূমি সুরমা-সুশিয়ারা নদীর সঙ্গমস্থল (meeting point) থেকে দক্ষিনে চাঁদপুর জেলার পূর্বাংশে মেঘনা নদীর মোহনা পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এই সমগ্র অঞ্চলটি জুড়ে রয়েছে মেঘনার শাখানদী (distributary) তিতাস নদী বিধৌত প্লাবনভূমি, লক্ষ্যা-বংশাই দোয়াব (Doab) অঞ্চলের অংশ বিশেষ এবং মধ্য মেঘনা প্লাবনভূমি। অসংখ্য বাঁকের চর (Point Bar), নীচু উর্বর সমতল প্লাবন ভূমি (Low fertile floodplain), লম্বাটে আকৃতির চর (elongated char), দিয়ারা (Diara), ইত্যাদি। মেঘনা প্লাবনভূমির প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী। মেঘনা নদী ও এর উপনদী বাহিত বিপুল পরিমান বৃহদাকার দানা মুক্ত পলি নদীর প্রাকৃতিক বাঁধের (natural levee) পশ্চাৎ দিকে (Back Slope) সঞ্চিত হয় এবং অপেক্ষাকৃত মিহি দানাদার পঙ্কপলি (Silt) ক্রমশঃ নদীর পাড় থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে সঞ্চিত হয়। মেঘনা নদীর ক্ষয়কার্যের (erosional astivity) তীব্রতা অধিক নয়। মেঘনা নদীর নিম্ন গতিতে (**lower course**) চরসমূহ আকস্মিক ভাবে পরিবর্তন প্রবন (Sudden change) হলেও উর্ধ্বগতিতে চরসমূহ বেশ স্থিতিশীল।

(১৮) ত্রিপুরা সমতল (Tippera Surface) ঃ
ত্রিপুরা পর্বতের পাদদেশে বাংলাদেশে কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ, নোয়াখালী ও সিলেট জেলার কতকাংশ জুড়ে এই সমতল ভূমি অবস্থিত। আয়তক্ষেত্রাকার নদী ব্যবস্থা (Rectangular pattern drainage pattern) বিশিষ্ট এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অন্যান্য প্লাবনভূমির মৃত্তিকা অপেক্ষা অধকতর জারিত (Oxidised)। তিনটি উপবিভাগ বিশিষ্ট এই ভূ-ভাগ বেশ বৈচিত্রপূর্ণ।

(i) **পূর্ব পাদদেশীয় ভূ-ভাগ ও লালমাই পাহাড় শ্রেনী (Eastern Piedmont Strip & Lalmai** Range) ঃ ত্রিপুরা পর্বত পাদদেশীয় এই অঞ্চল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ২ থেকে ১৫ কি. মি. পর্যন্ত চওড়া, প্লাইয়োষ্টোসিন পলল নির্মিত পর্বত বিধৌত বালুকাময় কর্দম আচ্ছাদিত এই ভূ-ভাগটি প্লাইয়োষ্টোসিন চত্বরের অন্তর্ভূক্ত। কুমিল্লা শহরের পশ্চিমে অবস্থিত ১৫ কি. মি. দীর্ঘ ও প্রায় ১.৫ কি.মি. চওড়া লালমাই পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৪৬ মিটার। এটি গঠনগত দিক থেকে একটি গ্রস্থ মালভূমি (Horst)।

(ii) **নীচু প্লাবনভূমি (Low floodplain)** ঃ দক্ষিণ নবীনগর থেকে মাইজদী পর্যন্ত বিস্তৃত এই দীর্ঘ নীচু প্লাবনভূমি প্রায় সমতল ও চওড়া উত্থিত ভূমি (ridges) ও অববাহিকা (basins) বিশিষ্ট এই ভূ-ভাগ বর্ষা মৌসুমে মেঘনা-গুমতি-ডাকাতিয়া নদীর পানি দ্বারা প্লাবিত হয়।

(iii) **বিচ্ছিন্ন উঁচু প্লাবনভূমি (High Floodplain)** ঃ স্বল্প গভীরতায় প্লাবিত হয়ে ডাকাতিয়া, ছোট ফেনী ও গুমতী নদীর তীর অঞ্চল বিচ্ছিন্ন ভাবে সংকীর্ণ উত্থিত ভূমি ও অববাহিকা বিশিষ্ট হলেও বাকী অঞ্চলে প্রশ্বস্ত উত্থিত ভূমি ও অববাহিকা পরিলক্ষিত হয়। লালমাই পাহাড় শ্রেনী ও ত্রিপুরা পাহাড় -এর মধ্যবর্তী কুমিল্লা উপত্যকাটি (Comilla Basin) -একটি গ্রস্থ উপত্যকা মনে করা হয়।

(১৯) মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চল (Moribund Delta) ঃ
বৃহত্তর কুষ্টিয়ার কিয়দংশ ও খুলনা জেলার উত্তরাংশ জুড়ে বিস্তৃত অংশটি গঙ্গা নদী ও এর শাখা নদী বিধৌত ব-দ্বীপ ভূমি। এই অঞ্চলের নদীগুলো বালু সঞ্চিত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। গঙ্গা নদীতে ভারী বন্যা (high flood) সংঘটিত হলে কেবলমাত্র কিছু পরিমান পানি নদী গুলো দ্বারা প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলের নদীগুলো সর্পিলাকার (meandering), বহু সংখ্যক অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (Oxbow Lake), নীচু দোয়াব অঞ্চল (Interfluve depression) এবং উচ্চ প্লাবনভূমি (High Floodplain) এই অঞ্চলের প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। সমস্ত অঞ্চলটি বালুময় মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা বাকী এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ।

(২০) কেন্দ্রীয় ব-দ্বীপ অববাহিকা/পর্যঙ্ক (Central Delta Basin) ঃ
গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের মধ্যভাগে ফরিদপুর-বরিশাল এলাকায় অবস্থিত বিস্তৃত অগভীর এক সারির অববাহিকা বা নীচু জলাভূমি (basin or depression) রয়েছে। এই গুলো স্থানীয়ভাবে ‘ঝিল’ নামে পরিচিত (চৌধুরী,

১৯৮৮)। তবে ১৯৩১ বর্গ কি. মি. আয়তনের এই অববাহিকা বা নীচু জলাভূমি 'ফরিদপুর বিল এলাকা' (Faridpur Bill Area) হিসেবেও সুপরিচিত ((Rashid,1991))। এই অববাহিকা বা নীচু জলাভূমি সমূহ ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়ার (tectonic processes) ফলে সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারনা করা হয় (মর্গান ও ম্যাকিনটার, ১৯৫৯)।

(২১) অপরিণত ব-দ্বীপ অঞ্চল (Immature Delta) ঃ

মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিনে প্রায় সমুদ্র সমতলের সমান উচ্চ চওড়া ভূ-ভাগকে অপরিনত ব-দ্বীপ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। খুলনা ও পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত সুন্দরবন বনাঞ্চল ও কৃষিভূমিসহ প্রায় ৪৮২৭ কি. মি. এলাকা জুড়ে অপরিনত ব-দ্বীপ অঞ্চল বিস্তৃত ((Rashid,1991))। স্রোতজ সমভূমি (Tidal Plain) বা উপকূলীয় লবনাক্ত সমভূমি (Coastal Saline Plain) নামে অভিহিত এই অঞ্চলের ভূমির বেশ কিছু সংখ্যক নদীমালা দ্বারা অবক্ষেপিত পলি সঞ্চিত হয়ে তৈরী হয়েছে (চৌধুরী, ১৯৮৮)। পর্যাপ্ত পলি সঞ্চয়নের অভাব (absence of adequate deposition) ও ভূমির অবনমনের (subsidence) ফলে এই অপরিনত ব-দ্বীপ (Immature delta) অঞ্চল গঠিত হয়েছে বলে ধারনা করা হয় (রশীদ, ১৯৮৮)। নীচু পাড় বিশিষ্ট অগভীর নদীমালা, বালিয়াড়ির সারি (Sand dune ridges) কর্দম সমতল (mud flat), খাঁড়ি ও বিস্তীর্ণ মগ্নচড়া (extensive shoals) ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী।

(২২) পরিণত ব-দ্বীপ অঞ্চল (Mature Delta) ঃ

মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ ও স্রোতজ ব-দ্বীপ ভূমির মধ্যভাগে পরিণত ব-দ্বীপ ভূমি অবস্থিত। কপোতাক্ষ ভদ্রা-ভৈরব ইত্যাদি নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলে পুরাতন গঙ্গা প্লাবনভূমির (old Ganges flood plain)। কিছু এলাকা পদ্মা-মধুমতি প্লাবনভূমি, অলবনাক্ত স্রোতজ প্লাবনভূমি (mon-saline tidal flood plain) ও লবনাক্তা স্রোতজ প্লাবনভূমির (saline tidal flood plain) সমন্বয়ে এই অঞ্চল গঠিত। আড়িয়াল বিল, উত্তর-পশ্চিমের অগভীর ভাবে প্লাবিত ভূমি, দক্ষিন-পশ্চিমাংশের গভীরভাবে প্লাবিত অববাহিকা, নদী তীরের প্রাকৃতিক বাঁধ (natural levees), ও বড় নদীর মধ্যবর্তী স্থানে আড়াআড়ি স্রোতধারা (cross-channel) ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রধান ভূ-পাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।

(২৩) সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল (Active Delta) ঃ

পদ্মা নদীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত চর ও দিয়ারা সমূহ, নিম্ন মেঘনায় মেহেন্দীগঞ্জ দ্বীপ বা চর এবং মেঘনা মোহনাস্থ তিনটি খাঁড়ি, যেমন : হরিনঘাটা, আগুনমুখা ও মেঘনায় সৃষ্ট বালুচর (sand bars) এবং অগনিত চর নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের চরগুলোকে এখনও সৃষ্টি ও ভাঙ্গন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। আরও দক্ষিনে রয়েছে ভোলা, রামগতি, হাতিয়া ও সন্দ্বীপ-এর ন্যয় বৃহদাকার দ্বীপসমূহ। তেঁতুলিয়া নদী, শাহবাজপুর নদী, হাতিয়া প্রনালী (Channel) ইত্যাদি এ অঞ্চলের প্রধান স্রোতধারা। বৃহদাকার মগ্নচড়া (shoals) ও মেঘনা ও বড় ফেনী নদী বাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে মেঘনা মোহনাস্থ সমতলভূমির আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(২৪) চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল (Chittagong sub-region) ঃ

চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চলটি ফেনী নদীর দক্ষিনে অবস্থিত নানা ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত এক বৃহৎ ভৌগোলিক উপ-অঞ্চল। তরঙ্গায়িত পর্বতমালা, উপত্যকা, ঝরণা, খাল, দ্বীপ ও সন বনাঞ্চল নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চলকে একটি ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। ফেনী নদীর তীর থেকে মাতামুহুরী ব-দ্বীপ পর্যন্ত এক থেকে পনের ফুট চওড়া ও ১২১ কি. মি. দীর্ঘ সমুদ্রতীর, সীতাকুন্ড, জলদি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী লম্বাকৃতির উপত্যকা, চকোরিয়া সুন্দরবন, মাতামুহরী নদীর বদ্বীপ, মহেশখালী দ্বীপ ও প্রনালী, সোনাদিয়া দ্বীপের কর্দম ভূমি (mudflat), কুতুবদিয়া ইত্যাদি চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম।

পাহাড়ী এলাকার মধ্যে পশ্চিমের সীতাকুন্ড পাহাড় (৩৫২ মি. সর্বোচ্চ শৃঙ্গ), চিম্বুক পাহাড়, টেকনাফ পাহাড় এবং পূর্বের রাম পাহাড় (৪৩৬ মি.), বরকল পাহাড় (৫৭২ মি), পাহাড় মধ্যবর্তী উপত্যকা এবং ঝরনাসমূ চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান পার্বত্য ভূমিরূপ।

এছাড়া কর্ণফুলী নদী, কাসালং নদী, কাপ্তাই লেক (৬৪৪ বর্গ কি. মি.) বাঁকথালী নদী ও উপত্যকা, নাফ নদী ও টেকনাফ সমভূমি, দক্ষিনের বেলাভূমি, ভৃগু (cliff), চূনাপাথর ও প্রবাল নির্মিত ক্ষুদ্র দ্বীপ (islet) সেন্ট মার্টিন এবং জিনজিরা প্রবাল প্রাচীর (coral reef) টেকনাফ উপদ্বীপের (peninsula) প্রায় সাত কি. মি. দক্ষিন-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. **সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন এবং অঠিক উত্তরের পাশে × চিহ্ন দিনঃ**

১.১. সাধারণভাবে ভূমির অবস্থা ও গঠনকাল অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূরূপকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়।

১.২. মূলতঃ ভূ-প্রকৃতি ও ভূ-সংস্থান সমার্থক বোধক।

১.৩. বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপভূমি এবং বঙ্গ অববাহিকা নামে বহুল পরিচিত।

১.৪. চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যতীত অবশিষ্ট্য বাংলাদেশ প্রাচীন ও সাম্প্রতিক কালের বহু সংখ্যক নদীবাহিত পলল অবক্ষেপনের ফলে গড়ে উঠেছে।

১.৫. নিম্ন আত্রাই অববাহিকা অঞ্চলই চলন বিল নামে পরিচিত।

১.৬. হিমালয়ের পাদদেশীয় পলল সমভূমি প্রাচীনতম পলল সমভূমি অঞ্চল।

১.৭. ঢাকা জেলার দক্ষিণ অংশে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী প্লাবন সমভূমি নিয়ে আড়িয়াল বিল গঠিত হয়েছে।

১.৮. বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ছোট একটি দ্বীপ, স্টেন্টমার্টিন।

১.৯. সেন্টমার্টিন মূলতঃ একটি প্রবাল দ্বীপ।

১.১০.গাজীপুর, টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহের অংশ বিশেষ নিয়ে মধুপুর ট্রাক্ট।

২. **শূন্যস্থান পুরণ করুন ঃ**

২.১. তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদী .... প্লাবন সমভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

২.২. হারুন অর রশিদ ...., ... বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধান .... প্রধান ভাগ, সঙ্গে .... এককে বিভক্ত করেন।

২.৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ের পার্শ্বদিয়ে সাঙ্গু , ... ইত্যাদি নদী প্রবাহিত হয়ে মঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

২.৪. দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে দেখা যায় প্লেস্টোসিন যুগের .... ভূমি যা সামান্য .... অপেক্ষাকৃত .... সমভূমি।

২.৫. খুলনা ও পটুয়াখালী জেলায় রয়েছে .... নামক বনভূমি, যা মূলতঃ .... বনভূমির অর্ন্তভূক্ত।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. হিমালয় পাদদেশীয় সমভূমি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. প্লেস্টোসিন যুগের চত্বরসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. ব্রক্ষপুত্র-যমুনা প্লাবনভূমি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. গঙ্গা নদী প্লাবন সমভূমিসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

৫. ত্রিপুরা সমতলভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের ভূ-সংস্থানগত শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

২. হারুন-অর-রশিদ প্রদত্ত বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী পরিণত, অপরিণত ও মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চলের বর্ণনা দিন।

পাঠ-১.৩

বাংলাদেশের জলবায়ু
(Climate of Bangladesh)

এই পাঠ পড়ে আপনারা জানতে পারবেন-

- জলবায়ু ও এর উপাদানসমূহ
- বাংলাদেশের জলবায়ুর শ্রেণী বিভাজন
- বাংলাদেশের জলবায়ুর অঞ্চলসমূহ এবং
- বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে।

বাংলাদেশের জলবায়ু (Climate of Bangladesh)ঃ

বাংলাদেশ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর দেশ। কর্কট ক্রান্তি রেখা (২৩$^{১}/_{২}$° উঃ) বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করায় এদেশে ক্রান্তীয় জলবায়ুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উষ্ণ-আর্দ্র গ্রীষ্মকাল, শুষ্ক-শীতল শীতকাল এবং বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও ষড়ঋতুর এই দেশের প্রতি ঋতু ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এদেশের জলবায়ু, তথা প্রতিটি ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাতের তারতম্য, আর্দ্রতা, ও ঝড়-ঝঞ্ঝা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কোন অঞ্চলের জলবায়ু বা তার যে কোন উপাদান একক বা সম্মিলিতভাবে সে অঞ্চলের জীবজন্তু, উদ্ভিদ, মানুষ, ইত্যাদির কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রক হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

জলবায়ু (Climate) ঃ

কোনো একটি বৃহৎ স্থান বা অঞ্চলের বায়ুর তাপ, চাপ, বায়ু প্রবাহ, আর্দ্রতা ও বারিপাত ইত্যাদি উপাদানগুলোর দীর্ঘ দিনের (২০ বা ৩০ বছরের) গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয়।

জলবায়ুর উপাদান (elements) ও নিয়ন্ত্রক (controls) সমূহ ঃ

জলবায়ুর উপাদান বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চলের তাপমাত্রা (tamparatere), বায়ুচাপ (pressure), বায়ু প্রবাহ (winds) আর্দ্রতা (humidity) এবং বারিপাত (precipitation) ইত্যাদি বোঝায়।

অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট স্থানের জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে কতগুলো নিয়ন্ত্রকের দ্বারা। এই নিয়ন্ত্রক গুলো (controls) হলো, অক্ষাংশ বা অক্ষরেখা (latitude), উচ্চতা (altitude), সমুদ্র স্রোত (ocean currents) ভূমি বন্ধুরতা (relief), বায়ুমন্ডলীয় গোলযোগ (storms cyclones), স্থল ও জলভাগের অবস্থান (position relative to continents), ইত্যাদি।

এই নিয়ন্ত্রকগুলো (controls) আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলোর পারিসরিক বা স্থানিক (spatial) ও সময়গত (temporal) বিস্তরন নির্ধারণ করে মূলতঃ বিভিন্ন ধরণের জলবায়ু অঞ্চলের সৃষ্টি করে।

জলবায়ুর উপাদানসমূহ (Climatic Elements) ঃ

কোন একটি বৃহৎ অঞ্চলের জলবায়ুর উপাদানসমূহ একক অথবা সম্মিলিতভাবে সে অঞ্চলের নানা প্রজাতির জীব ও উদ্ভিদ, বিভিন্ন শ্রেণীর মৃত্তিকা, এবং সেই অঞ্চলে বসবাসরত মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় এক ব্যাপক ও শক্তিশালী ভূমিকা রেখে থাকে। অতএব, যে কোন একটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানতে হলে, ঐ অঞ্চলের জলবায়ু সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। নিম্নে বাংলাদেশের জলবায়ুর উপাদান সমূহ (elements) সম্পর্কে ধারণা দেয়া হলো।

ক. তাপমাত্রা (Temparature)ঃ

জলবায়ুর উপাদান হিসেবে তাপমাত্রা হলো, একটি স্থানের প্রকৃত তাপমাত্রা ও সেই স্থানের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও বায়ুপ্রবাহের ফলে অনুভূত উষ্ণতা বা শীতলতার (heat or cold) পরিমাণ বা ডিগ্রী (Arora, 1995)।

বাংলাদেশের তাপমাত্রা ক্রান্তীয় থেকে উপক্রান্তীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা (mean annual temperature) হচ্ছে ২৫° সে. এবং গ্রীষ্ম কালে গড় তাপমাত্রা ৩০.৪° সে. (কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম) থেকে ৩৬° সে. (রাজশাহী) পর্যন্ত পৌঁছে। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ও মৃতপ্রায় বদ্বীপ (Moribund) অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিন শুষ্ক ও উষ্ণ পশ্চিমা (paschi) বায়ুপ্রবাহিত হয় (Rashid,1991)। কখনও কখনও বজ্রঝড় (Thunder storm) হয়। অন্যদিক, দেশের পূর্বাঞ্চলে এ ঋতুতে বজ্রঝড় অপেক্ষাকৃত অধিক হলেও তাপমাত্রা কিঞ্চিত কম।

চিত্র ১.৩.১ ঃ বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জুলাই)

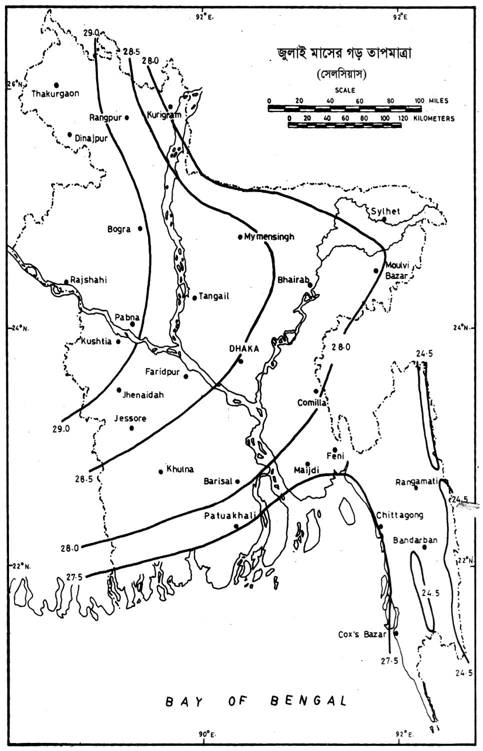

চিত্র ১.৩.২ ঃ বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারী)

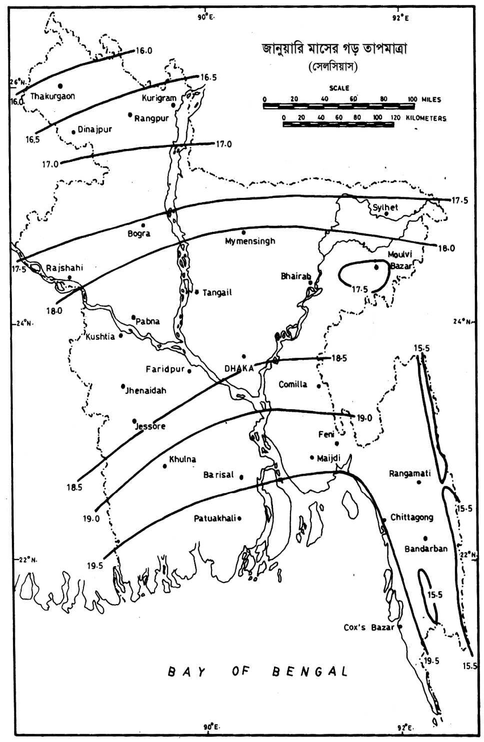

উৎস ঃ হারুন-অর-রশিদ, ১৯৯১

খ. বৃষ্টিপাত (**Rainfall**) ঃ

বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের উৎস্য মুলতঃ তিনটি। এই তিনটি হলোঃ (i) শীতকালীন পশ্চিমা নিম্নচাপ জনিত বৃষ্টিপাত (western depression of winter), (ii) গ্রীষ্মকালীন উত্তর পশ্চিমা বজ্রঝড় (early summer thunderstorm or Norwester) (iii) দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টিপাত (Monsoon) (রশীদ, ১৯৯১)

(i) শীতকালীন বৃষ্টিপাতের উৎস্য পশ্চিম দিক হতে আগত শীতল ও ভারী বায়ু। এই বায়ু হিমালয় পাদদেশে আসাম ও বাংলাদেশে শীতকালে অর্থাৎ মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৩০/৩৫ দিন বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ সময়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ১ সে.মি. (কক্সবাজার) থেকে উত্তরাঞ্চলে ৪ সে.মি. (শ্রীমঙ্গল) বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে (রশীদ, ১৯৯১)

(ii) গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বাংলাদেশে বজ্রঝড় ও বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। কালবৈশাখী নামে পরিচিত এই ঝড়ের আগমন যে কোন দিক হতে সংঘটিত হলেও মূলতঃ উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিক হতে আসে বলে একে **উত্তর-পশ্চিমা বজ্রঝড়** অভিহিত করা হয়। কালবৈশাখী ঝড় নানা কারণে সংঘটিত হলেও প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত শীতল ও শুষ্ক বায়ুর সাথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর সংঘর্ষের ফলে বজ্রঝড়সহ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

চিত্র নং ঃ ১.৩.৩ : বাংলাদেশের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত

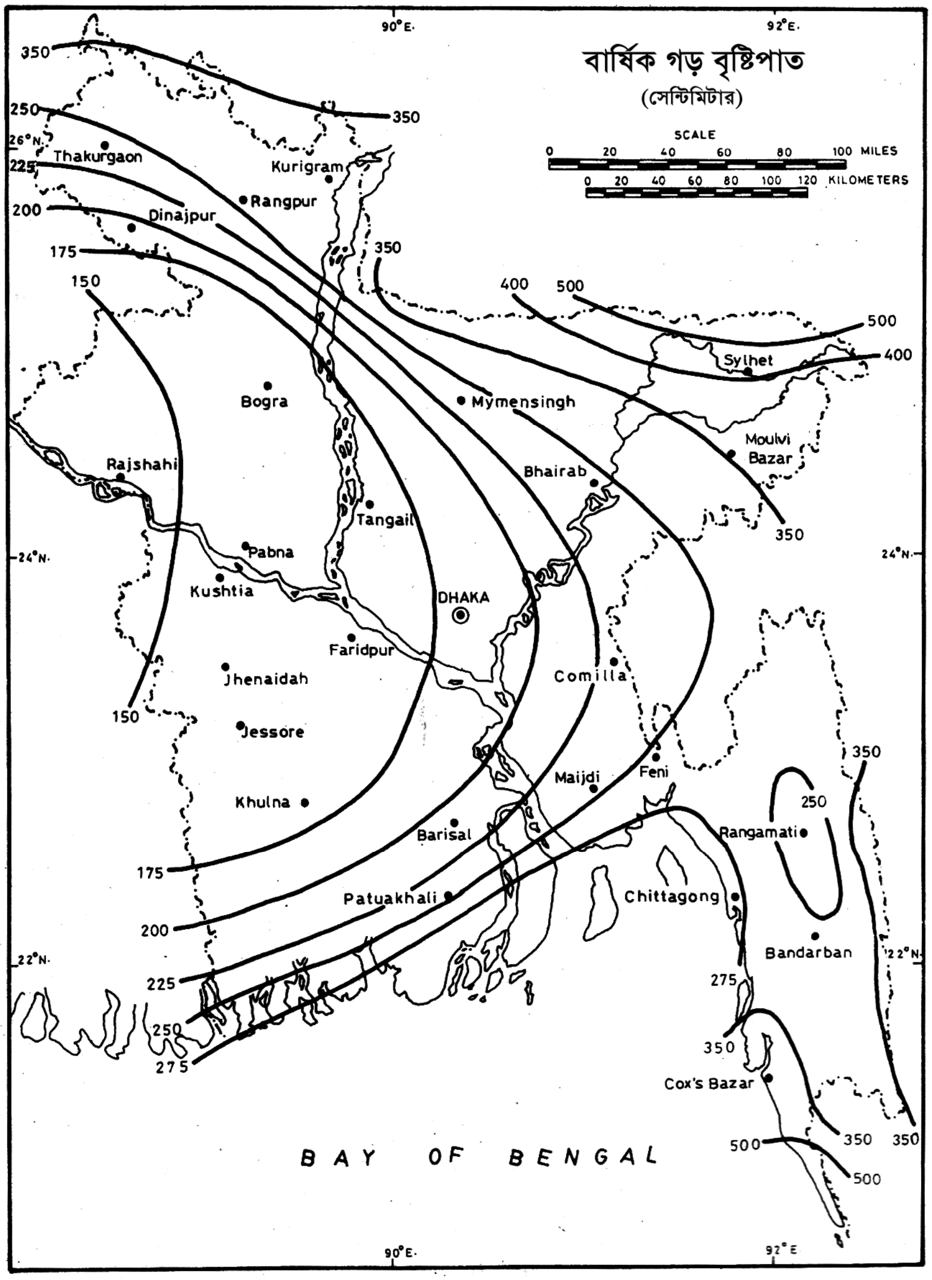

উৎস ঃ হারুন-অর-রশিদ, ১৯৯১

কালবৈশাখী ঝড় -এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, স্বল্প সময়ে ভারী বৃষ্টিপাত। বজ্রপাত ও ঝড়ো বায়ুপ্রবাহ (গড়ে ১০০ কি.মি. প্রতি ঘন্টায়) বিশিষ্ট এই কালবৈশাখী সাধারণত মার্চ মাসে আবির্ভূত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারী মাসেও আবির্ভূত হয় (চৌধুরী, ১৯৯৫)। আবার মে মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই বজ্রঝড় সংঘটিত হলেও জুন মাসে মৌসুমী বায়ুর আগমনের সাথে সাথে কালবৈশাখী অর্ন্তনিহিত হয়ে যায়।

(iii) জুন মাসে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বৃষ্টিপাত (Monsoon Rain)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বর্ষার আগমন হয়। এ ঋতুতে উষ্ণ ও জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ পশ্চিম বানিজ্য বায়ু (south-west trades) অত্যন্ত উত্তপ্ত ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপাসগরে পৌঁছে। এই উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু পরিচলন প্রক্রিয়ার সাহায্যে কিছুটা উর্ধ্বে উঠে আরও উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এই আর্দ্র বায়ু মায়ানমার সীমান্তে আরাকান-ইয়োমা পর্বত, উত্তরে মেঘালয় মালভূমি এবং হিমালয় পর্বত গাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। দেশের পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে, যেমন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৯৮০ মিলিমিটার, ঢাকা ১৮৩০ মি.মি. এবং পাবনায় ১৫০০ মি.মি. (চৌধুরী, ১৯৯৫)। এ সময়ে পর্বতের পাদদেশে এবং উপকূলবর্তী এলাকায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কক্সবাজারে ৩৫৫৬ মি.মি. এবং সিলেটে ৩৯৮৮ মি.মি. বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের পাঁচ ভাগের চারভাগ বৃষ্টিপাত বর্ষাকালে সংঘটিত হয়। এ সময়ে বায়ুর আর্দ্রতা শতকরা ৮০ ভাগের উর্ধ্বে থাকে। বর্ষাকলে প্রবাহিত দক্ষিণ পশ্চিম বাণিজ্য বায়ুর অপর নাম মৌসুমী বায়ু (South-West Trades)। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এ সময়ে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় বলে এই সময়ের জলবায়ুকে মৌসুমী জলবায়ু বলা হয়।

সারণী ১.৩.১ ঃ বাংলাদেশের বিভাগীয় শহরের মাসিক গড় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত, ১৯৯৭

বিভাগীয় শহর	তাপমাত্রা (সেমি)		বৃষ্টিপাত (মিমি)
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	
চট্টগ্রাম	৩২.৫	১৪.১	৩০৬৯
সিলেট	৩২.৭	১২.১	-
ঢাকা	৩৩.৭	১১.৫	১৪৫৫
বরিশাল	৩৩.৪	১০.৮	১৭৬০
খুলনা	৩৪.২	১০.৯	১৮১৮
রাজশাহী	৩৬.৪	৮.০	২০০৬

উৎস ঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ, ১৯৯৯

গ. কুয়াশা, কুজ্ঝটিকা, শিশির ও তুহিন (Fog, Mist, Dew and Hoar-Frost)

বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কুয়াশা ও কুজ্ঝটিকা এক সাধারণ চিত্র। এ সময়ে ঘন কুয়াশা ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী, সিলেট জেলা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে বিরাজ করে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী এই দুইমাসে শিশির পাতের পরিমাণ ও অনেক বেশী। পার্বত্য চট্টগ্রামের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গে শীতকালে তুহিনপাত হয়ে থাকে।

আর্দ্রতা (Humidity) ঃ

বাংলাদেশে প্রায় সারা বছর বায়ুতে আর্দ্রতার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। মার্চ ও এপ্রিল মাসে এদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বায়ুতে আর্দ্রতার পরিমাণ সবচাইতে কম।তবে দেশের পূর্বাঞ্চলে সবচাইতে কম আর্দ্রতার উপস্থিতি জানুয়ারি, ফ্রেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে (ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫৮.৫% ভাগ) দেখা যায়। বাংলাদেশে সারা বছরের গড় আর্দ্রতা কক্সবাজারে ৭৮.১০% ভাগ ও পাবনায় ৭০.৫০% ভাগ (রশীদ, ১৯৯১)।

বায়ুপ্রবাহ (Winds) ঃ

শীতকালে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত উত্তর পশ্চিম দিক থেকে, পূর্বাঞ্চলে উত্তর দিক থেকে এবং উত্তরাঞ্চলে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত দেশের পশ্চিমার্ধে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়। অপর দিকে, এ সময়ে দেশের পূর্ব দিকে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে। এ সময়ে সংঘটিত কালবৈশাখী ঝড় বায়ুপ্রবাহের গতি পরিবর্তন করে বিরাজমান উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় স্বস্তি দান করে। জুন থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে বায়ু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। অক্টোবরে বায়ুপ্রবাহের দিকে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষা উত্তর দিক হতে প্রবাহিত বায়ুর প্রাধান্য বেশী পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং বায়ুর সর্বনিম্ন আর্দ্রতা (৩৬% ভাগ) বজায় থাকে।

বাংলাদেশে প্রায় মধ্যভাগ বরাবর কর্কট ক্রান্তীয় রেখা (Tropic of Cancer) অতিক্রম করেছে। গ্রীষ্মকালে ক্রান্তীয় রেখা বরাবর সূর্যরশ্মি খাড়া ভাবে পতিত হওয়ায় ঐ এলাকার বায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও হালকা হয়ে উর্ধ্ব দিকে প্রবাহিত হলে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত বায়ু অর্ন্তনিহিত হয়ে যায়। ফলে ঐ স্থানে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত হয়ে আসে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু নামে পরিচিত এই বায়ু প্রবাহ মূলতঃ দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর সম্প্রসারিত অংশ, যা নিরক্ষরেখা অতিক্রম বরাবর সময়ে ফেরেলের সূত্রানুযায়ী উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুতে পরিণত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশে শীতকালে সাধারণতঃ উত্তর দিক হতে এবং গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকালে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে বায়ু প্রবাহিত হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালী বজ্রঝড় (বায়ুর গতিবেগ ৫০-১০০ কি.মি./ঘন্টা) ও প্রাক বর্ষা ও বর্ষাকাল উত্তর সময়ে সৃষ্ট ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং গ্রীষ্মকালে প্রায়শঃ সংঘটিত টর্নেডো ব্যতীত বাংলাদেশে সারা বছর মৃদু বায়ুপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয়।

বায়ুমন্ডলীয় চাপ (Atmospheric Pressure) ঃ

মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকালে বাংলাদেশে বায়ুমন্ডল অত্যন্ত শীতল ও ভারী হয়ে থাকে। জানুয়ারি মাসে বায়ুমন্ডলের গড় চাপ ১০২০ মিলিবার পর্যন্ত পৌঁছে। এই সময়ে উত্তর পূর্বে চীন ও সাইবেরিয়া থেকে শীতলতর বায়ু প্রবাহ ব্রক্ষপুত্র ও গঙ্গা অববাহিকা দিয়ে উত্তর দিক থেকে বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাসে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর আবহাওয়ার ফলে এ সময়ে বায়ুমন্ডল উষ্ণ ও হালকা (১০০৫ মিলিবার) হয়ে থাকে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ু এ সময়ে বাংলাদেশের আবহাওয়াকে উষ্ণ করে তোলে। মে-জুন ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বায়ুপ্রবাহের দিক ও সেই সঙ্গে বায়ুমন্ডলীয় চাপের পরিবর্তন ঘটায় এ সময়ে প্রায়শঃ ঝড়ো আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বজ্রঝড়, ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি বায়ুমন্ডলীয় গোলযোগ এই সময়কালে পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চলের শ্রেণী বিভাগ ঃ

বাংলাদেশের জলবায়ু যথেষ্ট্য বৈচিত্র্যময়। এদেশে ছয়টি ঋতুর প্রত্যেকটি পৃথক বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। এই পাঠে আলোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশের জলবায়ুকে প্রধান তিনটি ঋতুতে বিভক্ত করা হয়। যেমন-

ক) **শীতকাল ঃ** সূর্যের দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থানের ফলে, বাংলাদেশে প্রতি বছর নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি, কোন কোন সময়ে মার্চ মাস পর্যন্ত শীতকাল বিরাজ করে। এ সময়ে গড়ে সর্বোচ্চ ২৯° সে. থেকে সর্বনিম্ন ১১° সে. তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। আকাশ মেঘমুক্ত ও নির্মল থাকে, বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণও কম থাকে। রাতের বেলা শিশিরপাত ও সকাল বেলায় কুয়াশাছন্ন আকাশ শীতকালের বৈশিষ্ট্য। জানুয়ারি মাস শীতকালের শীতলতম মাস (গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সে.)। জানুয়ারি মাসে দেশের দক্ষিণাংশে চট্টগ্রামে ২০°সে., মধ্যম অবস্থানে ঢাকায় ১৮.৩° সে. এবং উত্তরাংশে দিনাজপুরে ১৬.৬° সে. তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। তবে দেশের একেবারে উত্তরে তাপমাত্রা ৮° সে. বা তারও নীচে ৫° সে. এ নেমে আসে। এ সময়ে রাজশাহীতে ৫° সে. ও ইশ্বরদীতে ৬° সে. তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয় (সারনী ১.৩.১)। শীতকাল বেশ উপভোগ্য, শীতল ও আরামদায়ক হলেও কোন কোন সময়ে তীব্র শীতের প্রকোপ জনজীবনে দূর্ভোগ বয়ে আনে।

খ) **গ্রীষ্মকাল ঃ** মার্চ মাসের মধ্যভাগ থেকে মে/জুন মাস সময়ে কালে সূর্য্য উত্তর গোলার্ধে অবস্থান করে। ফলে এ সময়ে বাংলাদেশে সূর্যরশ্মি খাড়া ভাবে পতিত হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এই সময়কাল গ্রীষ্মকাল নামে পরিচিত। উষ্ণ আর্দ্র মেঘমুক্ত আবহাওয়া, কখনও কখনও তাপ প্রবাহ (Heat wave), অপরাহ্নে বৃষ্টিপাত ও পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কালবৈশাখী ঝড় এই ঋতুর বৈশিষ্ট্য। এ সময়ে দেশের দক্ষিনাঞ্চলে (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) তাপমাত্রা গড়ে ৩০.৪° সে. হলেও তাপমাত্রা উত্তরদিকে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। দেশের মধ্যভাগে ঢাকায় তাপমাত্রা ৩৪° সে. এবং আরও উত্তরে ঈশ্বরদী (৪৩° সে.) ও রাজশাহী (৪৪° সে.) তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়।

গ) **বর্ষাকাল ঃ** জুনের মধ্যভাগ হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের বর্ষাকাল। বছরের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৮০ভাগ বৃষ্টি এই ঋতুতেই হয়ে থাকে। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে হতে আগত মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। এই ঋতুতে গড় তাপত্রামা সর্বোচ্চ ৩১° সে. নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, আর্দ্র বাতাস, এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত এই ঋতুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো বছরে

অতিবৃষ্টির কারণে বণ্যা সংঘটিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে তাপমত্রার সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ গ্রীষ্ম প্রধান এই দেশে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মধ্যম মাত্রার তাপমাত্রা এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তাপমাত্রা বেশ কম থাকে অর্থাৎ এ সময়ে শীত কাল বিরাজ করে।

বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চল সমূহ:

ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশের জলবায়ুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সনাক্ত পূর্বক জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ এদেশেকে কতিপয় জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ভণ্ঢাদিমির কোপেন স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ (Natural Vegetation), মাসিক গড় তাপমাত্রা (mean temperature), গড় বারিপাত (precipitation) ও বার্ষিক গড় তাপমাত্রা (mean annual temperature)-এর ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীকে কতিপয় জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে,বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল শুষ্ক শীতকাল ও আর্দ্র উপক্রান্তীয় (Cwa) জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। অন্যদিকে, দেশের বাকী অংশ ক্রান্তীয় মৌসুমী (Am) জলবায়ুর অন্তর্গত। নিম্নে বাংলাদেশের কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী জলবায়ুর শ্রেনীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হ'লো।

১। **প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ** ঃ তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে মোট সাতটি জলবায়ু উপ-অঞ্চলে (sub-zone) বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো ঃ (i) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (ii) উত্তর-পূর্বাঞ্চল (iii) উত্তরের উত্তরাঞ্চল (iv) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (v) পশ্চিমাঞ্চল (vi) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (vii) দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল।

২। **অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী** ঃ বাংলাদেশকে সাধারণভাবে ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত উল্লেখ পূর্বক তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ইত্যাদির ভিত্তিতে সমগ্র দেশকে কতিপয় জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো ঃ

(i) ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় শুষ্কপ্রায় জলবায়ু (Tropical- Subtropical Semi-arid Climate)
(ii) ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় আর্দ্রপ্রায় জলবায়ু (Tropical- Sub Humid Climate)
(iii) ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় আর্দ্র জলবায়ু (Tropical- Humid Climate)
(iv) ক্রান্তীয় উপক্রান্তীয় সামুদ্রিক জলবায়ু (Tropical- Maritime Climate)
(v) ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল (Tropical Wet Climate)
(vi) উপক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল (Subtropical Wet Climate)

৩। **প্রফেসর এম. আমিনুল ইসলাম** ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পানি ঘাটতির উপর নির্ভর করে বাংলাদেশকে কতিপয় জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। যেমন ঃ (i) আর্দ্র ও বৃষ্টিবহুল পূর্বাঞ্চল, (ii) শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন পশ্চিমাঞ্চল, (iii) অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টি, কম তাপমাত্রা, ও কম পানি ঘাটতি সম্পন্ন মধ্য অঞ্চল।

৪। **প্রফেসর নাফিস আহমেদ** ঃ বাংলাদেশকে সাধারণভাবে কতিপয় জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন। যেমন ঃ (i) মহাদেশীয় (ii) উন্নত মহাদেশীয় (iii) নাতিশীতোষ্ণ (iv) সামুদ্রিক (v) শীতল বৃষ্টিবহুল ও (vi) পাহাড়ী অঞ্চল।

জলবায়ুর উপরোক্ত সকল শ্রেনীবিভাগের মধ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশিষ্ট ভূগোলবিদ **প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ** কর্তৃক উপস্থাপিত জলবায়ুর অঞ্চল ভিত্তিক শ্রেনীবিভাগটি সর্বাধিক প্রযোজ্য হওয়ায় এখানে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হ'লো।

ক) **দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (South-Eastern Climatic Region):** চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা, পটুয়াখালী, দক্ষিণ-পশ্চিম সুন্দরবন ও তদসংলগ্ন উপকূলীয় এলাকা এবং কুমিল্লা জেলার দক্ষিনাংশ এই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত, ৩০০ মিটারের অধিক উচ্চতর পাহাড়গুলো **'খ'** ধরনের জলবায়ুর অন্তর্গত। বাকী অঞ্চলের তাপমাত্রা ১৩° সেঃ থেকে ৩২° সেঃ পর্যন্ত উঠানামা করে। পাহাড়ী অঞ্চল হওয়ায় অধিক পরিমানে বৃষ্টিপাত (২৫৪ সে. মি.) হয়ে থাকে। শীতকালে শিশিরপাতের পরিমানও বেশী হয়ে থাকে। কোপেন -এর শ্রেনীবিভাজন অনুযায়ী এই অঞ্চলটি AM শ্রেনীর অন্তর্গত।

(খ) **উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল** (North-Eastern **Climatic Region**) ঃ সিলেটের পূর্ব ও দক্ষিণের প্রায় সমগ্র অঞ্চল এবং উত্তরাংশে মেঘালয়ের দক্ষিণের একটি সংকীর্ণ অঞ্চল এ ধরনের জলবায়ুর অন্তর্গত। এই অঞ্চলে সর্বাধিক তাপমাত্রা ৩২° সে. পর্যন্ত পৌছালেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০° সে.

অথবা আরও নীচে নেমে যায়। গড় আর্দ্রতা **'ক'** অঞ্চলের তুলনায় অধিক। বাংলাদেশের এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমান সর্বাধিক (গড়ে ৩৪০০ থেকে ৪৬০০ মিলিমিটার)। তবে সিলেটের উত্তর-পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত ৫৮০০ মিলিমিটার সমবর্ষণ রেখা (Isohyet Line) অতিক্রম করে। উঁচু পাহাড়ের অবস্থানের কারণে এই অঞ্চলের আকাশ সারা বছরই মেঘাচ্ছন্ন থাকে। শীতকালীন বৃষ্টি ও কুয়াশার উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামে ৩০০ মিটারের অধিক উচ্চতার পাহাড়ী এলাকা এই জলবায়ুর অন্তর্গত।

(গ) **উত্তরের উত্তরাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (Northern Part of Northern Climatic Region)** ঃ বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরের উত্তরাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই উপ-অঞ্চলের তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে গড়ে ৩২° সে. এর উর্ধ্বে পৌছায়। অন্যদিকে শীতকালে গড় তাপমাত্রা ১০° সে.-এর নীচে নেমে যায়। শুষ্ক ও তীব্র গরম পশ্চিমা বায়ু গ্রীষ্মকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমান অধিক (২০০ থেকে ৩০০ সে. মি.)। তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমানে ঋতুভিত্তিক পার্থক্যের কারণে এই অঞ্চলকে চরমভাবাপন্ন (extreme) জলবায়ুর অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করা হয়।

চিত্র ১.৩.৪ ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চল সমূহ

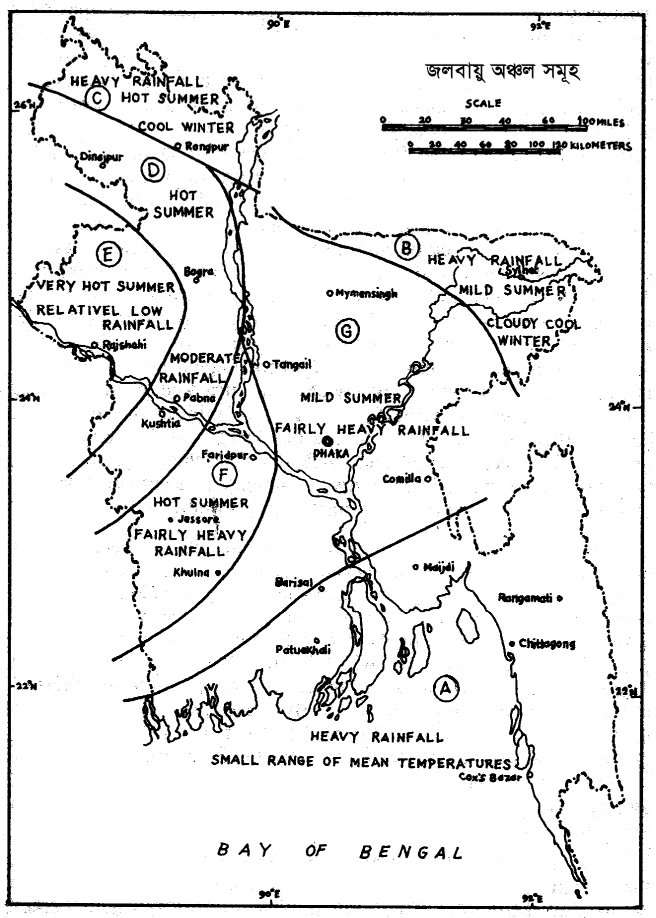

উৎস্য: হারুন অর রশীদ. ১৯৯৯

(ঘ) **উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (North-Western Climatic Region)** দিনাজপুরের দক্ষিনাংশ, বগুড়া, পাবনা ও কুষ্টিয়ার কিয়দংশ এই জলবায়ুর অন্তর্গত। এই উপ-অঞ্চলের জলবায়ু 'গ' উপঅঞ্চলের জলবায়ুর সাথে সথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এই উপ-অঞ্চলে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমানে ঋতুভিত্তিক পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম। বৃষ্টিপাতের পরিমান কম হওয়ায় এই উপ-অঞ্চলটির আবহাওয়া ও মৃত্তিকার ধরন শুষ্ক প্রকৃতির।

(ঙ) **পশ্চিমাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (Western Climatic Region)**: রাজশাহী ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য জেলার কিয়দংশ এই ধরনের জলবায়ু উপ অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা উষ্ণ ও শুষ্ক গ্রীষ্মকাল বিশিষ্ট উপ-অঞ্চল (subzone) গ্রীষ্মকালে এখানকার তাপমাত্রা ৩৫° সে. এর উর্ধ্বে পৌঁছায়। বায়ুর আর্দ্রতার পরিমান শতকরা ৫০ ভাগের কম হয়ে থাকে। বর্ষাকালে ১৫০ সে. মি. নীচে বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট এই উপ-অঞ্চলটি বাংলাদেশের শুষ্কতম এলাকা।

(চ) **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (South-Western Climatic Region)** : যশোহর, নড়াইল, সাতক্ষীরা, ও খুলনা জেলার কিয়দংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। এই উপঅঞ্চলের জলবায়ু উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য উপ-অঞ্চলগুলো অপেক্ষাকৃত কম চরমভাবাপন্ন (extreme)। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ৩৫° সে. এবং বৃষ্টিপাত ১৫০-১৮০ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। পশ্চিমাঞ্চলীয় উপ-অঞ্চল অপেক্ষা এই এলাকায় শীতকালে অধিক শিশিরপাত হয়ে থাকে।

(ছ) **দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চল (South Central Climatic Region)** : ঢাকা বিভাগসহ কুমিল্লা, ও বরিশালের অধিকাংশ স্থান এই উপঅঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। এখানে প্রচুর পরিমানে বৃষ্টিপাত (১৯০ সি. মি.) হয়ে থাকে। তাপমাত্রা পশ্চিমাঞ্চলীয় উপঅঞ্চলসমূহের (ঘ, ঙ, চ) তুলনায় কম হলেও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় (ক) এলাকা অপেক্ষা অধিক। এই উপঅঞ্চলটি মূলতঃ ক, ঘ ও চ জলবায়ু উপঅঞ্চলগুলোর মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে। এই অঞ্চলটির পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণ ও শুষ্ক এবং পূর্বাঞ্চল অপেক্ষাকৃত শীতল ও আর্দ্র প্রকৃতির জলবায়ু বিশিষ্ট। জলবায়ুর পরিবর্তনটি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয় বলে এই অঞ্চলকে পরিবর্তনশীল অঞ্চল (Transitional Zone) বলা হয়। দেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় পরস্পর বিপরীতধর্মী তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, ও বৃষ্টিপাত এই উপঅঞ্চলে মিলিত হওয়ার ফলে শিলাবৃষ্টি (Hail-Storm), কালবৈশাখী ঝড় (Nor'westers), এবং টর্নেডো (Tornado) জাতীয় প্রাকৃতিক দূর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যাবলী

বাংলাদেশের জলবায়ুতে উচ্চ তাপমাত্রা, প্রচুর বৃষ্টিপাত, অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং ঋতুগত উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়। এদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) বাংলাদেশের জলবায়ু অনেকটা সমভাবাপন্ন।
২) বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় জলবায়ু অথবা ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামে পরিচিত।
৩) বাংলাদেশের জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে আর্দ্রতা ও শীতকালে শুষ্কতা পরিলক্ষিত।
৪) এখানকার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও স্বাভাবিক বন্যার পাশাপাশি কয়েক বছর পরপর অস্বাভাবিক বন্যা।
৫) বাংলাদেশের ৬টি ঋতু থাকলেও মূলতঃ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এ তিনটি ঋতুর প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়।
৬) বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল আর্দ্র হলেও স্বল্প বৃষ্টিপাত ও মাঝে মাঝে কাল-বৈশাখীর মত প্রলয়ংকারী ঝড় সংঘটিত হয়।

পাঠ সংক্ষেপঃ

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশের জলবায়ুতে বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয় এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানকার জলবায়ুর আরো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুষ্ক আরামদায়ক শীতকাল, উষ্ণ ও গুমোট গ্রীষ্মকাল আর আর্দ্র ও উষ্ণ বর্ষাকাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পুরণ করুনঃ**

ক) কোন অঞ্চলের জলবায়ু বা তার যে কোন .... একক বা .... সে অঞ্চলের জীবজন্তু, ... মানুষ ইত্যাদির কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রক হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখে থাকে।

খ) বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের মূল উৎস্য ....।

গ) গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বাংলাদেশে .... ও বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

ঘ) বাংলাদেশে .... থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কুয়াশা ও কুজ্ঝটিকা এক সাধারণ চিত্র।

ঙ) বাংলাদেশের সারা বছরের মোট বৃষ্টিপাতে শতকরা .... ভাগ বর্ষাকাল-এ সংঘটিত হয়।

২. **সঠিক বাক্যের পাশে 'স' ও অঠিক বাক্যে 'মি' লিখুনঃ**

ক) কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ বরাবর অতিক্রম করেছে।

খ) বায়ুর চাপ, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ইত্যাদি জলবায়ুর উপাদান।

গ) শীতকালীন বৃষ্টিপাতের উৎস্য বঙ্গোপসাগরের থেকে আগত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ।

ঘ) ফেরেলের সূত্রানুযায়ী বায়ু উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়।

ঙ) পশ্চিমাঞ্চলীয় জলবায়ু অঞ্চলের অপর নাম পরিবর্তনশীল অঞ্চল।

সংক্ষেপে উত্তর দিনঃ

১. জলবায়ু কি বা জলবায়ু বলতে কি বুঝেন? এর বিভিন্ন উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের জলবায়ু অঞ্চলসমূহ আলোচনা করুন।

৩. বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের মূল উৎস্যসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. বাংলাদেশের তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।

৫. বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় জলবায়ু এলাকার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৬. বাংলাদেশের দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলীয় জলবায়ু বিশদভাবে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের জলবায়ু ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ন্ত্রকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. বাংলাদেশের জলবায়ুর শ্রেণীবিভাজন (হারুন-অর-রশীদ অনুসরনে) করুন এবং যে কোন ২টি অঞ্চল আলোচনা করুন।

পাঠ-১.৪

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন

(Population Planning and Development of Bangladesh)

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগত দিক; এবং
- জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল দরিদ্র দেশ যার জনাধিক্যজনিত সমস্যাই মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ক্ষুদ্র পরিসরের এই দেশটির লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে উচ্চ গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুসারে ১৮৭২ সালে বর্তমান বাংলাদেশ এলাকার লোক সংখ্যা ছিল ২.১৭ কোটি। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে সেই ১৯০১ সালের ২.৮৯ কোটি লোক নানান চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে বর্তমানে (২০০৫) প্রায় ১৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে (২০০১ সালের উপর অনুমেয়)। এ দেশের লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৮৩৩ জন, যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বলে প্রতীয়মান। বর্তমানে বাংলাদেশের জন্ম হার ১.৫৩% এবং এ ধরনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে প্রায় ২৬ কোটিতে উন্নীত হবে যা হয়তো হবেএ ক্ষুদ্র পরিসর বিশিষ্ট বাংলাদেশের জন্য এক ভয়াবহ বিপর্যয়। সামগ্রীকভাবে যার ছোবল পড়বে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের উপর। তাই এখনই উপযুক্ত সময়, এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধি প্রবণতাকে রোধ করার মানসে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন তথা বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে বাবহার নিশ্চিত করা। আলোচ্য পাঠে আমরা তাই নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগত দিক

২০০১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১২,৩৮,৫১,১২৩ জন, যা দেশের মোট আয়তন অনুসারে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব দাঁড়ায় ৮৩৯ জন। ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত সমতল পলল সমভূমি যা পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিন প্রধান নদী ব্যবস্থার অসংখ্যক শাখা ও উপনদীসহ শত শত পুকুর জলাশয় এবং বিল ও হাওড় সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এবং সে প্রক্রিয়া এখনও সক্রিয়। ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত এই দেশের অধিকাংশ মাসেই প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে চিরসবুজ উদ্ভিদের আধিক্য বিদ্যমান। এরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমৃদ্ধ এবং উর্বর ভূমির উপস্থিতির দরুন বহুকাল পূর্ব থেকেই এদেশে কৃষি কর্মকান্ড প্রসার লাভ তথা অন্যতম পেশা হিসেবে পরিগণিত। অন্য দিকে অতীতের শিল্পায়নে খুব কমই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তাই সম্ভবতঃ বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক নীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভরশীল। খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা, দারিদ্র বিমোচন এবং টেকসই আর্থনৈতিক উন্নয়ন বিকাশে কৃষির ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগই কৃষি ও কৃষি সংশিণ্টষ্ট পেশার উপর নির্ভরশীল। ফলে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ সার্বিকভাবে সনাক্ত করা যায়, যেমনঃ

ক) বাংলাদেশের আয়তন ক্ষুদ্র এবং সম্পদ সীমিত কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্র‍ুতগতিতে। তাই প্রতি নিয়ত সীমিত সম্পদ কাজে লাগাচ্ছে অবিবেকের মত, তাতে থাকছে না কোন সুষম পরিকল্পনা ও বিলি বন্দেজ।

খ) এ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ নিরক্ষর ও গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে। যাদের অধিকাংশরই অবস্থান দরিদ্র সীমার নীচে।

গ) বাংলাদেশ ভূ-খন্ডের পরিমাণ ০.১০ শতাংশ মাত্র অথচ পৃথিবীর ২.৫ শতাংশ মানুষ এই ক্ষুদ্র ভূখন্ডে বসবাস করছে। ফলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর ভিতর সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া বসতি সম্প্রসারণ, গৃহনিমাণ, পথঘাট তৈরি নিমিত্তে বনভূমি প্রায় নির্মূল হতে চলেছে। অথচ বাংলাদেশের আর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক হিসেবে আজও কৃষি এক চেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন সেক্টর এর মধ্যে শস্য জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত। তাছাড়া কৃষি ক্ষেত্রটি অন্যান্য দেশের তুলনায় আনুপাতিক হারে বেশি বিস্তৃত। তাই এমন অবস্থায় দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কাঠামোগত পরিবর্তন।

ঘ) বাংলাদেশের আর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতি দারিদ্র, বেশি নির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ পীড়িত ও তার ক্ষতি প্রভাবিত।

ঙ) বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো যেমন- কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি মূলতঃ শহর এলাকায় কেন্দ্রীভূত।

চ) দেশের উৎপাদিত পণ্যের বন্টন ব্যবস্থায় রয়েছে নানা রকম ত্রুটি।

ছ) দেশের জলবায়ু গ্রীষ্মপ্রধান বিধায় নর-নারীর মধ্যে অল্প বয়সে যৌবন প্রাপ্তি ঘটে থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধন ঘটে, ফলে জন্মহার বেশি হয়ে থাকে।

জ) বাংলাদেশের লোকজন বেশির ভাগ সময় শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে যা প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অধিক সন্তান জন্মদানের বেশি সহায়ক। ফলে লোকসংখ্যা স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আমিষ জাতীয় খাদ্যাভাব প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস করণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একে অপরের সম্পূরক। অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত জন বৈশিষ্ট্যাবলী লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি একদিকে যেমন দেশের নানা জাতীয় উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ, যথাঃ মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার মান, কর্মসংস্থানের অভাব, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অস্থিতিশীলতা, স্বল্প বিনিয়োগ ও মূলধন গঠন, অদক্ষ শ্রমশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ হ্রাস, জমাজমির খন্ড বিখন্ডতা সৃষ্টিসহ নানা বাধাবিপত্তি বিদ্যমান। অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যা অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি, বিভিন্ন প্রকার আর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, নানাবিধ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সরাসরি উৎপাদন কর্মকান্ডে সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে থাকে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে জনগণকে সুদক্ষ জনশক্তি রূপে রূপান্তর তথা সঠিক সুষ্ঠু ও দক্ষ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা ব্যবহারযোগ্য করে সে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করা প্রয়োজন। তাহলে সার্বিকভাবে তাদেরকে দেশের সকল ধরনের কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে সম্প্রসারণ তথা দেশের সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব বলে আশাব্যক্ত করা যায়। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অনুধাবন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ অতি জরুরী, যেমনঃ

১) সর্বাগ্রে দেশের সকল ধরনের অর্থাৎ বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী জনগণকে শিক্ষিত করে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং তা নিমিত্তে-

ক) ৫ থেকে ১৫ বছরের সকল ধরনের শিশুকে স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ আবশ্যক; প্রয়োজনে আকৃষ্ট করার মানসে বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক (যা বর্তমানে প্রচলিত) দান, টিফিনের ব্যবস্থা করণ, বিনা পয়সায় পড়াশুনার সুযোগ ইত্যাদি বহাল রাখতে হবে।

খ) বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী জনগণকে ন্যূনতম স্তরের জ্ঞান কর্মসূচীর আওতাধীনে এনে তার নিমিত্তে নৈশ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠাগার ইত্যাদি সহজ প্রাপ্যতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ) শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়েদের যোগ্যতা ভিত্তিক চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেকার ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) গরীব ছেলেমেয়েদের পিতা মাতাদেরকে মাসোয়ারা বা এককালীন এমন ধরনের অনুদান ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে স্কুল কলেজে পাঠাতে উৎসাহবোধ করেন।

২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে যদিও আইন রয়েছে, তবে তা যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে এবং নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

ক) বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।

খ) বিলম্বে বিবাহ উৎসাহিত করতে হবে।

গ) বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ; যেমনঃ

- অস্থায়ী ভিত্তিতে নানা প্রকার পিল ব্যবহার, কনডম ব্যবহার, ইনজেকশন গ্রহণ, আজল, সময় বিরতি মেনে চলা ইত্যাদি।
- স্থায়ী ভিত্তিতে ভ্যাসেকটমী, লাইগেশন, এমআর ইত্যাদি।

ঘ) শিশু মৃত্যুহার প্রসূতি মৃত্যুহার জন্মহার ইত্যাদি কমানো।

ঙ) প্রসূতি সেবাদান ও মাতৃসদনের মান উন্নত ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

৩। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ জনগণের পুনর্বাসন যে সব এলাকায় লোকসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার উপরে সে সব এলাকার লোকজনকে যেখানে কম বসতি, বসতিহীন ইত্যাদি স্থানে পুনঃ বাসনের ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনঃ বন্টন করতে হবে, তবে তা সামাজিক, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে।

৪। মূলতঃ নদী ভাঙ্গন ও গ্রামীণ এলাকার গরীব লোকজন কর্মসংস্থানের কারণে শহরে যেয়ে বস্তি জীবন বেছে নেয়। তাই বস্তি বাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিসহ যাতে তারা বস্তি বাসী না হয় এবং তার জন্য গ্রামীণ এলাকার টেকসই উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা তাতে আকৃষ্ট থাকে।

৫। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে বাস্তহারা (Refugee) সমস্যা একটি প্রকট আকার ধারণ করতে যাচ্ছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ঘটনাচক্রে বার্মা থেকে রোহিঙ্গাদের আগমন। এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, স্থানীয় সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার স্থিতাবস্থার মাধ্যমে।

৬। জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থাৎ বর্ধিত জনসংখ্যা সার্বিকভাবে নগরীয় পরিবেশ সহ দেশের পরিবেশ অবনতির জন্য দায়ী। সুতরাং দেশের পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে নগরসহ দেশের সকল স্থানের পরিবেশীয় উন্নতি সাধনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অগ্রসর হতে হবে (যেমন বৃক্ষ কর্তন নিষিদ্ধকরণসহ রোপনে উৎসাহদান)।

পাঠসংক্ষেপঃ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল দরিদ্র দেশ যার জনাধিক্যজনিত সমস্যাই মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ক্ষুদ্র পরিসরের এই দেশটির লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে উচ্চ গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুসারে ১৮৭২ সালে বর্তমান বাংলাদেশ এলাকার লোক সংখ্যা ছিল ২.১৭ কোটি। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে সেই ১৯০১ সালের ২.৮৯ কোটি লোক নানান চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে বর্তমানে (২০০৫) প্রায় ১৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে (২০০১ সালের উপর অনুমেয়)। এ দেশের লোকসংখ্যার ঘনত্ব ৮৩৩ জন, যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বলে প্রতীয়মান। বর্তমানে বাংলাদেশের জন্ম হার ১.৫৩% এবং এ ধরনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে প্রায় ২৬ কোটিতে উন্নীত হবে যা হয়তো হবেএ ক্ষুদ্র পরিসর বিশিষ্ট বাংলাদেশের জন্য এক ভয়াবহ বিপর্যয়। সামগ্রীকভাবে যার ছোবল পড়বে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের উপর। তাই এখনই উপযুক্ত সময়, এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা ও তার বৃদ্ধি প্রবণতাকে রোধ করার মানসে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন তথা বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে বাবহার নিশ্চিত করা। এই পাঠটি পড়ে আপনি বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগত দিক; এবং জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. সঠিক উত্তরে পার্শ্বে 'স' এবং অঠিক উত্তরের পার্শ্বে 'মি' লিখুন।

১.১. বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল দরিদ্র দেশ।

১.২. জনাধিক্যজনিত সমস্যাই বাংলাদেশের মূল সমস্যা।

১.৩. ভূ-তাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশের গঠন প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত।

১.৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগই কৃষি ও কৃষি সংশিণ্টষ্ট পেশার উপর নির্ভরশীল।

১.৫. অতি দারিদ্র, বেশি নির্ভরশীখল ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও তার ক্ষতিগ্রস্থতাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য।

২.শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

২.১. বাংলাদেশের আয়তন ক্ষুদ্র ও .... সীমিত।

২.২. বাংলাদেশের লোকজন বেশির ভাগ সময় .... জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে যা প্রজনন .... বৃদ্ধিসহ অধিক .... জন্মদানের বেশি .....।

২.৩. বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে .... পরিকল্পনা গ্রহণ।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক একটি নিবদ্ধ লিখুন।

২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্বন্ধে যাহা জানেন লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগত দিকসমূহ আলোচনা করুন।

২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সুপারিশমালা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ইউনিট-১

পাঠ-১.১

১.১ বঙ্গ

১.২ ১৯৪৭

১.৩ ৭

১.৪ উপজেলা, জেলা

১.৫ তত্ত্বাবধানে

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে ঠিক এবং অঠিক উত্তর উপত্তরের পার্শ্বে অটিক লিখুন

২.১ ঠিক, ২.২ অঠিক, ২.৩ অঠিক, ২.৪ অঠিক, ২.৫ ঠিক

পাঠ-১.২

১.১ √, ১.২. √, ১.৩. √, ১.৪. √, ১.৫. √, ১.৬. √, ১.৭. √, ১.৮. √, ১.৯. √, ১.১০. √

২.১. এই

২.২. ১৯৫৪, ১৯৭৭, ২৪ এবং ৫৪

২.৩. কর্ণফুলী

২.৪. চত্বর, নিচু, উচু

২.৫. সুন্দরবন, ম্যানগ্রোভ

পাঠ-১.৩

১. ক. উপাদান, সম্মিলিতভাবে, উদ্ভিদ, খ. ৩ টি, গ. বজ্রপাত, ঘ. নভেম্বর, ঙ. চার

২. ক. স, খ.স, গ.মি, ঘ.স, ঙ.মি

পাঠ ১.৪

১.১. স, ১.২. স, ১.৩. স, ১.৪. স, ১.৫. স

২.১. উত্তরঃ সম্পদ, শ্বেতসার, ক্ষমতা, সন্তান, সহায়ক, পরিবার।

২.২. উত্তরঃ শ্বেতসার, ক্ষমতা, সন্তান, সহায়ক, পরিবার।

২.৩. উত্তরঃ পরিবার।

ইউনিট-২

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা

(River System of Bangladesh)

পৃথিবীর বিখ্যাত নদী ব্যবস্থা গঙ্গা-পদ্মা, যমুনা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা-বরাক সহ অসংখ্যক নদ-নদীর দেশ (প্রকৃত নদী সংখ্যা বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন সঠিক তথ্য নেই। তবে কেউ কেউ বলেন, নদীর সংখ্যা ৭০০ থেকে ১০০০ এর মত, আবার কেউ কেউ বলেন, ২৫৩টি। অর্থাৎ মতান্তর থাকলেও যাদের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ২৪০০০ কিলোমিটার) হিসেবে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলাদেশ বেশ সুপরিচিত এবং তার মোট ভূভাগের ৮০ ভাগেরও বেশি ভূমি এসব নদ-নদী দ্বারা বাহিত পলল অবক্ষেপনের প্রতিদান। ফলে এদেশের শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক, রাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, যোগাযোগ ইত্যাদিসহ বিবিধ কর্মকান্ড আবর্তিত হচ্ছে এসব নদ-নদীকে কেন্দ্র করে। তাই নদ-নদীই এক কথায় অস্তিত্ব ও প্রাণ।

কোন উৎস হতে (পার্বত্য ভূমি, হ্রদ, বৃষ্টিবহুল স্থান, বরফ স্তুপ ইত্যাদি) নেমে আসা যে জলধারা সুদীর্ঘ খাতের মধ্যদিয়ে এঁকে বেঁকে নিয়ত প্রবাহমান, তাই নদী নামে পরিচিত। যে খাতের মধ্য দিয়ে জলধারা প্রবাহিত হয়, তাকে নদী উপত্যকা এবং উপত্যকার তলদেশ নদীগর্ভ নামে অভিহিত। অপেক্ষাকৃত ছোট নদী স্রোতস্বিনী, কোন একটি নদী অপর একটি নদীতে মিলিত হলে প্রথম নদীটিকে অপর নদীটির উপনদী এবং একটি নদী হতে অপর একটি নদীর উৎপত্তি/বিকাশ/সৃষ্টি হলে সৃষ্ট নদীটিকে মূল নদীর শাখা নদী বলে। উদাহরণস্বরূপ, মহানন্দা পদ্মা নদীর উপনদী আর গড়াই পদ্মার শাখা নদী।

নদী যে স্থান থেকে উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয় তাকে নদীর উৎস এবং যেখানে মিলিত হয় তাকে মোহনা বলে। একটি নদী ও তার উপনদীসমূহ একত্রে একটি নদী প্রণালী বা নদী ব্যবস্থা গঠন করে। নদী গঠনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত আয়তন ও গতিবেগ সম্পন্ন একাধিক প্রবাহের মিলিত ধারা যা অন্তস্থ ভূমি ও শিলার ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে খাত সৃষ্টি তথা এগিয়ে চলে থাকে। একটি উৎস আধার নদীর নিয়মিত প্রবাহ সচল রাখতে সদা সচেষ্ট থাকে। উদাহরণস্বরূপ গঙ্গোত্রী হিমবাহ গঙ্গা নদীর উৎস হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদীই বার্ধক্য পর্যায়ে উপনীত হয়ে বঙ্গোপসাগরের পতিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, উচ্চ ভূমি, ভূমির ঢাল ইত্যাদিও নদীর উৎপত্তিতে ভূমিকা রেখে থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ী ছড়া, সর্পিল মৌসুমী খাড়ি, স্বল্প পানি সমেত কর্দমাক্ত খাল-বিল ও নালা এবং প্রধান প্রধান নদী ও এদের উপনদী, শাখানদী, সম্মিলিতভাবে বিশাল নদী ব্যবস্থার গোড়া পত্তনে ভূমিকা রাখছে। সুন্দরবন, বরিশাল, খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলে প্রচুর নদীনালা সত্যিকার অর্থে মনোরম জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। তবে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র এ নদ-নদীগুলো সমভাবে বন্টিত নয়।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচেছ-

পাঠ ২.১ঃ বাংলাদেশের নদ-নদী ব্যবস্থাঃ একটি প্রেক্ষিত
পাঠ ২.২ঃ গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা
পাঠ ২.৩ঃ ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা
পাঠ ২.৪ঃ মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা
পাঠ ২.৫ঃ বাংলাদেশে বন্যা

পাঠ-২.১

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাঃ একটি প্রেক্ষিত

এই পাঠ পড়ে আপনি-

◆ ভিত্তি অনুযায়ী নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।

ভিত্তি অনুযায়ী নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাকে মূলতঃ ৫টি মৌলিক ভিত্তির আলোকে ভাগ করা যায়, যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

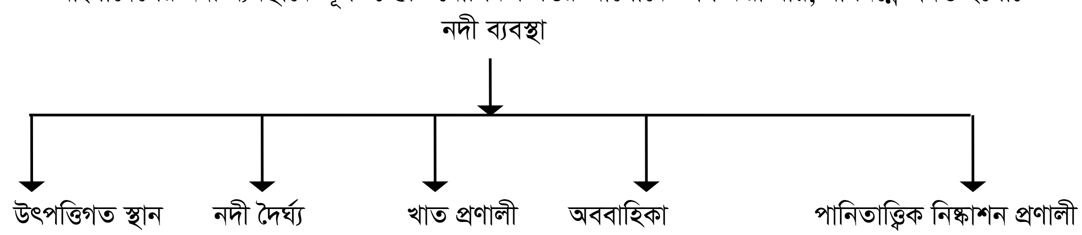

নিম্নে ভিত্তি অনুসারে নদী ব্যবস্থার বর্ণনা করা হলোঃ

১. উৎপত্তি অনুসারেঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নদীর উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও ঢাল বিশিষ্ট উৎস ভূমি। সাধারণতঃ পাহাড়িয়া অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাত, বরফগলন, সরোবর, বা হ্রদ ইত্যাদির অবস্থানসমূহ স্বাভাবিক ভাবেই নদ-নদীর উৎপত্তি স্থল হিসেবে পরিচিত। যেমন- গঙ্গা বা পদ্মা নদী হিমালয় পর্বতের বৃষ্টি, বরফগলা পানি ও প্রস্রবন একত্রে মিলিত হয়ে উৎপত্তি লাভ করেছে। এ ছাড়া আরো অনেক নদ-নদীর সূতিকাগার হিসেবেও পরিচিত। উৎপত্তি অনুসারে (ক) পার্বত্য নদী ও (খ) আঞ্চলিক এ দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

ক) পার্বত্য নদ-নদীঃ

পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রবাহিত নদীকে পার্বত্য নদী হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ পার্বত্য নদীগুলো হিমবাহ, সরোবর বা বহুল পরিমাণে বৃষ্টির পানির স্থানসমূহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যেমন- গঙ্গা বা পদ্মা, তিস্তা (হিমবাহ থেকে), ব্রহ্মপুত্র (মানস সরোবর থেকে) মেঘনা-বরাক (আসামের নাগমনিপুর পাহাড় থেকে) ইত্যাদি।

খ) আঞ্চলিক নদীঃ

দেশের অভ্যন্তরস্থ কোন বড় বিল বা জলাশয় থেকে উৎপত্তি লাভ করে স্বল্প দুরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাদেরকে আঞ্চলিক নদী বলা হয়। এ নদীগুলো স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন, আকারে অনেক ছোট এবং সারা বছর পানি নাও থাকতে পারে, তবে বর্ষার সময় বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন- বড়াল, তুরাগ, ইছামতি, দেউলী, কুলীক ইত্যাদি।

গ) জাতীয় নদীঃ

দেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি লাভ করে প্রবাহধারা ঐ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে, তাকে জাতীয় নদী বলে। এ নদীগুলো আকারে ছোট হলেও সারা বছর পানি থাকে, যেমন- আত্রাই, কপোতাক্ষ ইতাাদি।

ঘ) আন্তর্জাতিক নদী

একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জলধারা আন্তর্জাতিক নদী নামে অভিহিত। এ নদীগুলোর উৎপত্তিস্থলও প্রবাহপথ সীমাবদ্ধ নয়, প্রবাহের পরিমাণ বেশ বেশি, সারা বছর প্রবাহ বজায় থাকে। যেমন- পদ্মা (গঙ্গা), ব্রহ্মপুত্র/যমুনা ইত্যাদি। এদেরকে আবার সীমান্তবর্তী নদীও বলা হয়।

২. নদীখাতের ধরন অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগঃ

নদীতে নিয়মিত পানি সরবরাহ, ঋতুভেদে পানি সরবরাহের হ্রাসবৃদ্ধি, ভূমিরূপ, মাটির গঠন ও বুনন এবং ভূমির ঢালের তারতম্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশসহ বাংলাদেশে প্রধানতঃ তিন প্রকার নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠে, যেমন- ক) সরল নদীখাত, খ) সর্পিল নদীখাত এবং গ) বিনুনী নদীখাত।

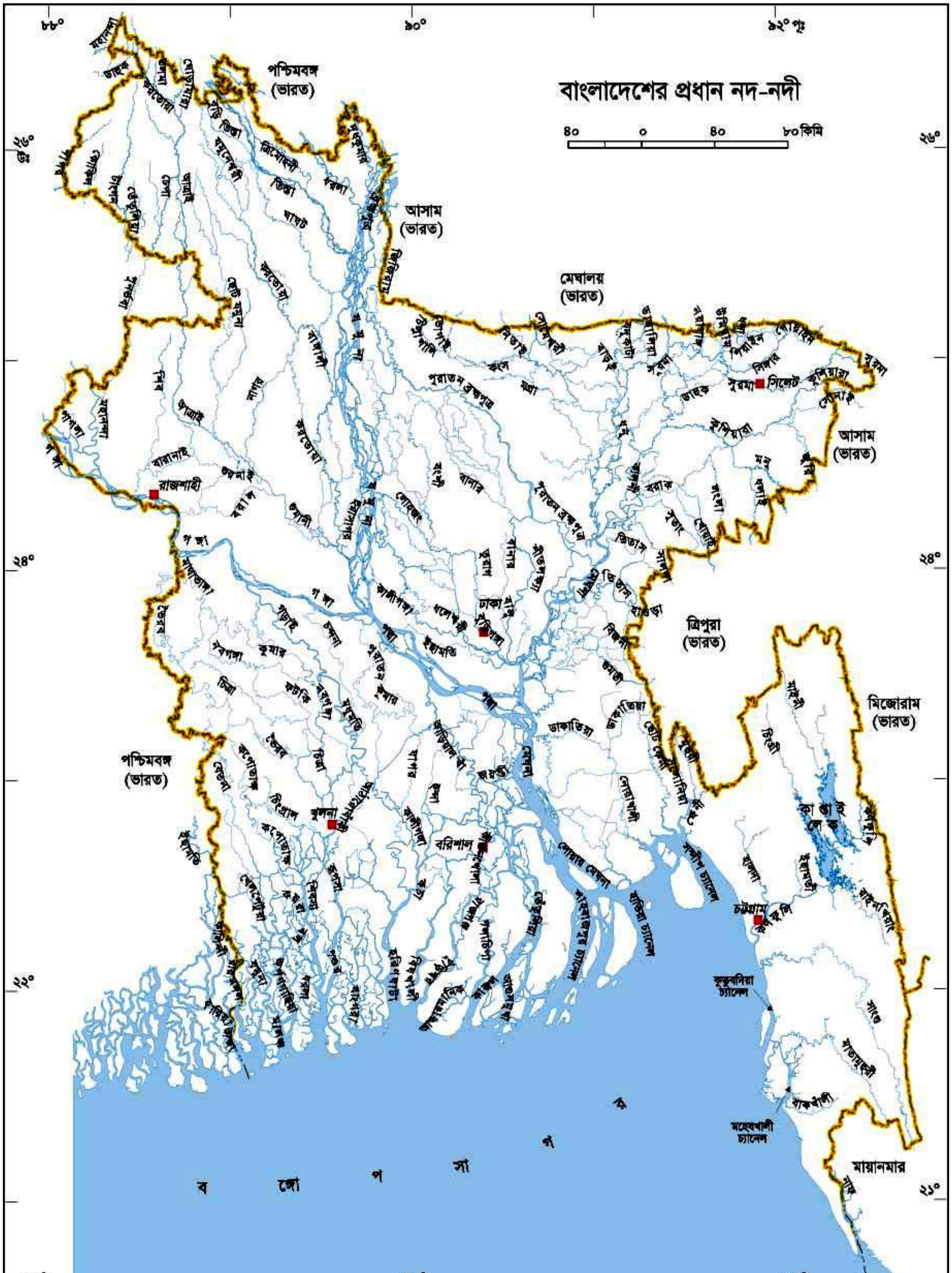

উৎস্য ঃ বাংলাপিডিয়া, ২০১২

চিত্র ২.১.১

ক) সর্পিল নদীখাত

সমভূমি বিশেষ করে পলি গঠিত সমভূমি অঞ্চলে বাক বহুল নদী দৃষ্টিগোচর হয়। এ সব নদীর প্রবাহ পথ বেশ গভীর, আঁকাবাঁকা প্রবাহপথ, পুনঃপুনঃ খাতের দিক পরিবর্তন, বাঁকে ভাঙ্গন ক্রিয়া বিপরীতে চর গঠন এবং প্রবাহ পথ এক খাতে প্রবাহিত হয়। যেমন- পদ্মা।

খ) বিনুনী নদীখাত/চরোৎপাদী নদী

যে সকল নদী একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয় তাদেরকে বিনুনী বা চরোৎপাদী নদী বলা হয়। বিনুনী সদৃশ বলে একে বিনুনী এবং প্রবাহ পথে চর উৎপাদিত হয় বলে চরোৎপাদিত নদী বলা হয়। নদীতে শেষ পর্যায়ে অতিরিক্ত সঞ্চয়জাত পললের কারণে চর পড়ে মূল স্রোত ধারাকে দ্বিধা বা বহুধা খাতে বিভক্ত করে প্রবাহিত হয়। এসব নদীর প্রশস্ততা বেশি, গভীরতা কম, প্রবাহ পথে চর গঠন এবং পরিশেষে একাধিক খাতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। যেমন- যমুনা নদী।

গ) সরল নদী

যে সব নদ-নদী প্রবাহ পথে কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই মোটামুটি সোজাপথে প্রবাহিত হয় তাদেরকে সরল নদী বলা হয়। কঠিন শিলায় গঠিত অঞ্চল ভূ অভ্যন্তরে ভৌত পানি প্রবাহ এবং নদীতীর বাঁধা দিয়ে নদী খাত সরল করা হয়। যেমন- তিস্তা।

৩. অববাহিকা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের ভূভাগের ৮০ ভাগের বেশি অংশ বিখ্যাত তিনটি নদী ব্যবস্থা ও তাদের অসংখ্যক শাখা ও উপনদীর সম্মিলিত কার্যকলাপ তথা বাহিত পলল দ্বারা গঠিত হয়েছে সেহেতু এসব নদী ব্যবস্থা প্রত্যেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বলীয়ান হয়ে অববাহিকা গঠন করেছে। অববাহিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন- ক) গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা, খ) ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা গ) মেঘনা-বরাক নদী ব্যবস্থা এবং ঘ) দক্ষিণ পূর্বাংশের নদী ব্যবস্থা বা পাহাড়ী নদী ব্যবস্থা।

গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা

গঙ্গা বা পদ্মানদী ও এর শাখা প্রশাখা গাঙ্গেয় বদ্বীপ নদীমালার অন্তর্গত। এ নদীমালার প্রধান নদী পদ্মা। পদ্মা এর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত কয়েকবার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। গঙ্গার অসংখ্য শাখা নদী আছে। বাংলাদেশে গঙ্গার অধিকাংশ শাখা নদীই দক্ষিণে বদ্বীপ ভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। নিম্নে পদ্মা ব্যতীত অন্যান্যগুলোর বিবরণ দেয়া হলোঃ

গঙ্গা বা পদ্মাঃ গঙ্গা হিমালয়ের গাঙ্গেত্রী নামক হিমবাহ হতে উৎপন্ন হয়ে ভারতের উপর দিয়ে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা দিয়ে গঙ্গা-পদ্মা নামে প্রবাহিত হচ্ছে। এর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২ হাজার ৬ শত কিলোমিটার। বাংলাদেশ অংশে এর দৈর্ঘ্য ৩৮০ কিমি। রাজশাহী থেকে দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা নদী যমুনার সাথে মিশে চাঁদপুর পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। সেকালে পদ্মা ছিল প্রমত্তানদী। এখন শুষ্ক মৌসুমে এ নদী শুকিয়ে যায়। কারণ নদীর উজানে ফারাক্কা নামক স্থানে বাধ দিয়ে মূল নদীর পানি প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে।

ভৈরবঃ নিষ্ক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চলের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। ভৈরব নদী কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০ কিমি। খুলনায় এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮ কিমি। ইছামতি ও কপোতাক্ষ ইহার দুটি প্রধান শাখানদী। ভৈরব নদী কোথাও কোথাও তার নাব্যতা হারিয়েছে।

কপোতাক্ষঃ যশোর ও খুলনার প্রায় ২৫৭ কিমি দীর্ঘ কপোতাক্ষ নদী দক্ষিণে সুন্দরবনের ধার ঘেঁষে বয়ে চলেছে। যশোরে এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৮ কিমি। এই নদী খুলনার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে ভৈরবের সাথে মিশেছে। ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সব নদীই স্রোতহীন জীর্ণশীর্ণ মৃতপ্রায়।

গড়াইঃ কুষ্টিয়া শহরের কাছ দিয়ে বয়ে চলা পদ্মার শাখা নদী গড়াই কুষ্টিয়ার দক্ষিণ পূর্ব দিক হয়ে রাজবাড়ি, ফরিদপুর এবং নড়াইল জেলার সীমানা ঘেষে প্রবাহিত হচ্ছে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে এ নদী মধুখালী থানার কাছে আবার এক সাথে মিলেছে। এরপর থেকে গড়াই নাম পরিবর্তন করে মধুমতি হয়েছে। মোল্লাহাট থানার কাছে এ নদীর সাথে কুমার, নবগঙ্গা, ও চিত্রা নদী মিশেছে। সুন্দরবনের কাছে এ নদী হরিনঘাটা নামে পরিচিত।

আড়িয়াল খাঁঃ গোয়ালন্দের সাড়ে ১০ কিমি দক্ষিণে টেপাখোলা সীমানায় ফরিদপুর খাল পদ্মার ডানতীর থেকে নির্গত হয়েছে এবং কুমার নদীর সাথে মিশেছে। এ নদী এঁকেবেঁকে ফরিদপুর জেলার উত্তরাংশে প্রবাহিত হয়ে মাদারীপুর জেলার শিবচরের কাছে আড়িয়াল খাঁ নদীতে পড়েছে। উনিশ শতাব্দীর শেষের দিকে আড়িয়াল খাঁ পদ্মার প্রধান ধারা ছিল। কিন্তু

বর্তমানে এর শেষ প্রান্তে বালি ভরাট হয়ে চর পড়েছে। মাদারীপুরের কাছে আড়িয়াল খাঁ দুটো শাখায় বিভক্ত হয়েছে। বাম দিকে নিজ নামেই এবং ডানদিকে টরকি নামে প্রবাহিত হচ্ছে।

পশুর রূপসাঃ পশুর নদী রূপসা নদীরই অব্যাহত অংশ। এখন গড়াই নদীর স্থলে এ নদী নাব্য। বটিয়াঘাটার কাছে রূপসা নাম পরিবর্তন করে 'কাজিবাচা' নাম ধারণ করেছে। পরে অবশ্য চালনার কাছে তা পশুর নামে পরিচিত। মংলা বন্দরের কাছে পশুর নদীতে মংলা নদী মিশেছে।

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ও এদের শাখা প্রশাখা নিয়ে ব্রহ্মপুত্র যমুনা নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ইহা দেশের প্রধান নদী ব্যবস্থা।

ক) পুরাতন ব্রহ্মপুত্রঃ বাহাদুরাবাদ ঘাটের উত্তর মূল ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে এ নদী জামালপুর, ময়মনসিংহ, জেলার দক্ষিণ পূর্বদিক দিয়ে ভৈরব বাজারের কাছে মেঘনার সাথে মিশেছে। শুকনো মৌসুমে এ নদীতে জলপ্রবাহ তেমন একটা হয় না বললেই চলে। বর্ষা মৌসুমে সীমান্তের ওপার থেকে আসা অতিরিক্ত পানি উপচে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করে। তখনই এ নদী পরিপূর্ণ থাকে।

খ) যমুনাঃ তিব্বতের মানস সরোবর থেকে উৎপত্তি লাভ করে গারো পাহাড় দিয়ে ধুবড়ীর কাছে ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ব্রহ্মপুত্র নদীই দক্ষিণে কিছুদুর এগিয়ে পশ্চিমে তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের মিলিত স্রোতধারা যমুনা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে এবং গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মার সাথে মিশেছে। এখন পুরাতন ব্রহ্মপুত্র যমুনার একটি শাখা নদী।

গ) ধলেশ্বরীঃ টাঙ্গাইল জেলার উত্তরে যমুনা নদী থেকে ধলেশ্বরীর উৎপত্তি এবং সাভারের কাছে এর নাম ধলেশ্বরী হয়েছে। এটি দুটি শাখায় বিভক্ত। প্রধান শাখা মানিকগঞ্জের উত্তর ও দক্ষিণ পূর্বে ৪৮ কিমি দীর্ঘপথ বয়ে চলেছে। দক্ষিণাংশ কালিগঙ্গা নামে পরিচিত, লৌহজং এর কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে উত্তরে বুড়িগঙ্গা এবং দক্ষিণে ধলেশ্বরী নামে প্রবাহিত হয়েছে। বুড়িগঙ্গা ঢাকার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফতুল্লার কাছে ধলেশ্বরীতে মিশেছে। আবার ধলেশ্বরী নারায়নগঞ্জের কাছে শীতলক্ষার সাথে মিলিত হয়েছে।

সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থা

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থার অন্তর্গত। প্রধানত সুরমা কুশিয়ারা ও মেঘনা এবং এদের শাখা প্রশাখা নিয়ে এই নদী ব্যবস্থা গঠিত।

ক) সুরমাঃ আসামের বরাক নদী কদরপুরের কয়েক কিমি পশ্চিমে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে। দক্ষিণের শাখা কুশিয়ারা নামে সিলেটের মধ্যদিয়ে দক্ষিণ পুর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। উত্তরের শাখা সুরমা প্রথমে পশ্চিমে এবং পরে দক্ষিণ পশ্চিমে সিলেট শহরের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

খ) কুশিয়ারাঃ ভারতের মিজোরাম প্রদেশের পাহাড় থেকে উৎপন্ন ধলেশ্বরী নদী ও আসামের শিলাচরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আর একটি নদী পরস্পর আসামের বদরপুরে মিলিত হয়ে যৌথপ্রবাহ সিলেটের করিমগঞ্জের উপর দিয়ে কুশিয়ারা নামে বাংলাদেশে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদীর মূল প্রবাহ সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ বালাগঞ্জ হয়ে মৌলভীবাজারের মনু নদীর সাথে মিশেছে এবং বরাক নদীর দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে। বরাক নদী হবিগঞ্জে খোয়াই নদীতে মিশেছে এবং দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে মদনার কাছে কালনি নদীতে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত স্রোত ভৈরববাজারের কাছে মেঘনা নদীতে পড়েছে।

গ) মেঘনাঃ মদনার কাছে কালনী এবং হবিগঞ্জে বরাক ও খোয়াই নদীর মিলিত স্রোত মেঘনা নদী নামে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হচ্ছে। ভৈরববাজারের কাছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী মেঘনা নদীতে মিশেছে। বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষার মিলিত ধারা মুন্সিগঞ্জের কাছে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। মেঘনা নদী দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পদ্মার সাথে এক হয়ে আরো দক্ষিণে চাঁদপুরের কাছে প্রশস্ত মেঘনা নদীর রূপ নিয়েছে। মেঘনা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৪১৬ কিমি (প্রায়)।

ঘ) গোমতীঃ কুমিল্লার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া গোমতী নদী দাউদকান্দির কাছে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই অঞ্চলের অন্যান্য নদী হচ্ছে ফেনী নদী ও ডাকাতিয়া নদী। ডাকাতিয়া নদী নোয়াখালীর দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। খরস্রোতা নদী ফেনী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা মোহনার কাছে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

পাহাড়ী নদী ব্যবস্থা

বাংলাদেশের দক্ষিণ পুর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার জেলার নদী ব্যবস্থা সমূহকে পাহাড়ী নদী ব্যবস্থা বলে। এই অঞ্চলের নদীগুলি অপ্রশস্ত, খরস্রোতা ও মোটামুটি সমান্তরাল। নিম্নে এই অঞ্চলের নদী ব্যবস্থা আলোচিত হলোঃ

ক) কর্ণফুলীঃ পাহাড়ী নদী হিসেবে কর্ণফূলী নদী বিখ্যাত। লুসাই পাহাড়ের লংলেহ নামক স্থানে এ নদীর উৎপত্তি। উৎস থেকে কর্ণফুলীর মোহনা পতেঙ্গা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭২ কিমি পাহাড়ের উপত্যকার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে বলে এ নদী

খুবই খরস্রোতা। নদীর গতিবেগ উপত্যকার ঢালের সমানুপাতিক। এই নদী ভারত বাংলাদেশের প্রায় ৫ কিমি সীমা নির্দেশ করে। এ নদী সীমান্ত থেকে প্রবেশ করে রাঙামাটির সমভূমিতে প্রবাহিত হয় এবং পরে কাপ্তাই হ্রদে মিশে। কাপ্তাই হ্রদের দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে বেরিয়ে পতেঙ্গার কাছে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

খ) সাংগুঃ বান্দরবনের দক্ষিণে মউডাক পর্বতমালায় এ নদীর উৎপত্তি এ নদী এঁকেবেঁকে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪৪ কিমি। কর্ণফুলী নদীর মোহনা থেকে কয়েক কিমি দক্ষিণে সাংগু নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ নদীর উচু পাহাড়ী অংশে ছোট ছোট জলপ্রপাত ও নদীপ্রপাত দেখা যায়।

গ) হালদা ঃ হালদা নদী পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার বাদনা তলী পর্বতশৃঙ্গে উৎপন্ন হয়েছে এবং ফকিটছড়ি থানার উত্তর পূর্ব কোন দিয়ে চট্টগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে। এ নদী উত্তর দক্ষিণে বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বিবিরহাট, নাজিরহাট, সাতারহাট, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, রাউজান ও চট্টগ্রামের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এ নদী চট্টগ্রামের কালুর ঘাটের কাছে কর্ণফুলী নদীতে পড়েছে।

ঘ) মাতামুহুরীঃ পার্বত্য বান্দরবন জেলার মইনভার পর্বতে এই নদীর উৎপত্তি। উৎপত্তি স্থল থেকে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম দিকে এসে মহেশখালী ঘাটের সাথে মিশেছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কিমি।

ঙ) নাফঃ বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণ সীমা বরাবর যে নদী মায়ানমার ও কক্সবাজারের টেকনাফ সীমা নির্দেশ করছে সেটি হচ্ছে খরস্রোতা নাফ নদী। পাহাড়ী কয়েকটি স্রোতস্বিনী নাফ নদী সৃষ্টির হয়েছে। এ নদী বঙ্গোপসাগেরে পতিত হয়েছে। নাফ নদীর দৈর্ঘ্য মাত্র ৫৬ কিমি।

৪) পানিতাত্ত্বিক ও নিষ্কাশন প্রণালী অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মূলত উপরোক্ত পানিতাত্ত্বিক ও নিষ্কাশন প্রণালীর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ৪টি ভাগে বিভক্ত করেন, যেমন- ক) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নদীমালা, খ) উত্তর পূর্বাঞ্চলের নদীমালা, গ) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীমালা ও ঘ) দক্ষিণ পূর্বাংশের নদীমালা।

৪.১) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নদীমালা

রাজশাহী বিভাগের সমস্ত জেলাই এ অঞ্চলের অন্তর্গত। পশ্চিম ও উত্তর ভারতীয় সীমান্ত এলাকা, পূর্বদিকে যমুনা নদী এবং দক্ষিণে পদ্মা নদী দ্বারা ইহা পরিবেষ্টিত। ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এটি হিমালয়ের পাদদেশীয় ভূমি প্লায়োস্টোসিন যুগের চত্বর সমূহের অবস্থান ও বেশ কিছু নিম্ন জলাভূমির অবস্থান রয়েছে। আর ভূমির ঢাল তুলনামূলকভাবে খাড়া প্রকৃতির, নদীগুলো দীর্ঘ প্রকৃতির, গভীরতা বেশি। অববাহিকায় অধিক বৃষ্টি হয় এবং পানি প্রবাহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ মহানন্দা, চপা, পূণর্ভবা, টাঙন, কুলিক, তালমা, করতোয়া, আত্রাই, গুর, গুমানী, দিওনাই, চাতালকাটা, যমুনেশ্বরী, বাঙালী, নাগর, তিস্তা, মানস, দুধকুমার, ঘাঘট, হুরাসাগর, ধরলা ইত্যাদি।

ক) তিস্তা নদীঃ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তিস্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। ১৭৮৭ সালে এক ভূ-আলোড়নের বা ভূমিকম্পের ফলে এর গতি পরিবর্তন হয়ে যায়। বর্তমানে প্রবাহিত জীর্ন করতোয়া, আত্রাই, যমুনেশ্বরী, নদীর উৎস হচ্ছে এই তিস্তা নদী। তিস্তা নদী প্রায় ১৭৬ কিমি দীর্ঘ। চিলমারীর দক্ষিণে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে মিশেছে।

খ) ঘাঘটঃ তিস্তার শাখা নদী হচ্ছে ঘাঘট। এই নদী গাইবান্ধা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফুলছড়ি ঘাটের কাছে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশেছে।

গ) করতোয়াঃ করতোয়ার উত্তরাংশকে দিনাজপুরের করতোয়া বলে। খানসামার কাছে বুড়িতিস্তার সাথে মিশে এটি আত্রাই নাম ধারণ করেছে। আবার দক্ষিণে গাইবান্দার কাছে করতোয়া নামে প্রবাহিত হচ্ছে। ইহাকে অবশ্য ব্রহ্মপুত্রের উপশাখা নদী হিসেবে গণ্য করা হয়।

ঘ) আত্রাইঃ তিস্তার শাখা নদী আত্রাই। খানসামার উত্তরে করতোয়া নামে প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদী ছোট যমুনার সাথে মিশে এবং দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়ে পাবনার বেড়া থানার কাছে মূল যমুনা নদীতে পড়ে।

ঙ) ধরলা ও দুধকুমারঃ তিস্তার সমান্তরালে একেবারে উত্তরের এই নদী দুটি ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। দুধকুমার খরস্রোতা নদী। ধরলা বর্ষার সময় খুবই খরস্রোতা হয়। কিন্তু শুকনো মৌসুমে এই নদী দুটি শান্ত থাকে।

চ) পুনর্ভবাঃ এটি তিস্তার শাখা নদী। রাজশাহী চাপাইনবাগঞ্জ জেলার উত্তরে এ নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। দিনাজপুর শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম ও পশ্চিম কেন্দ্রীয় বরেন্দ্র অঞ্চলের মধ্যদিয়ে সরাসরি দক্ষিণে এগিয়ে রাজশাহীর মোহনপুরে মহানন্দার সাথে মিশেছে।

ছ) বাংগালীঃ তিস্তার শাখা ঘাঘট নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালী নদী ব্রহ্মপুত্র নদীতে পড়েছে। যমুনা নদীর সাথে এর সংযোগ রয়েছে।

৪.২) উত্তর পূর্বাঞ্চলের নদী ব্যবস্থা

ফরিদপুর জেলা ছাড়া ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলা, সিলেট ও গোমতী নদীর উত্তরে কুমিল্লার কিয়দংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। প্রায় সমস্ত পলল ভূমি সমেত উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব সীমানায় কিছু পাহাড়, সিলেট ও ময়মনসিংহের হাওড়, নিম্নভূমি এবং ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল ও ঢাকা জেলার মধুপুর ও ভাওয়ালের উচ্চভূমি এই অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান। বড় আঙ্গিকে এ অঞ্চলে দুটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন-

ক) শাখা নদী যেগুলো পাহাড় থেকে নেমে এসে মেঘনা নদী ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে যেমন খোজাই, সুতাং, তিতাস এবং হালদা ইত্যাদি।

খ) ব্রহ্মপুত্র যমুনার উপনদী বিভিন্ন নামে মেঘনাতে পতিত হচ্ছে যেমন বংশী, বানার, ধলেশ্বরী, সারি, যদুকা এবং সোমেশ্বরী ইত্যাদি। তাছাড়া সুরমা, কুশিয়ারা, গোমতী, মনু, সালদা, পিয়ান, ছোট ফেনী এবং ডাকাতিয়া ইত্যাদি রয়েছে।

৪.৩) দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের নদী ব্যবস্থাঃ

বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়াসহ ফরিদপুর, বরিশাল, এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এর উত্তরে পদ্মা নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্ত এবং পূর্বে মেঘনা নদী অবস্থিত। ভূপ্রাকৃতিক দিক থেকে সমগ্র অঞ্চলটি মৃতপ্রায় বদ্বীপ ভূমির অন্তর্গত এবং ভূমির ঢাল সাধারণত উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রতি কিলোমিটারে ৮ সেন্টিমিটার। পূর্ব ও দক্ষিণে পূর্বাংশ বন্যা, সাইক্লোন, লবণাক্ততা ছাড়াও জোয়ার ভাটা সহ অসংখ্যক নদীখাত এ অঞ্চলে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য নদীগুলোর মধ্যে গড়াই মধুমতি, আড়িয়ালখা, কপোতাক্ষ, বিশখালী, রূপসা, পশুর, শিবসা, মাথাভাঙ্গা, বেতনাএ চন্দনা, চিত্রা ভদ্রা ধলেশ্বর, গোমনিত এবং নবগঙ্গা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪.৪) দক্ষিণ পুর্বাংশের নদী ব্যবস্থাঃ

এ অঞ্চলের পূর্বে ভারত ও মায়ানমার, উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অংশ পশ্চিমে মেঘনা নদী এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। এখানকার নদীগুলো অধিকাংশ পাহাড় থেকে আসে বলে একে পাহাড়ীয়া নদী ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। ক্ষয়গঠন ও সঞ্চয় প্রক্রিয়া নিত্য কর্মকান্ড, স্বাভাবিক বন্যা ও পাহাড়ী বন্যার আওতাধীন। নদীগুলো খরস্রোতা এবং জোয়ারভাটা ইত্যাদি এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য, নদীগুলো হচ্ছে ফেনী, মাতামহুরী, সাংগু, কাসালং, কাপ্তাই, নাফ এবং জাফলং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৫) দৈর্ঘ্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

মোটামুটিভাবে এ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ৮ টি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমনঃ

ক) অতি দীর্ঘনদীঃ যে সকল নদী ২৫০০ কিমি বা তার চেয়ে বেশি দীর্ঘ এ প্রকৃতির নদী বাংলাদেশে নেই।

খ) দীর্ঘ নদীঃ যে সকল নদী ২৫০০-১৫০০ কিমি এর মধ্যে তারাই এর প্রকৃতির এবং বাংলাদেশে এ ধরনের কোন নদী নেই।

গ) মধ্যম দীর্ঘ নদীঃ ১৫০০-১০০০ কিমি দীর্ঘ বিশিষ্ট নদীই দীর্ঘ প্রকৃতির নদী। বাংলাদেশে এ ধরনের কোন নদী নেই।

ঘ) মধ্যম নদীঃ ৫০০-১০০০ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নদীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- ভৈরব (৫৫৯) করতোয়া, আত্রাই, হুরাসাগর, গোমানী (৮৪১) ইত্যাদি।

ঙ) নিম্ন মধ্যম নদীঃ ২৫০-৫০০ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নদীকে বুঝায়। যেমন- ইছামতি, কুমার, তিস্তা সাংগু ইত্যাদি।

চ) নিম্ন দৈর্ঘ্যের নদীঃ ১০০-২৫০ কিমি বিশিষ্ট নদীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- কর্ণফুলী, মাথাভাঙা, নবডাঙা, নাগর ইত্যাদি।

ছ) অতি নিম্ন দৈর্ঘ্যের নদীঃ ৫০-১০০ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নদীকে বুঝায়। যেমন- মহানন্দা, ধরলা ইত্যাদি।

জ) ক্ষুদ্রাকৃতিক নদীঃ ৫০-১০০ কিমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নদী যেমন- বড়াল, বুড়িগঙ্গা।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তি করে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উল্লিখিত ৪টি নদী ব্যবস্থা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হলো।

পাঠসংক্ষেপঃ

এই পাঠ পড়ে আপনি ভিত্তি অনুযায়ী নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ**

১.১. নদীর উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন .... পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও ... উৎস .... ।

১.২. বাংলাদেশের বেশির ভাগ .... নদীগুলো হিমবাহ, ... বা বহুল পরিমাণে .... পানির স্থানসমূহ থেকে .... হয়েছে।

১.৩. একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে ....আন্তর্জাতিক .... নামে অভিহিত।

১.৪. কঠিন শিলায় গঠিত .... ভৌত পানি প্রবাহ এবং .... বাঁধা দিয়ে নদী .... সরল করা হয়।

১.৫. নদীর .... উপত্যকার .... সমানুপাতিক।

১.৬. বাংলাদেশের একেবারে... সীমা বরাবর যে নদী .... ও কক্সবাজারের.... সীমা নির্দেশ করছে সেটি হচ্ছে খরস্রোতা .... নদী।

১.৭. এখানকার নদীগুলো .... পাহাড় থেকে আসে বলে ইহাকে .... বলা হয়ে থাকে।

২. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে 'স' এবং মিথ্যা উত্তরের পার্শ্বে 'মি' লিখুনঃ**

২.১. একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জলধারা আন্তর্জাতিক নদী নামে অভিহিত।

২.২. সমভূমি বিশেষ করে পলি গঠিত সমভূমি অঞ্চলে বাক বহুল নদী দৃষ্টিগোচর হয়।

২.৩. পাহাড়ী নদী হিসেবে কর্ণফুলী নদী বিখ্যাত।

২.৪. বান্দরবনের দক্ষিণে মউডাক পর্বতমালায় সাংগু নদীর উৎপত্তি।

২.৫. হালদা নদী পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার বাদনা তলী পর্বতশৃঙ্গে উৎপন্ন হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুনঃ

১. উৎপত্তি অনুসারে বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগের বিবরণ দিন।

২. নদী খাতের ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

৩. অববাহিকা ভিত্তিক বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

৪. পানিতাত্ত্বিক ও নদী নিষ্কাশন প্রণালীভিত্তিক বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

৫. দৈর্ঘ্যভিত্তিক বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

৬. উত্তর পশ্চিমাঞ্চল/উত্তরাঞ্চল/পাহাড়ী/দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল/দক্ষিণ পূর্বাংশের নদী বাবস্থার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ভিত্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজন ও তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

২. 'বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাঃ একটি প্রেক্ষিত', আলোচনা করুন।

পাঠ-২.২

গঙ্গা-পদ্মানদী ব্যবস্থা

এই পাঠ পড়ে আপনি-
- ◆ গঙ্গা-পদ্মা নদীর উৎপত্তি ও প্রবাহপথ;
- ◆ গঙ্গা-পদ্মা নদীর গাঠনিক বৈশিষ্ট্যাবলী;
- ◆ গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী;
- ◆ গঙ্গা-পদ্মা নদীর শাখা নদী ও উপনদী সমূহ; এবং
- ◆ গঙ্গা-পদ্মা নদী ও ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে ধারণা লাভ পারবেন।

গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা পৃথিবীর বৃহৎ নদীপ্রণালীর মধ্যে অন্যতম এবং এ নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের ভূমি, বসতি, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও যাতায়াত ব্যবস্থা অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে অবদান রাখছে। এক কথায় এ নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণের জন্য অতি গুরূত্বcYY©|
ভারত ও তিব্বত সীমান্ত নিকটবর্তী মধ্য হিমালয়ের গাড়োয়াল পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত গঙ্গোত্রী (৩০°৫৯ উত্তর ও ৭৮°৫৯ পূর্ব উচ্চতা ৭২৫০ মিটার, পুরুত্ব ২৩৬ কিমি এবং পরিধি ৭০ মাইল) নামক হিমবাহ থেকে গঙ্গা (পদ্মা) নদী উৎপত্তি লাভ করেছে। গঙ্গোত্রী হিমবাহের পূর্বদিক থেকে আগত অলকানন্দ ও পশ্চিম দিক থেকে আগত ভাগীরথীর সংগমস্থল দেব প্রয়াগ এর দক্ষিণ থেকে মিলিত ধারা গঙ্গা নামে পরিচিত। শিবালিক পর্বতমালা অতিক্রমের পর দক্ষিণবাহী হয়ে হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা সমতল ভূমিতে পতিত হয়েছে। এরপর দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে এলাহাবাদের নিকট যমুনা ও সরস্বতী নদী গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে। পাটনার কিছু পূর্বে ঘাঘরা, বিপরীত দিকে গন্ডক এবং কিছু পূর্বে কোশী বামতীরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অতঃপর বিহার হতে রাজমহল হতে ১০০ কিমি ভাটিতে দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম শাখা ভাগীরথী কালিনি এবং পরে হুগলী নামে কলকাতা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। দ্বিতীয় শাখাটি গঙ্গা-পদ্মা নামে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা ও বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার মোহনপুর থেকে অতিক্রম করে গোদাগাড়ী, রাজশাহী, চারঘাট, বাঘা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ইত্যাদি অতিক্রম পূর্বক রাজবাড়ি জেলার দৌলতদিয়ার নিকটবর্তী যমুনার (ব্রহ্মপুত্রের ধারা) সঙ্গে মিলিত হয় এবং মিলিত ধারা চাঁদপুরের নিকট মেঘনার সাথে মিলিত হবার পর মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।
গঙ্গা-পদ্মা নদীর গাঠনিক বৈশিষ্ট্যর মধ্যে দৈর্ঘ্য, আয়তন, প্রশস্ততা, গভীরতা ইত্যাদি পরিগণিত। উৎস হতে বাংলাদেশের মোহনা পর্যন্ত পদ্মানদীর মোট দূরত্ব ২৬০০ কিমি, প্রবেশ স্থল থেকে দৌলতদিয়া পর্যন্ত প্রায় ২২৯ কিমি এবং মেঘনার সঙ্গে মিলিত হবার স্থান পর্যন্ত ১৪৬ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। গঙ্গা-পদ্মা নদীর প্রশস্ততার পরিসীমা ১.৬ কিমি থেকে ৮ কিমি এবং নদীটি কখনও বিনুনী ও কখনও সর্পিল প্রকৃতির।
ভারত, নেপাল, চীন ও বাংলাদেশ নিয়ে এর অববাহিকা অঞ্চল যার মোট আয়তন প্রায় ১০৯৩২০০ বর্গকিলোমিটার (সারণী-২.২.১)।

সারণী ২.২.১ গঙ্গা-পদ্মা অববাহিকার স্থানিক বিন্যাসঃ

দেশ	মোট আয়তন বর্গকিমি	শতকরা হার
নেপাল	১৪৭৪৮০	১৩.৫৬
ভারত	৮৬০০০০	৭৯.০৯
চীন	৩৩৫২০	৩.০৮
বাংলাদেশ	৪৯২০০	৪.২৭
মোট	১০৯৩২০০	১০০.০০

উৎসঃ আমজাদ হোসেন খান, ১৯৯৪

রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, খুলনার উত্তরাংশ নিয়ে বাংলাদেশের গঙ্গা অববাহিকা গঠিত যার মিলিত আয়তন প্রায় ৪৯২০০ বর্গকিলোমিটার।

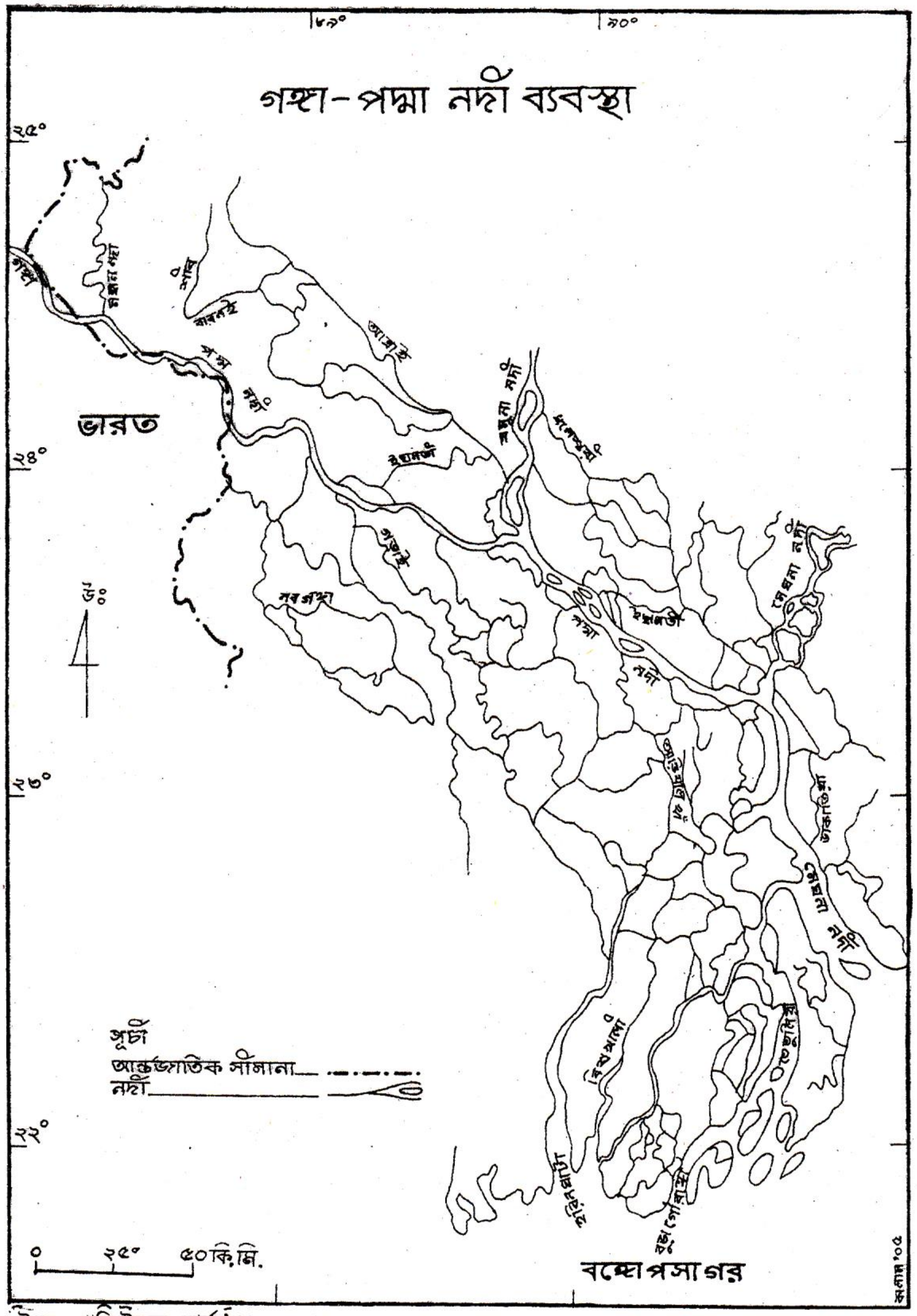

উৎস : পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৯৮৮

চিত্র ২.২.১ : গঙ্গা পদ্মা নদী ব্যবস্থা

১৯৮০ সালের ভূউপগ্রহ মানচিত্র হতে দেখা যায় যে, উজানে নদীখাতের গড় প্রশস্ততা ৫.১৭ কিমি, ভাটিতে ৭.৪৮১ কিমি, বাকের চরের সংখ্যা ৫ টি, নদীগর্ভে চরের সংখ্যা ১৯ টি বাঁকের সংখ্যা ৯ টি এবং বক্রতার সূচক ১.৩২ ছিল। নিম্নদিকে বক্রতার সূচক হ্রাস পেয়েছে। অতএব নদীখাতের ধরন তীর ক্ষয়ের ধরন ও সঞ্চয়ের ধরন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে পদ্মানদী নদীখাত নকসার ধরন প্রসারতা বা Reach type হতে চলেছে।

পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলীঃ পানি নির্গমন, পানিতল, বন্যা ঘটন সংখ্যা, পলল নির্গমন মাত্রা, বিপদসীমা, বন্যা স্থায়িত্বকাল ইত্যাদি পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। যেমন-

পানি নির্গমন ও পানিতলঃ গঙ্গা-পদ্মা পুরাতন নদী হলেও পানি নির্গমন ও পানিতল রেকর্ড অতি সাম্প্রতিক কালের। ১৮১০ সাল হতে পানিতল ও ১৯৩৪ সাল হতে পানি নির্গমন তথ্য পাওয়া যায়। পদ্মানদী দিয়ে সর্বোচ্চ প্রায় ২৫ মিলিয়ন কিউসেক পানি নির্গমন হয়ে থাকে এবং সর্বনিম্ন ৪২০০০ কিউসেক। তবে ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাধ নির্মাণ ও পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের কারণে গড় বার্ষিক নির্গমন ৪১২০০০ কিউসেক। সর্বোচ্চ ২৬ মিলিয়ন কিউসেক, সর্বনিম্ন ৪২০০০ কিউসেক ও বর্ষাকালে ৭৫০০০ ঘন মিটার এবং শুষ্ক মৌসুমে মাত্র ১৫০০০ ঘনমিটার পানি নির্গমন হয়ে থাকে। অপরদিকে সর্বোচ্চ পানিতলের পরিমাণ ৪৮ ফুট এবং সর্বনিম্ন ১৮.৯ ফুট।

গঙ্গা-পদ্মা নদী দ্বারা প্রতি বছর প্রায় ১৬০০ মিলিয়ন টন ভাসমান বোঝা পরিবাহিত হয়ে থাকে। এ নদীতে সাধারণতঃ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বন্যা হয়ে থাকে।

গঙ্গার শাখানদী ও উপনদীসমূহঃ

পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে নিম্ন গঙ্গার উল্লেখযোগ্য শাখা নদীগুলো হচ্ছে, ভাগীরথী, হুগলী, মাথাভাঙ্গা, ইছামতি, ভৈরব, কুমার, কপোতাক্ষ, চিত্রা, নবগঙ্গা, গড়াই, মধুমতি এবং আড়িয়াল খা অন্যতম। এগুলোর মধ্যে গড়াই-মধুমতির পশ্চিমস্থ নদীগুলো পূর্বতন গতিপথ হারিয়ে অতিমাত্রায় রুদ্ধ অবস্থায় পরিণত হয়ে পড়েছে। যে অঞ্চল দিয়ে এই নদীগুলো প্রবাহিত সে অঞ্চলটিকে মৃতপ্রায় বদ্বীপ বলা হয়। গড়াই মধুমতি পূর্বদিকের নদীগুলো এখনও সক্রিয় এবং এ অঞ্চলে বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

গঙ্গা-পদ্মা নদী ও ফারাক্কা বাঁধঃ

গঙ্গা নদী এর অববাহিক অঞ্চলের প্রাণ। এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, কৃষি, বসতি, পরিবহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সাম্প্রতিক বছর গুলোতে নদীর কার্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের অভাবনীয় কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায়। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্ত হতে ১৬ কিমি দুরে ভারতের অভ্যন্তরে ১৯৭৫ সালে নির্মাণ করা ফারাক্কা বাঁধ। এই বাঁধের দ্বারা ভারত ইচ্ছামত পানি নিয়ন্ত্রণ করছে। নিম্নে ফারাক্কা বাঁধ কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যা গুলো তুলে ধরা হলোঃ

১) শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি ধরে রেখে ভারত তাদের ইচ্ছামত সেচ কাজে ব্যবহার করছে। কিন্ত বাংলাদেশ অংশে পানির অভাবে কৃষি ব্যাহত হচ্ছে, ভূগর্ভস্থ পানি স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সেই সাথে অনেকের মতে আর্সেনিক সমস্যাকে পানি স্তর নীচে নেমে যাওয়ার জন্য দায়ী করা হয়।

২) শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় নদী বক্ষে চর পড়ছে বেশি মাত্রায়।

৩) পানির প্রবাহ কমে গেলে জোয়ার ভাটার পানির চাপ এসে পদ্মার নিম্নপ্রবাহ এলাকায় পৌছায়। ফলে এই মিঠা পানি প্রবাহিত নদী অঞ্চলে লোনা পানির অনুপ্রবেশ কৃষি ভূমির উর্বরতা হ্রাস করছে।

৪) বর্ষা মৌসুমে ভারত অতিরিক্ত পানি ফারাক্কার মাধ্যমে ছেড়ে দেয়। ফলে হঠাৎ করে আসা পানি বাংলাদেশে পদ্মা অববাহিকা অঞ্চলে আকষ্মিক বন্যার সৃষ্টি করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে।

৫) নদী বক্ষে চর পড়া আর বর্ষা মৌসুমে হঠাৎ করে আসা প্রচুর পানির তোড়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নদী ভাঙ্গনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়াও ইহা আরও বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ ফারাক্কার নির্মাণকাল হতে বর্তমান পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমেও এর সমস্যার সমাধান হয়নি। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর দুই দেশের ন্যায্য পানির হিস্যা পাওয়া সম্ভব হয়নি। এর উপর ভারতের আন্তঃনদী পানি সংযোগ প্রকল্প যদি গৃহীত হয় তাহলে হয়ত আমাদের এই শস্য শ্যামল সবুজের নীড় বাংলাদেশ হয়ে যাবে ধূসর মরুভূমিতে যা বর্তমানে পরিবেশবাদিরা মনে করেন।

পাঠসংক্ষেপঃ

গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা পৃথিবীর বৃহৎ নদীপ্রণালীর মধ্যে অন্যতম এবং এ নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের ভূমি, বসতি, কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও যাতায়াত ব্যবস্থা অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে অবদান রাখছে। এক কথায় এ নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণের জন্য অতি গুরূত্বপূর্ণ। এই পাঠটি পড়ে গঙ্গা-পদ্মা নদীর উৎপত্তি ও প্রবাহপথ; গঙ্গা-পদ্মা নদীর গাঠনিক বৈশিষ্ট্যাবলী; গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী; গঙ্গা-পদ্মা নদীর শাখা নদী ও উপনদী সমূহ; এবং গঙ্গা-পদ্মা নদী ও ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে ‘স’ এবং মিথ্যা উত্তরের পার্শ্বে ‘মি’ লিখুনঃ**

১.১. গঙ্গা নদী ব্যবস্থা বাংলাদেশের জনগণের জন্য জীবন ও মরণ।
১.২. গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি হয়েছে।
১.৩. গঙ্গা-পদ্মা পুরাতন নদী হলেও পানি নির্গমন ও পানিতল রেকর্ড অতি সাম্প্রতিক কালের।
১.৪. গঙ্গা-পদ্মা নদী দ্বারা প্রতি বছর প্রায় ১৬০০ মিলিয়ন টন ভাসমান বোঝা পরিবাহিত হয়ে থাকে।
১.৫. নদী বক্ষে চর পড়া আর বর্ষা মৌসুমে হঠাৎ করে আসা প্রচুর পানির তোড়ের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নদী ভাঙনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ**

২.১. গঙ্গোত্রী হিমবাহের .... থেকে আগত ...., ... ও পশ্চিম দিক থেকে আগত .... সংগমস্থল .... এর দক্ষিণ থেকে মিলিত ধারা .... নামে পরিচিত।
২.২. পাটনার কিছু পূর্বে ...., বিপরীত দিকে .... এবং কিছু পূর্বে .... বামতীরে .... সাথে মিলিত হয়েছে।
২.৩. প্রথম শাখা .... এবং পরে .... নামে কোলকাতা দিয়ে .... পতিত হয়েছে।
২.৪. পদ্মানদী দিয়ে .... প্রায় ২৫ মিলিয়ন কিউসেক .... নির্গমণ হয়ে থাকে এবং সর্বনিম্ন .... কিউসেক।
২.৫. এ অঞ্চলের মানুষের ...., কৃষি, ..., প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম।
২.৬. বর্ষা মৌসুমে ভারত .... ফারাক্কার মাধ্যমে .... দেয়।

সংক্ষেপে উত্তর লিখুনঃ

১. পদ্মা নদীর প্রবাহপথ ও উৎপত্তি আলোচনা করুন।
২. পদ্মানদীর গাঠনিক বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করুন।
৩. পদ্মা বা গঙ্গা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন
৪. পদ্মা নদীর শাখা ও উপনদীসমূহ আলোচনা করুন।
৫. পদ্মা নদী ও ফারাক্কা বাঁধঃ ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. গঙ্গা-পদ্মানদী ব্যবস্থা আলোচনা করুন।
২. গঙ্গা-পদ্মানদীর পানিতাত্ত্বিক ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-২.৩

ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ◆ উৎপত্তি;
- ◆ নদীর দৈর্ঘ্য প্রশস্ততা ও গভীরতা;
- ◆ অববাহিকার আয়তন;
- ◆ ঢাল ও নদীমাত্রা; এবং
- ◆ বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

ভূপৃষ্ঠের নিয়ত পরিবর্তন সাধনকারী নিয়ামকসমূহের মধ্যে নদী অন্যতম এবং নদী মাতৃক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থা ও তার অববাহিকা এলাকার বিভিন্ন স্থানে ক্ষয়, বহন ও সঞ্চয় ক্রিয়ার মাধ্যমে বিচিত্র ভূমিরূপ সৃষ্টি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

যমুনা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী এবং বিশ্বের প্রধান নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা তিব্বত, ভারত ও বাংলাদেশ দিয়ে প্রবাহিত। যমুনা ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন প্রবাহ যা **১৭৯৭** সালের ভূমিকম্প ও বন্যার দ্বারা সৃষ্ট। নদীটি **৩১**°৬০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮২°.০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে হিমালয়ের মানস সরোবর ও কৈলাশ শৃঙ্গের মধ্যবর্তী চেমাইয়াংডং নামক হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। উৎপত্তিস্থল হতে চারবার নাম পরির্তন করে প্রবাহিত। ইহা তিব্বতে শানপো, আসামে ডিং ও ব্রহ্মপুত্র এবং বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা নামে পরিচিত।

যমুনা নদী উৎপত্তি স্থল থেকে শানপো নামে হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং সাদিয়া নামক স্থানে হিমালয়ের একটি বাঁক দিয়ে নেমে পড়ে। তারপরে আসামে প্রবেশ করে লোহিত নাম ধারণ করে। আসাম উপনত্যাকায় এই নদী ডিহং ও পরে ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত হয়ে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। অতঃপর গারো পাহাড়ের নিকট দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার নারায়নপর হউনিয়নের মাঝিয়াল নামক স্থান দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। নদীটি কিছুদূর প্রবাহিত হওয়ার পর বাহাদুরাবাদ ঘাটের নিকট দুইটি ধারা প্রবাহিত হয় যার একটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করেছে এবং অপরটি ঝিনাই নামক ক্ষুদ্র স্রোতধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে মিলিত ধারা যমুনা নামে (বর্তমান স্রোতধারা) দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এবং সিরাজগঞ্জ ও আরিচা ঘাট অতিক্রম করে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে।

নদীর দৈর্ঘ্য, প্রশস্ততা ও গভীরতাঃ উৎপত্তি স্থল হতে পদ্মার সাথে মিলনস্থল পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭০০ কিলোমিটার। বাংলাদেশের ভিতরে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র মিলে এর দৈর্ঘ্য ২৭৬ কিমি। এর মধ্যে যমুনার দৈর্ঘ্য ২০৫ কিলোমিটার।

যমুনা নদীর প্রশস্ততা ৩ কিমি হতে **১৮** কিমি পর্যন্ত তবে এর গড় প্রশস্ততা প্রায় **১০** কিমি। বর্ষা ঋতুতে এর প্রশস্ততা সচরাচর ৫ কিমি এর অধিক হয়ে থাকে। নদীটির গড় গভীরতা প্রায় **১৮** মিটার। তবে অবস্থান ভেদে কম বা বেশি হয়। বাহাদুরাবাদে নদীটির গড় গভীরতা **১৩.২৯-২০.৬২** মিটার এবং সিরাজগঞ্জের নিকট গড় গভীরতা **৭.০৩-১৫.১২** মিটার। প্রশস্ততা ও গভীরতা অনুপাত ৫০ঃ১ থেকে ৫০০ঃ১ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

অববাহিকা এলাকার আয়তনঃ ব্রহ্মপুত্র-যমুনা অববাহিকার আয়তন প্রায় ৫৮৩০০০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে তিব্বতে ২৯৩০০০ বর্গকিলোমিটার, ভারতে **২৪১০০০** বর্গকিলোমিটার এবং বাংলাদেশে কেবলমাত্রা ৪৭০০০ বর্গকিলোমিটার অবস্থিত। বাহাদুরাবাদের উজানে ব্রহ্মপুত্র ৫৩৬০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার পানি নিষ্কাশন করে থাকে।

যমুনা নদীর ঢাল ও নতিমাত্রাঃ অন্যান্য সকল নদীর মত যমুনা নদীর ঢাল ভাটিতে ক্রমান্বয়ে কম এবং উজানে বেশি হয়ে থাকে। বাহাদুরাবাদ হতে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যমুনার নদীর ঢাল প্রতি মাইলে ০.৩৫ ফুট বা প্রতি কিলোমিটারে ০.৬ সেমি। বাংলাদেশে নদীটির নতিমাত্রা ০.০০০০৭৭ যা গঙ্গার সাথে মিলন স্থলের নিকটে ০.০০০০৫ এ হ্রাস পায়। যমুনার গড় নতিমাত্রা **১.১১৮৫০** এবং ইহা গঙ্গার তুলনায় সামান্য বেশি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থা বড় বৈচিত্র্যময় এবং এর অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নলিখিত দিকগুলো উল্লেখযোগ্য।

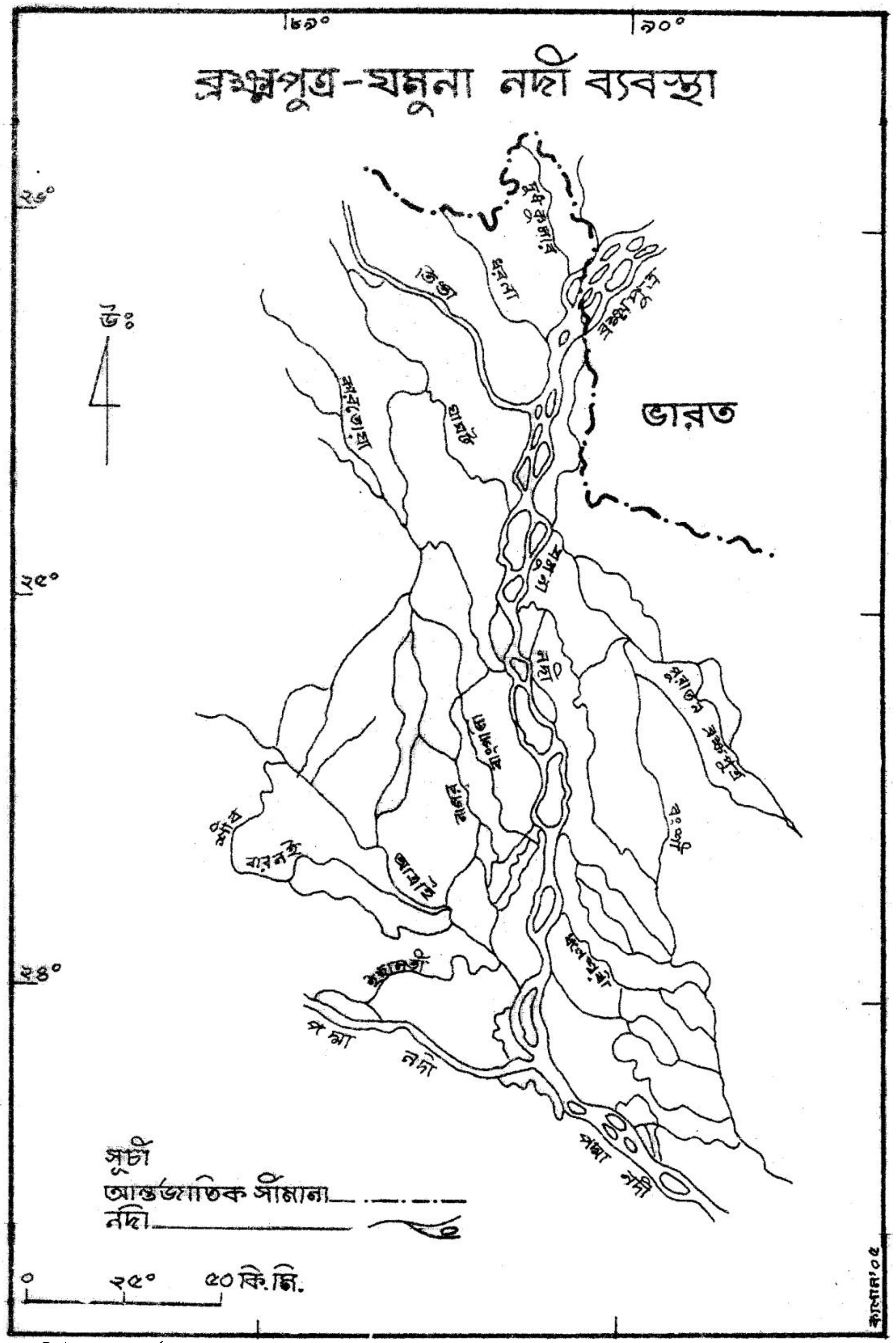

উৎস : পানি উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৮৮

চিত্র ২.৩.১ : ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা

ভাঙ্গন প্রবণ যমুনা নদীঃ যমুনা একটি ভাঙ্গন প্রবন নদী, বিধায় এর তটরেখা সর্বদা পরিবর্তনশীল। গত ১৬০ বছরে নদীটির কোন না কোন স্থানে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই ভাঙ্গনের মাত্রা অনেক বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিম পাড়ের গড় ভাঙ্গনও গড়ার হার বিগত দেড়শত বছরের চেয়ে যথাক্রমে ৯.৭ গুন -১০.২ গুন বেশি। ১৯৮১ হতে ১৯৯৩ সালের মধ্যে নদী ভাঙ্গনের ফলে সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ৭২৯০০০ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ছিল যমুনা নদীর তীর ভাঙ্গনের শিকার।

চর বিশিষ্ট নদী যমুনাঃ যমুনা নদীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি বিনুনী সদৃশ নদী। নদীর তীর ভাঙ্গনে ও পলি বহনের মাধ্যমে ও তলদেশে জমার ফলে নদীর মধ্যে চরের সৃষ্টি করে। এসব চরের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অস্থায়ী এবং বর্ষা ঋতুতে প্লাবিত হয়ে এর ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যেখানে উপনদীগুলো মূল নদীর সাথে মিলিত হয় সেখানে দ্বীপ চর সৃষ্টি হয় এবং যেখানে নদীর স্রোত এক তীর হতে সরে সরাসরি অন্য তীরে যায় সেখানে বালুচর সৃষ্টি করে। যমুনা নদীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল চর একত্রীকরণের ফলে চরের দৈর্ঘ্য অনেক সময় ৩.০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত হয়। ল্যান্ডসেট ইমেজ হতে দেখা যায় ১৯৯২ সালের শুষ্ক ঋতুতে যমুনা নদীতে ৫৬ টি বড় আকারের চর বিদ্যমান যেগুলোর দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ৩.৫ কিলোমিটার এবং ২২৬ টি ছোট আকারের চর বিদ্যমান যাদের দৈর্ঘ্য ০.৩৫-৩.৫ কিমি।

যমুনা নদীর শাখা নদী ও উপনদীসমূহঃ যমুনা নদীর অনেকগুলো শাখা নদী বিদ্যমান। এর মধ্যে লোহিত, বুড়ি, নোওয়া, তোলী, দিহাং, মালায়, ধানসিড়ি, মানস, কামাক্ষা, কোপিলি, সুবোনসিড়ি, দিহিস্তা ইত্যাদি প্রধান। যমুনা নদী দীর্ঘ পথ অতিক্রমের সময় অসংখ্য উপনদী এসে এর সাথে মিলিত হয়েছে। এর মধ্যে দুধকুমার, ধরলা, তিস্তা এবং করতোয়া, আত্রাই নদী প্রণালী অন্যতম।

যমুনা নদীর গতিপথের ধরনঃ প্রত্যেক নদীকে তার গতিপথের উপর ভিত্তি করে তিনটি প্রধান ভাগ করা যায়। যথাঃ ক) পার্বত্য এলাকার প্রবাহ বা প্রাথমিক গতি, খ) উপত্যকা এলাকার নদীর মধ্যগতি ও গ) সমতল এলাকার নদীর নিম্নগতি। সংগত কারণেই যমুনা- ব্রহ্মপুত্র নদীকে তিন ভাগ করা যায়। নদীর উৎপত্তিস্থল থেকে আসাম পর্যন্ত উচ্চ গতি বা পার্বত্য প্রবাহ, আসাম উপত্যকা থেকে মাসহারী পর্যন্ত নদীর মধ্যগতি এবং মাঝহারী থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত নিম্ন গতি বা সমতলভূমি অবস্থা।

যমুনা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যঃ যমুনা নদী অববাহিকায় প্রতি বছরই বন্যা দেখা দেয়, কেননা যমুনা নদী অববাহিকায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এখানে আসামের চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। তাছাড়া হিমালয়ের বরফগলা পানি ও মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে জুলাই হতে সেপ্টেম্বর মাসে মধ্য ও নিম্নাঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এখানে মৌসুমের শুরু হতে মৌসুমের মাঝে এবং শেষদিকে বন্যা হতে দেখা যায়।

যমুনা জোয়ারভাটা মুক্তঃ যমুনা নদীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই নদীতে জোয়ার ভাটা হয় না।

যমুনা নদীর পানি সমতল ও পানি নির্গমনঃ যমুনা নদীর চিলমারী, আকুলিয়া, কামারখালী, ফুলবাড়ি, বাহাদুরাবাদ, ভাগ্যনাথ, আরিচা, সিরাজগঞ্জ ও নগরবাড়ি ইত্যাদি স্থানে স্টেশন বসিয়ে পানি সমতল ও পানি নির্গমন উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। ১৯৮৮ সালে নুসাকোয়া স্টেশনের সর্বোচ্চ পানি সমতল ছিল ২৮.৯ মিটার এবং সর্বনিম্ন পানি সমতল ছিল ২০.৯ মিটার।

যমুনা নদীতে পানি নির্গমন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এই নদীতে বার্ষিক গড় পানি নির্গমন ৪০০০০ কিউমেক। বর্ষাকালে নির্গমন বেশি হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ পানি নির্গমন ছিল ১৯৮৮ সালে যার পরিমাণ ছিল ৯৮০০০ কিউমেক। বার্ষিক গড় প্রবাহ বাহাদুরাবাদের নিকট ৫১ মিলিয়ন একর ফুট।

তলানী বোঝা পরিবহণ ও সঞ্চয়নঃ যমুনা নদী প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ কোয়াটারনারী যুগে সৃষ্ট চুনবিহীন গাঢ় ধুসর বা বাদামী বর্নের প্লাবন সমভূমি দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কাদা, বালি, পলল কণা এবং সুক্ষ্ম কণার পরিমাণ বেশি। যমুনা নদীর মাধ্যমে বাহিত বোঝার আকার ০.১ মিমি হতে ০.২৮ মিমি। বর্ষা ঋতুতে যমুনা নদী দিয়ে দৈনিক প্রায় ১২ লক্ষ টন পলি বহন করে থাকে এবং বাহাদুরাবাদে পরিমাণকৃত যমুনার বার্ষিক পলিবহন ক্ষমতা প্রায় ৭৩৫ মিলিয়ন টন।

বিপদসীমাঃ এ নদীতে কিছু পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিপদসীমা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। নিম্নে যমুনা নদীর কিছু স্টেশনের বিপদসীমা দেখানো হলোঃ

সারণী ২.৩.১ : বিভিন্ন স্টেশনে যমুনা নদীর বিপদসীমা

স্টেশনের নাম	বিপদসীমা (মিটার)
চিলমারী	২৩.৩২
বাহাদুরাবাদ	১৯.৩৫
সিরাজগঞ্জ	১৮.৫৬
আরিচা	১১.০
গোয়ালন্দ	১০.০

উৎসঃ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

১৯৮৮ সালের বন্যার তথ্য হতে দেখা যায় বাহাদুরাবাদে সর্বোচ্চ পানি সমতল ছিল ২০.৭২ মিটার। যা বিপদ সীমার ১.৩৭ মিটার উপরে প্রায় ১০ দিন থেকেছে। এভাবে দেখা যায় প্রায় প্রতি বছরই পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

বন্যাঃ যমুনা নদীতে সারা বছরের পানি ছকের লাইন গ্রাফ আঁকলে দেখা যায় যে মধ্য জুলাই, মধ্য আগষ্ট এবং মধ্য অক্টোবরের পর থেকে তিনটি পিক পয়েন্ট বিদ্যমান। অর্থাৎ এই নদীতে বছরে তিনবার বন্যা হয়ে থাকে। পানি নির্গমনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং ডিসেম্বরে ও জানুয়ারী মাসে নির্গমনের পরিমাণ সর্বনিম্ন হয়। সাধারণত পদ্মা ও যমুনা নদী দিয়ে একই সময়ে বন্যা হয় না। তবে ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে।

পাঠসংক্ষেপঃ

পরিশেষে বলা যায় যে, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে যমুনা নদী একটি বেনুনী সদৃশ নদী যার প্রশস্ততা বেশি। গভীরতা তুলনামূলকভাবে কম। এই নদীতে বন্যা বেশি হয়ে থাকে। চরের পরিমাণ বেশি, এ নদীর ভাঙন প্রবণতা বেশি বিধায় বাংলাদেশে অনেকটা হুমকীর সম্মুখীন। এই নদী অনেক সম্পদ নষ্ট করছে। তাই এর অব্যাহত ক্ষয় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে দরকার সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনাসহ সুনিপূণ নদী প্রশিক্ষণ কর্মসুচীর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পুরণ করুনঃ**

১.১. ব্রহ্মপুত্র নদী তিব্বতে ...., আসামে .... ও .... এবং বাংলাদেশে .... নামে পরিচিত।

১.২. গারো পাহাড়ের নিকট দক্ষিণ দিকে বাঁকা .... জেলার নাগেশ্বরী থানার .... ইউনিয়নের .... নামক স্থান দিয়ে .... প্রবেশ করেছে।

১.৩. উৎপত্তি স্থল হতে পদ্মার সাথে.... স্থল পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় .... কিলোমিটার।

১.৪. যমুনা নদী .... পথ অতিক্রমের সময় অসংখ্য .... এসে এর সাথে .... হয়েছে।

১.৫. যমুনা নদীতে কাদা ...., পলল কণা এবং .... পরিমাণ বেশি।

২. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে 'স' এবং অঠিক উত্তরের পার্শ্বে 'মি' লিখুনঃ**

২.১. যমুনা নদী গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে।

২.২. অন্যান্য সকল নদীর মত যমুনা নদীর ঢাল ভাটিতে ক্রমান্বয়ে কম এবং উজানে বেশি হয়ে থাকে।

২.৩. যমুনা একটি ভাঙ্গন প্রবণ নদী।

২.৪. যমুনা একটি বিনুনী সদৃশ নদী।

২.৫. যমুনা নদী অববাহিকায় প্রতিবছরই বন্যা দেখা দেয়।

২.৬. যমুনা নদীতে জোয়ার ভাটা হয় না।

২.৭. যমুনা নদীতে চরের সংখ্যা বেশি।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর দৈর্ঘ্য, প্রশস্ততা, গভীরতা ও অববাহিকার আয়তন আলোচনা করুন।

২. যমুনা নদীর ঢাল, নতিমাত্রা, শাখা ও উপনদীসমূহ আলোচনা করুন।

৩. যমুনা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

২. ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-২.৪

মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা

এই পাঠ পড়ে আপনি-
- ◆ মেঘনা নদীর উৎপত্তি;
- ◆ নদীর নামকরণ;
- ◆ শ্রেণীবিভাগ ও বিবরণ;
- ◆ শাখানদীসমূহ;
- ◆ নদীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ;
- ◆ পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী;
- ◆ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলী; এবং
- ◆ নদী ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক ইস্যু সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী ব্যবস্থার মধ্যে মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা অন্যতম এবং দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি বৃহত্তম নদী ব্যবস্থা। পৃথিবীর বৃষ্টিবহুল চেরাপঞ্জির প্রায় কাছাকাছি স্থান এই নদী ব্যবস্থার উৎপত্তি স্থল এবং বাংলাদেশের প্রায় ৯০% পানি এই মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে।

মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামক হিসাবে নদীর নাম উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বড় বড় নদীগুলোর মধ্যে তিনটি বড় নদী বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলোর মধ্যে মেঘনা একটি বৃহত্তম নদীমালা। তবে সব কয়টি বড় নদী এদেশে পরিণত অবস্থায় প্রবাহিত ফলে এদেশের সমভূমি গঠনে নদীগুলোর ভূমিকা সক্রিয়। নদীগুলোর প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং পরিণত অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থিত হওয়ায় নদীগুলো নিয়ে চলছে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। মেঘনা নদী বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী এবং পৃথিবীর বৃহৎ নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি হিমালয় বহির্ভূত একটি নদী ব্যবস্থা।

মেঘনা নদীর উৎপত্তিঃ মেঘনা মনিপুর রাজ্যের উত্তরদিকস্থ পর্বত থেকে উদ্ভূত হয়ে কিছুদুর পর্যন্ত নাগাপাহাড় ও মনিপুর রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা রচনা করেছে। তবে বলা যায়, প্রকৃত পক্ষে মেঘনা আসামের নাগামনিপুর পাহাড়ে উৎপন্ন জলবিভাজিকার দক্ষিণ ঢালে বিদ্যমান বরাক নদীর অংশবিশেষ। পরবর্তীতে এটি ভৈরববাজারের কাছে মারকুলি নামক স্থানে মেঘনা নাম ধারণ করে এবং পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।

মেঘনা নদীর নামকরণঃ মেঘনা নদীর নামকরণ নিয়ে গল্প কথা প্রচলিত রয়েছে। এতে বলা হয়- আকাশে মেঘ দেখা দিলে মেঘনা উত্তাল হয়ে যায়। এ সময় নৌযান চলাচল নিরাপদ নয়। তাই মেঘনা এর নামের ব্যাখ্যা দাড়ায় মেঘ+না অর্থাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিলে নাও ছাড়ো না। মেঘনা নামের এই কিংবদন্তী আজও মাঝি মাল্লাদের মনে সক্রিয়ভাবে জাগরুক রয়েছে (ওয়াজেদ)।

মেঘনা নদীঃ উৎসস্থল থেকে মোহনা পর্যন্ত মেঘনা নদীকে নিম্নোক্ত ২টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

প্রথম অংশ

পরবর্তী অংশ

নিম্নে এগুলোর আলোচনা করা হলোঃ

প্রথম অংশঃ প্রথম অংশ বলতে বোঝায় মেঘনা উৎপত্তি লাভের পর সামান্য পথ অতিক্রম করা পর্যন্ত। অর্থাৎ বরাক নদী ভারতের আসামরাজ্যের কাছাড় জেলার শিলচরের নিকট থেকে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে শ্রীহট্ট জেলার অমলশিদ নামক স্থানে দুটো ধারায় বিভক্ত হয়। এই ধারা দুটি নিম্নরূপঃ

ক) সুরমা

খ) কুশিয়ারা

ক) সুরমাঃ সুরমা পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে সিলেট শহরে প্রবেশ করে। এরপর উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে সুনামগঞ্জে আসে। এরপর দক্ষিণ-পশ্চিম হয়ে মদনার নিকট কুশিয়ারার সাথে মিলিত হয়। মেঘালয়ের মালভূমি থেকে উৎপন্ন অনেকগুলি নদী ও পানি প্রবাহ উত্তর দিক থেকে সুরমার সাথে মিলিত হয়। পূর্ব থেকে উত্তর দিকে এগুলো হলো- লুভা, হরি (কুশিয়া), গোয়াইন গাঙ্গ (চেঙ্গার খাল), পিয়াইন, বোগাপানি, যদুকাটা, সোমেশ্বরী এবং কংশ।

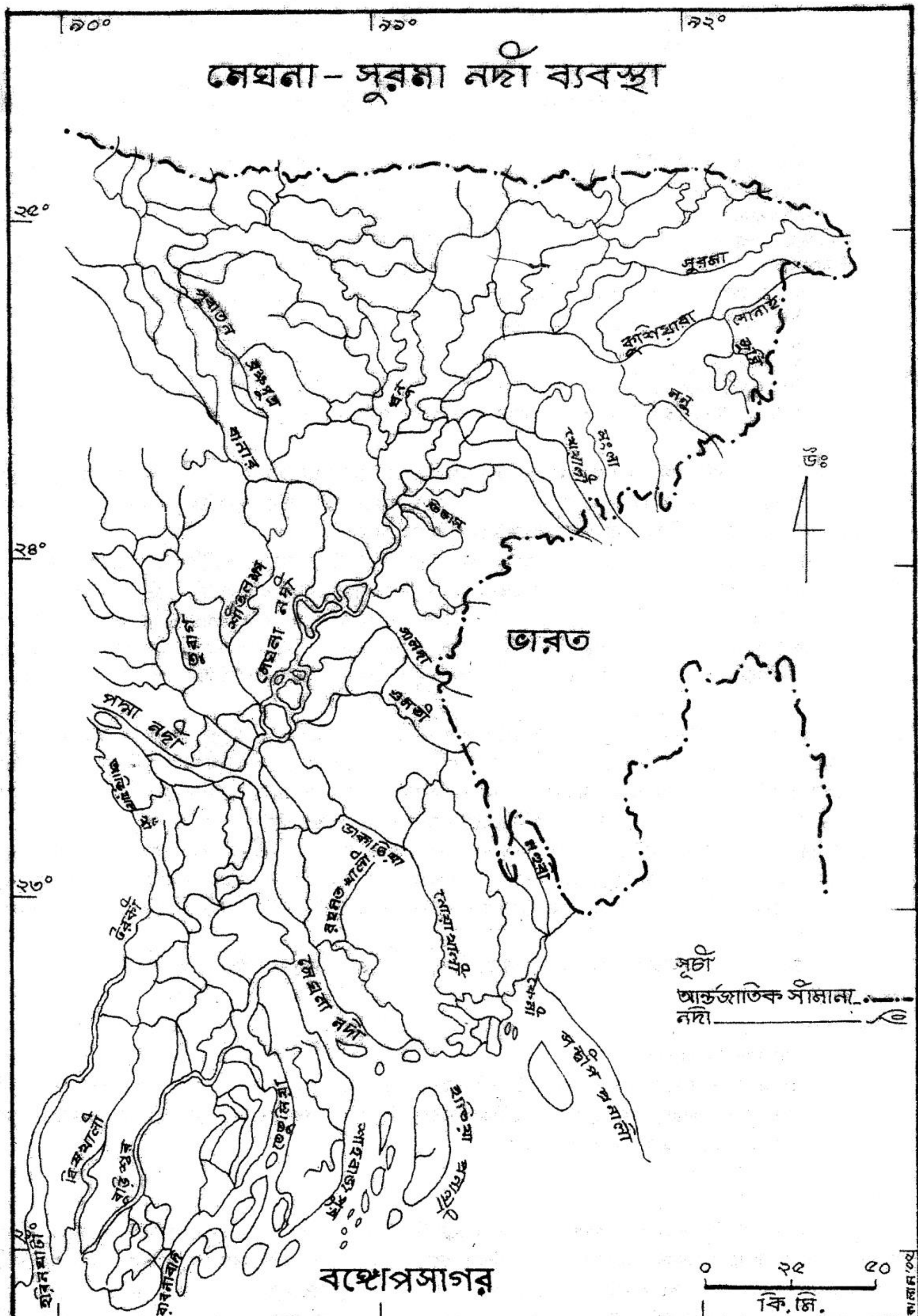

উৎস : পানি উন্নয়ন বোর্ড ' ১৯৮৮

চিত্র ২.৪.১ : মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা

মোহনগঞ্জের দক্ষিণে মগরার নিকট সুরমা দুইভাগে বিভক্ত হওয়ার পূর্বে কংশ নদীর পানিকে ধারণ করে। পশ্চিমের এই নদীটির উপরের অংশ ধানু, মাঝের অংশ বাউলি এবং নীচের অংশ ঘোড়াউতরা নামে পরিচিত। এই প্রবাহধারা কুলিয়ার চর পর্যন্ত এসে মিলিত হয়।

খ) কুশিয়ারাঃ বরাক নদীর দক্ষিণ অংশ কুশিয়ারা নামে পরিচিত। এটা উত্তরে মৌলভীবাজারের দক্ষিণে উলিবাজারে এসে ২ ভাগ হয়। বিভক্ত হওয়ার পূর্বে কুশিয়ারা নদী মনু নদীর পানিকে ধারণ করে। কুশিয়ারার বিভাগগুলি নিম্নরূপঃ

* উত্তরের অংশ বিবিয়ানা।
* দক্ষিণের অংশ বরাক।

বিবিয়ানা কিছুদুর চলার পর কালনী নাম ধারণ করে। আজমীরিগঞ্জের নিকট কালনী সুরমার সাথে মিলিত হয়।

কুশিয়ারার অপর অংশ বরাক নদী পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে আগত গোপলা এবং খোয়াই নদীর সাথে মিলিত হয় এবং এরপর মদনার নিকট সুরমায় পতিত হয়।

পরবর্তী অংশঃ সুরমা ও কুশিয়ারার দুই অংশ মিলিত হওয়ার পর আজমীরিগঞ্জের নিচে মেঘনা নাম ধারণ করে এবং পরবর্তীতে এই নদী হাওড় বেসিনে মিলিত হয়। এখানে পানি প্রবাহটি ২ ভাগে বিভক্ত হয়।

ক) আপার মেঘনা

খ) লোয়ার মেঘনা

ক) আপার মেঘনাঃ আপার মেঘনা কুলিয়ার চর থেকে ষাটনল পর্যন্ত অবস্থিত। এটি অপেক্ষাকৃত ছোট নদী।

খ) লোয়ার মেঘনাঃ এই নদীটি ষাটনল এর নিচ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রশস্তড়তম নদী হিসাবে পরিচিত। লোয়ার মেঘনার সাথে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও গঙ্গার পানি এসে মিশেছে এবং এই প্রবাহ পরে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

মেঘনার শাখানদীঃ মেঘনার প্রধান প্রধান শাখা নদীগুলো নিম্নরূপঃ

পাগলী, উর্বমদি, কাঁঠালিয়া, ধনালিয়া, ধনাগদা, মতলব।

মেঘনা এবং উপরোক্ত শাখানদীগুলির সাথে ত্রিপুরার পার্বত্য এলাকা থেকে কিছু প্রবাহ এসে মিলিত হয়। এগুলো হলো- গোমতী, বালুঝুরি, হান্দাছড়া, হাওড়া, কুরিলিয়া, জঙ্গোলিয়া, সোনাইবুড়ি, সোনাইছড়ি, দুরদুরিয়া। এসব পাহাড়ী নদীগুলো মেঘনা নদীর কারণে যে আকস্মিক বন্যা হয় সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মেঘনা নদীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থঃ বরাক-মেঘনার দৈর্ঘ্য প্রায় ৮০৪ কিমি। ভৈরববাজার ব্রীজের নিকট এর প্রশস্ততা .৭৫ কিমি। অপরদিকে ষাটনলের নিকট মেঘনার প্রশস্ততা ৫ কিমি। ষাটনল থেকে ১৬ কিমি দূরে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র যমুনা মেঘনার সাথে মিলিত হয় তখন এর প্রশস্ততা দাড়ায় ১১ কিমি (বর্ষাকালে)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মেঘনার দক্ষিণভাগ পৃথিবীর বৃহৎ নদীগুলির একটি।

সারনী ২.৪.১. সুরমা মেঘনা নদীর প্রকৃত দৈর্ঘ্য এবং অন্তর্ভূক্ত এলাকা (মাইল) নিম্নে (ছকের) মাধ্যমে উল্লেখ করা হলোঃ

মোট দৈর্ঘ্য		অন্তর্ভূক্ত এলাকা (মাইলে)
মাইল	কিমি	
৪১৬	৬৬৯	সিলেট- ১৮০ কুমিল্লা - ১৪৬ বরিশাল-৯০

উৎসঃ Statistical Yearbook, 2000.

এছাড়াও আপার মেঘনার দৈর্ঘ্য ৯৪৯.৩ কিমি এবং লোয়ার মেঘনার দৈর্ঘ্য ১৬০.৯ কিমি (হারুনুর রশিদ, জিওগ্রাফি অব বাংলাদেশ)।

মেঘনা নদীখাতঃ প্রাথমিক পর্যায়ে নদীখাত সংকীর্ণ ধরনের হলেও বার্ধক্য/পরিণত পর্যায়ে নদীখাত প্রশস্ত হয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, মেঘনা নদীতে প্রশস্ত খাত দেখা যায়। এর প্রকৃত কারণ হলো উৎপত্তিস্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন খাত অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়া। অর্থাৎ মেঘনা নদী একটি পরিণত পর্যায়ের নদী।

মেঘনা নদীর পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী

পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বলতে সাধারণত পানির নির্গমন, পানি সমতল, লবণাক্ততা, বন্যা, অববাহিকার আয়তন ইত্যাদি বোঝায়। নিম্নে এগুলোর বর্ণনা করা হলোঃ

পানি নির্গমনঃ সুরমা নদীতে ১৯৫০ এবং ১৯৫৮ সালে পানির নির্গমন পরিমাপ করা হয় সর্বোচ্চ ৫৩০০৮ কিউসেক (১৫ আগষ্ট, ১৯৫৮) এবং সর্বনিম্ন ৪৮৭ কিউসেক (২১মার্চ ১৯৫৪)। অপরদিকে কুশিয়ারায় বর্ষাকালে ১৫০০০ কিউসেক পানি

নির্গমন ঘটে। ভৈরববাজার ব্রীজের নিকট পানির নির্গমন পরিমাপ করা হয় প্রায় গড়ে ৭১০০ ঘনমিটার/সে (মে মাসের শেষ থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত)।

সারনী: ২.৪.২ : সিলেট স্টেশনে ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে সুরমা নদীর পানি নির্গমনের কালিক বন্টন (ঘন মিটার/ সেকেন্ড)

মাস	নির্গমনের পরিমাণ
এপ্রিল	২.৮৫৫
মে	৬.৫৮৬
জুন	৯.৩৫২
জুলাই	১০.২৭৫
আগষ্ট	১০.৩৩৩
সেপ্টেম্বর	৯.২৩৫
অক্টোবর	৭.৪৮৫
নভেম্বর	৫.৬৯২
ডিসেম্বর	৩.৯৬৯
জানুয়ারী	২.৬৩৯
ফেব্রুয়ারী	২.২৫৭
মার্চ	৫.০৯০
বার্ষিক	৭৫.৭৬৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পানি বছর এপ্রিল-মার্চ)

এছাড়া লোয়ার মেঘনা প্রতি বছর গড়ে ৮৭৫ মিলিয়ন একর ফুট পানি নির্গমন করে এবং আপার মেঘনা ৯২ মিলিয়ন একর ফুট (MAF) পানি নির্গমন করে।

পানি সমতলঃ ১৯৯৯ -২০০০ সালে যে তথ্য পাওয়া যায় সে প্রেক্ষিতে বলা যায়, সেই বছর মেঘনা নদীর পানি সমতল এর পরিমাণ সর্বোচ্চ ছিল। তবে সর্বনিম্ন মানও সে নদীতে ছিল। অর্থাৎ বলা যায়, ১৯৯৯-২০০০ সালে ভৈরববাজার স্টেশনে মেঘনা নদীর পানি সমতল এর পরিমাণ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ছিল।

সারনী: ২.৪.৩ : মেঘনা ও সুরমা নদীর পানি তল এর পরিমাণ

নদী	স্টেশন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
মেঘনা	ভৈরববাজার	৪৯.৮০	০.০০
সুরমা	সিলেট	১১.২৫	২.২৫

উৎসঃ BWDB, Water year (April-March)

বন্যাঃ এই নদী ব্যবস্থায় বছরে ২ থেকে ৩ বার বন্যা হয়, যা সাধারণতঃ জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসসমূহে ঘটে থাকে। তবে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীতে মে মাস থেকে বন্যা হয় (সারণী)।

সারণী ২.৪.৪ : বন্যার সময় (দিন), বিপদসীমার পূর্বে ১৯৮৮

নদী	স্টেশন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	মোট
মেঘনা	ভৈরববাজার	২৫	১৩	২৫	৬৩
লয়ার মেঘনা	চাঁদপুর		২৬	১৯	৪৫

উৎসঃ Nizamuddin, K, (2001), Disaster in Bangladesh: Selected Readings.

প্রধান নদীর সাথে অনেক ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর জলধারা এখানে মিলিত হয়। এ কারণে পাহাড়ী ঢল নামে এবং হঠাৎ বন্যা হয়। একে Flash Flood বলে। মধুপুর গড় ব্যতীত প্রায় সমগ্র মেঘনা উপত্যকা বর্ষার সময় সম্পূর্ণ প্লাবিত হয় এবং প্রতি বছর এ অঞ্চলের মৃত্তিকার একটি করে নতুন পলির আস্তরণ পড়ে।

পানির রাসায়নিক গুণাগুণ

সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থার পানির রাসায়নিক গুণাগুণ পর্যালোচনা করার জন্য ভৈরববাজার স্টেশনের পানিকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এখান থেকে পানির P^H, CO_2, CA, MG, CO_3, HCO_3, SO_4, -এর মান বের করা হয়। নিম্নে (ছকের) মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

সারনী: ২.৪.৫ : সুরমা-মেঘনা নদীর রাসায়নিক মান

নদীর নাম ও স্টেশন	P^H	CO_2	Ca	Mg	CO_3	HCO_3	SO_4	Cl	Salinity	TER
সুরমা-মেঘনা ভৈরববাজার মার্চ ১৯৮৩	9.91	2.94	11.00	8.21	2.35	43.63	37.73	6.95	42.54	280

উৎসঃ Technical Journal, River Research Institute (Faridpur), Vol. 02, No. 01, Jan. 1995.

সুরমা-মেঘনা নদীর উপরোক্ত সারণীতে প্রাপ্ত রাসায়নিক মান বিশেষত P^H মান দেখে বলা যায় এ নদীর পানিতে ক্ষারকত্ব বেশি। এছাড়া পানি স্বচ্ছ প্রকৃতির।

লবণাক্ততাঃ পদ্মার সাথে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মেঘনা লবণাক্ত পানি বহন করে। নীলকমল, দৌলতখান, চাঁদপুর, ষাটনলে নদীর পানির লবণাক্ততা পরীক্ষা করা হয়। সুরমা-মেঘনা নদীর পানি ভৈরববাজারে যে লবণাক্ততার পরীক্ষা করা হয় তার মান ৪২.৫৪।

অববাহিকা আয়তনঃ মেঘনার অববাহিকা উপমহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল অঞ্চল এবং প্রবাহ মূলত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। উৎস হতে মেঘনা অববাহিকার আয়তন ৬৪৭৫০ বর্গকিলোমিটার এর মধ্যে ২০৭২০ বর্গকিলোমিটার বাংলাদেশের অন্তর্গত।

সারনী: ২.৪.৬ : আপার মেঘনা এবং লোয়ার মেঘনার অববাহিকার আয়তন (মিলিয়ন একর)

নদী	অববাহিকার আয়তন (মিলিয়ন একর)
আপার মেঘনা	২০
লোয়ার মেঘনা	৪১৬

উৎসঃ হারুনুর রশিদ, Geography of Bangladesh.

উপরোক্ত দুটি নদীর অববাহিকার আয়তন লক্ষ্য করলে খুব সহজেই বোঝা যায় আপার মেঘনা অপেক্ষা লোয়ার মেঘনা নদী বড় এবং প্রশস্ততম নদী। নদী দুটি বাংলাদেশে অন্তর্গত। এবং এই নদী দুটির অববাহিকার আয়তন তাই নাগাপাহাড় থেকে পরিমাপ করা হয়নি। বরং বাংলাদেশের কুলিয়ারচর থেকে পরিমাপ করা হয়েছে।

এক নজরে সুরমা-মেঘনার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মেঘনা একটি বৃহৎ নদী। এ নদীর উদ্যোমে এখনও ভাটা পড়েনি। সুরমা-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা-গঙ্গার মিলিত স্রোতধারা এ নদীর সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ।
- এ নদী বিপুল এলাকা দিয়ে প্রবাহিত। নদীটি ভাঙ্গন প্রবন।
- মেঘনার নীচের দিকে প্রচুর চর রয়েছে।
- মেঘনা অত্যন্ত গভীর ও নাব্য নদী, সারা বছর নৌ চলাচল করতে পারে।
- ধলেশ্বরীর সাথে মিলিত হওয়ার স্থানে দুই নদীর পানির রং এ সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এখানে মেঘনার পানি পরিস্কার নীলাভ সবুজ। আর ধলেশ্বরীর বাদামী (ওয়াজেদ)।
- মেঘনার তীরে প্রসিদ্ধ স্থানগুলি হলো- সিলেট, সুনামগঞ্জ, নরসিংদী, ভোলা, চাঁদপুর, বরিশাল প্রভৃতি।
- উল্লেখযোগ্য নৌ ও বাণিজ্যবন্দর হলো- ভৈরববাজার, কুলিয়ারচর, কালুপুর, পুরাতন চাঁদপুর, মারকুলী, আজমীরিগঞ্জ, মদনা, বৈদ্যের বাজার, রামদাসপুর।
- কুলিয়ারচর পৃথিবীর অন্যতম মৎস বাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা ও আশুগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এ নদীর তীরে অবস্থিত।

মেঘনা নদী ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক ইস্যু

মেঘনা একটি আন্তর্জাতিক নদী। এই নদীর উৎসস্থল ভারতে হওয়ায় এই নদী নিয়ে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে একটি তিক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান। ভারত মেঘনার উজানে আসামের বরাক ও তুইড়ী নদীর সঙ্গমস্থলে টিপাইমুখ জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। ড্যামটির উচ্চতা ১৬১ মি ও দীর্ঘ ৩৯০ মিটার যাতে ১৫.৯ হাজার মিলিয়ন ঘন মিটার পানি মজুদ রাখা যাবে। এই পানি দিয়ে ভারত সেচ নৌ চলাচল ও শুকনা মৌসুমে পানি প্রবাহ বাড়ানোর কাজ চালাবে।

ভারতের নদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে বন্যা কমবে না বরং উল্টো হবে। বর্ষার সময় জলাধারে পানি আটকে দিলে বন্যার আশংকা কমবে না বাড়বে তা নির্ভর করবে সে বছরের বৃষ্টিপাতের উপর। বৃষ্টি বেশি হলে জলাধার চাপ সামলাতে পারবে না। তখন জলাধার বাচাতে বিপুল পরিমাণ পানি এক সঙ্গে ছেড়ে দেয়া হলে মুহুর্তের মধ্যে ব্যাপক এলাকা তলিয়ে যাবে।

এছাড়া ভূতত্ত্ববিদগনের মতে টিপাইমুখ বাঁধ এলাকা অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। এখানে বাধ দিয়ে তাই নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করা সমীচিন নয়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এই এলাকায় ভূমিকম্প আঘাত হানবে এবং ধ্বংসলীলা চলবে যার অনুমাণ ভবিষ্যতই।

আন্তর্জাতিক ইস্যুর সমাধানঃ উপরোক্ত সমস্যাগুলো শুধুমাত্র মেঘনা নদী ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয় বরং তিস্তা, পদ্মা-যমুনার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। নদী ও দেশকে বাঁচানোর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেঃ

- স্থিতিশীল সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সম্পর্কে কল্যাণমুখী একমত পোষণ করা।
- দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও নদী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময় পর পর সারা দেশের নদী ব্যবস্থা পর্যবেক্ষন করতে হবে।
- স্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে নদী ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটান।
- নদীতে ধ্বংসাত্বক অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধ করার জন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে এর স্বীকৃতি আদায় করতে হবে।
- আমাদের দেশের নদীগুলি প্রতিনিয়ত গতিপথ পরিবর্তন করে এবং নতুন পলল গঠন করে। এই অবস্থার পরিবর্তন করা না গেলেও সঠিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা পলল ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

পাঠসংক্ষেপ

একটি সীমান্তবর্তী নদী হিসাবে মেঘনা নদী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী। এছাড়া এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সবকিছুর সাথে এই নদী সম্পৃক্ত। তাই এই নদীর গুরুত্ব ও অবদান অনেক বেশি। এ কারণে এই নদী ব্যবস্থায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২:৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ**

১.১. মানুষের জীবনযাত্রার উপর .... বিস্তারকারী .... হিসেবে .... নাম উল্লেখযোগ্য।

১.২. নদীগুলোর প্রাথমিক, ... এবং পরিণত অবস্থা ...... দেশে অবস্থিত হওয়ায় .... নিয়ে চলছে .... চক্রান্ত।

১.৩. মেঘনা মনিপুর রাজ্যের উত্তর দিকস্থ.... থেকে .... হয়ে কিছুদুর পর্যন্ত .... ও .... রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা রচনা করছে।

১.৪. বরাক নদী ভারতের .... জেলার .... নিকট থেকে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে শ্রীহট্ট জেলার .... নামক স্থানে দুটো ধারায় বিভক্ত হয়।

১.৫. মেঘালয়ের .... থেকে উৎপন্ন অনেকগুলি .... ও .... উত্তর দিক থেকে .... সাথে মিলিত হয়।

১.৬. সুরমা ও .... দুই অংশ মিলিত হওয়ার পর .... নীচে .... নাম ধারণ করে এবং পরবর্তীতে এই .... বেসিনে মিলিত হয়।

১.৭. লোয়ার .... সাথে ব্রহ্মপুত্রঃ .... ও .... পানি এসে .... এবং এই প্রবাহ পরে .... পড়েছে।

১.৭. উত্তরঃ মেঘনার, যমুনা, গঙ্গার, মিশেছে, বঙ্গোপসাগরে।

১.৮. প্রধান .... সাথে অনেক ছোট ছোট .... নদীর .... এখানে মিলিত হয়।

১.৯. মেঘনার অববাহিকা .... মধ্যে সর্বাপেক্ষা .... এবং প্রবাহ মূলতঃ .... উপর নির্ভরশীল।

১.১০. আপার মেঘনা .... লোহার মেঘনা নদী .... এবং .... নদী।

১.১১. একটি .... নদী হিসেবে .... নদী অন্যতম .... নদী।

২. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে ‘স’ এবং মিথ্যা উত্তরের পার্শ্বে ‘মি’ লিখুন।**

২.১. মেঘনা হিমালয় বহির্ভূত একটি নদী ব্যবস্থা।
২.২. মেঘনা নদী একটি পরিণত পর্যায়ের নদী ব্যবস্থা।
২.৩. মেঘনা অত্যন্ত গভীর ও নাব্য নদী, সারা বছর নৌ চলাচল করতে পারে।
২.৪. মেঘনা একটি সীমান্তবর্তী নদী ব্যবস্থা।
২. ৫. মেঘনা একটি পাহাড়ীয়া নদী।

সংক্ষেপে উত্তর লিখুনঃ

১. মেঘনা নদী ব্যবস্থার উৎপত্তি, নামকরণ ও গতিপথ আলোচনা করুন।
২. মেঘনা নদী ব্যবস্থার শাখা নদীসমূহের একটি বিবরণ দিন।
৩. মেঘনা নদী ব্যবস্থার গঠনগত বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।
৪. মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থার পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।
৫. মেঘনা নদী ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক ইস্যু বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা আলোচনা করুন।
২. মেঘনা নদীর গঠনগত ও পানিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করুন।

পাঠ-২.৫

বাংলাদেশে বন্যা

এই পাঠটি পড়ে আপনি-

◆ বন্যার সংজ্ঞা;
◆ বন্যার কারণসমূহ;
◆ বন্যার শ্রেণবিভাগ ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী;
◆ বন্যার উপকারিতা ও অপকারিতা; এবং
◆ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও তার উপায়সমূহ সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

বন্যা একটি ভয়াবহ দূর্যোগ যা বাংলাদেশে নিয়ত ঘটনা বলে পরিচিত। ইহা পরিবেশগত অবস্থাসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় রূপে চিহ্নিত। একদিকে যেমন ইহা যাতায়াত ব্যবস্থা, মৎস্যখাত ও মৃত্তিকার উর্বরতা ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তেমনি আবার ইহা মানুষের ক্ষেতের শস্যসহ জানমালের ব্যাপক ধ্বংসলীলয় তৎপর থাকে। বিগত ১০০ বছরে এদেশে প্রায় ৩০ বার বন্যা সংঘটিত হয়েছে তন্মধ্যে প্রলয়ংকারী ধরনের ১৭ টি, মহাপ্রলয়ংকারী প্রকৃতির ৫ টি এবং বাকী ৮ টি সাধারণ ধরনের বন্যা বলে চিহ্নিত হয়েছে (মহালনবীশ, পানি উন্নয়ন বোর্ড)।

হিমালয় দুহিতা নদীমাতৃক দেশ হিসেবে পরিচিত নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের দূর্যোগ বিশেষ করে বন্যা যা প্রতি বছরই দেশের কোন না কোন অঞ্চলে সংঘটিত হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ এক দিকে যেমন সম্পত্তি, জানমাল, শস্য, ফল, রাস্তাঘাট, বসতি ইত্যাদির অপরিসীম ধ্বংস লীলা বয়ে আনে, আবার অন্যদিকে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক সুবিধার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

প্রতিবছর আর্দ্র মৌসুমে দেশের প্রায় ২০% এলাকা স্বাভাবিক বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং ১৯৮৮ সালের মহা বন্যায় দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ এলাকা বন্যার কবলে পড়ে (ভূঞা ও ইলাহী, ১৯৮৮)। অতিসম্প্রতি ২০০৪ সালে দেশের প্রায় ৭৫ ভাগ বন্যার কবলে পড়ে এবং ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

নদীর দুই তীর/দুকূল ছাপিয়ে উপচিয়ে যে পানি প্লাবন সমভূমিতে পতিত হয় এবং দ্রুত পার্শ্ববর্তী এলাকা তলিয়ে ফেলে, তাকেই বন্যা বলা হয়। অর্থাৎ নদীর ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি পানি ফসলের জমি, বসতি, ভিটা, রাস্তাঘাট ডুবিয়ে ফেলে এবং বিভিন্ন জিনিসের ব্যাপক ক্ষয় সাধন করে, তাকে বন্যা বলে। সমভূমি অঞ্চলে ও মোহনার কিছু উজানে প্রায়ই বন্যা লেগে থাকে। নদী বাহিত পলল অবক্ষেপনের কারণে নদীখাত ভরাট হয়ে গেলে ঋতু বিশেষে অকস্মাৎ উজান এলাকা হতে প্রচুর পানি নেমে আসলে স্বল্প গভীর নদীর খাত বা বক্ষ ধারণ করতে সক্ষম হয় না। ফলে নদীর উভয় তীর ছাপিয়ে প্রচুর পানি চতুস্পার্শের স্থানসমূহ প্লাবিত করে। বাংলাদেশের বড় বড় নদী এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হতে দেখা যায়।

বন্যার সংজ্ঞার ব্যাপারে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে। এখানে কয়েক জনের সংজ্ঞা প্রদান করা হলোঃ

স্ট্রলারের মতে, "কোন নদী নালা ও নিম্নভূমির জল ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত প্রবাহ দুকুল উপচে যদি পারিপার্শ্বিক ভূমি, বন, বসতি প্লাবিত করে তাহলে সার্বিকভাবে ঐ অবস্থাকে বন্যা বলা হয়।"

চাও এর মতে "বন্যা হলো ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পানি প্রবাহ যা নদীখাত দিয়ে উপচিয়ে পার্শ্ববর্তী ভূমি বা জনপদকে প্লাবিত করে।"

বণ্ডুম বলেন, কোন একটি নদীর কতিপয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে নদীর জ্যামিতিক খাত অনুযায়ী অতিরিক্ত পানি নির্গমন যদি নদীখাতের উচ্চতা অতিক্রম পূর্বক উপচিয়ে প্রবাহের সৃষ্টি হয়ে বন্যা সংঘটিত হবে।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে, কোন স্থান হঠাৎ বৃষ্টিপাত বা বরফগলা জনিত কারণে নদীতে পানি বৃদ্ধি বা অন্য কোন কারণে নদীর পানি আকষ্মিকভাবে বেড়ে গিয়ে যখন নদীর উভয় কূল ছাপিয়ে পার্শ্বেবর্তী এলাকার উপর দিয়ে দ্রুত পানি প্রবাহিত হয়ে ফসলের জমি, বসতবাড়ি, অস্থাবর সম্পত্তি ও পশু পাখির আধার বিনস্টসহ ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে তখন তাকে বন্যা বলা হয়। বন্যা সাধারণতঃ প্লাবন সমভূমি অঞ্চলে বেশি হয়। আবার নদীর অববাহিকা বা উৎস অঞ্চলে বন্যা সংঘটিত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার কারণ হিসেবে সামগ্রিকভাবে জলবায়ু সংক্রান্ত ভূপ্রাকৃতিক, ভূতাত্ত্বিক, সামুদ্রিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি নিয়ামক চিহ্নিত হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোন একটি নিয়ামককে এককভাবে দায়ী করা যায় না। সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন নিয়ামক এদেশের মানুষের সীমাহীন দুঃখের বিষয় বন্যার সৃষ্টির জন্য দায়ী। তবে আলোচনার সুবিধার্থে বন্যার কারণগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে আগ করা যায়। যেমন- ১) প্রাকৃতিক ও ২) অপ্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট কারণ।

১) প্রাকৃতিক কারণঃ এর মধ্যে জলবায়ুগত, ভূ-তাত্ত্বিকগত, সামুদ্রিক ইত্যাদি বুঝায়। যেমনঃ

ক) জলবায়ু সংক্রান্ত কারণসমূহ

ক.১) অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পানিঃ হিমালয় পর্বত ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় মহাসাগরের দিক থেকে আগত গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু এই সুউচ্চ ও সুদীর্ঘ পর্বত প্রাচীরে প্রতিহত করে। প্রচুর জলীয় বাস্প বহনকারী এই বায়ু হিমালয়ের পাদদেশে এবং বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। গঙ্গা-ব্রক্ষপুত্র, মেঘনা নদীর উপনদী গুলোর ধারণ অববাহিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে এসব নদীখাতের প্রচুর পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন নদী বন্যার সৃষ্টি করে।

ক.২) অতিরিক্ত বরফগলা পানিঃ গ্রীষ্মের অধিক উত্তাপে হিমালয় পর্বত অঞ্চলে প্রচুর বরফ গলতে শুরু করে। বিভিন্ন সুরঙ্গ পথে এই পানি নেমে বড় বড় নদীখাতে এই সরবরাহ করে। বর্ষা ঋতু আবির্ভাবের আগেই এই পানি বাংলাদেশের নদীগুলোর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়।

ক.৩) পুনঃপুনঃ নিম্নচাপ সৃষ্টিঃ ২১ মার্চ সূর্যের নিরক্ষরেখা অতিক্রমের পর উত্তর গোলার্ধে দ্রুত উষতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় বঙ্গোপসাগরে পুনঃপুনঃ নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় ফলে বঙ্গোপসাগরের উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়। তাই ক্রমান্বয়ে পানি বিভিন্ন খাড়ী পথে ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি করে।

ক.৪) উত্তরমুখী বায়ুপ্রবাহঃ বাংলাদেশের প্রায় সব গুলো নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোসাগরে পানি সরবরাহ করে। গ্রীষ্মকালে মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হবার ফলে নদীর পানি যত তাড়াতাড়ি সমুদ্রে নেমে যাওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কম হারে পানি নেমে যায়। কিন্তু নদীর পানি অধিক উত্তর দিক থেকে আসতে থাকায় বন্যার সৃষ্টি হয়।

ক.৫) স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাতঃ ভারত, বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের ৮০% জুন থেকে অক্টোবর পাঁচ মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বাইরে ও দেশের অভ্যন্তরে স্বল্প সময় এ ধরনের বৃষ্টিপাত হওয়ায় এদেশের নদীগুলো গড়ে ৯৬ কোটি একর ফুট পানি প্রবাহিত হয় (হোসেন ও অন্যান্য ১৯৮৭)। এই অতিরিক্ত প্রবাহ বাংলাদেশের নদীগুলো নিষ্কাশন করতে পারে না। ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়।

খ) ভূ-তাত্ত্বিক কারণাদি

খ.১) ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ঃ বাংলাদেশের নদীগুলোর পানি পলি মাটিতে সমৃদ্ধ। নরম মাটির উপর দিয়ে বয়ে আসা পানি সরন পয়োনালী ক্ষুদ্র স্রোতধারা প্রভৃতি প্রচুর পলি বয়ে এনে নদীর পানি ঘোলা করে তোলা যাতে বর্ষা ঋতুতে নদীগুলোর পানির পরিমাণ বেড়ে যায়। ক্রমাগত পলি সঞ্চয়নের ফলে নদীখাত অনেকাংশে ভরাট হয়ে যায়। পরিনামে বন্যা সংঘটিত হয়।

খ.২ মোহনায় বদ্বীপের সৃষ্টিঃ নদীর মোহনায় পলি জমে বদ্বীপের সৃষ্টি করে, তেমনি বিভিন্ন নদীর পলি সঞ্চিত হয়ে গঠিত বাংলাদেশে একটি বদ্বীপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণে পলি সঞ্চিত হয়ে নতুন বদ্বীপ গড়ে তোলার ফলে উত্তর থেকে আগত বিরাট পানির চাপ এসে পড়ে যা এদেশের নদীগুলোতে যা এদেশের বন্যার অন্যতম কারণ।

খ.৩) নদীখাতে চরের সৃষ্টিঃ প্রতিনিয়ত পলি সঞ্চিত হতে হতে বড় বড় নদীখাতে ছোট বড় বহু ধরনের চরের সৃষ্টি হওয়ায় পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়। ফলে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে না এবং বন্যার সৃষ্টি হয়।

খ.৪) নদীগুলোর স্বল্প নতিমাত্রাঃ যে কোন অঞ্চলের সমভূমিতে নদীগুলোর ঢালের পরিমাণ কম হয়। বাংলাদেশে মৃদু ঢালবিশিষ্ট সমভূমির দেশ। এদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলো প্রতিবর্গ মাইলের ০.৬ ফুট ঢাল বিশিষ্ট। বর্ষায় নদীর অতিরিক্ত পানি দ্রুত সমুদ্রে নিষ্কাশিত হতে পারে না। এ জন্য নদী অববাহিকা অঞ্চলে সহজেই বন্যা দেখা যায়।

ভূ-আলোড়নঃ ভূ-আলোড়নের ফলে অনেক নদীর তলদেশের ক্রমোন্নতি হয়েছে। ১৯৫০ সালে ভূমিকম্পের সময় এরূপ ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছে যমুনাসহ বেশ কয়েকটি নদীর। ফলে নদীর নিষ্কাশন ক্ষমতা আরওহ্রাস পেয়েছে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত না হওয়ায় দেশে বন্যার সৃষ্টি হয়।

ভূ-প্রাকৃতিক কারণ ঃ

প্রধান নদীগুলোতে একই সময়ে সর্বোচ্চ প্রবাহের সৃষ্টিঃ গ্রীষ্মের বরফ গলা পানির চাপ নদীগুলোতে কমার আগেই ভারত থেকে প্রচুর পানি বিভিন্ন নদীর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং একই সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রচুর বৃষ্টিপাত

হয়। ফলে এ দেশের নদীগুলোতে পানির চাপ বেশি থাকে। সাধারণ গঙ্গার পানি যে সময়ে সর্বোচ্চ প্রবাহে পৌছায় তার কিছুদিন পর যমুনার পানি সর্বোচ্চ প্রবাহে পৌছায়। ফলে বন্যার প্রকোপ দেখা যায়।

নিম্ন সমভূমিঃ বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে একটি নিম্নসমভূমি এলাকা। গড় সমুদ্র পৃষ্ঠের তুলনায় দেশের অর্ধেকের বেশি এলাকার উচ্চতা ২৫ ফুটের কম। ফলে যে বছর বেশি বৃষ্টিপাত হয় সে বছর অধিকাংশ নিচু এলাকা থেকে পানি অপসারিত হতে পারে না। ভূমিরূপ যথেষ্ট সমতল হওয়ায় এ পানি চারিদিকে ছড়িয়ে বন্যার সৃষ্টি করে।

ক্রটিপূর্ণ নিষ্কাশন ব্যবস্থাঃ দেশের অধিকাংশ স্থানেই অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। অপরিকল্পিভাবে শহর নগর মহানগর বন্দর শিল্পাঞ্চল তৈরি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করার ফলে দেশের নিষ্কাশন ব্যবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। বর্ষার পানি নেমে যাবার মতো পর্যাপ্ত খাল, শাখা নদী, পয়োনালী না থাকায় পানি এসে সাময়িক বন্যার সৃষ্টি করে।

নিম্নাঞ্চলে বহুল পরিমাণে ভরাটঃ নিম্নাঞ্চলে বহুল পরিমাণে ভরাট হওয়ায় মাদারীপুরের বিল, পাবনার চলনবিল, সিলেটের হাওড়গুলো বড় নদীর অতিরিক্ত পানি সংরক্ষণাগার হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক কারণে পলি সঞ্চিত হয়ে এসব নিচু এলাকা ভরাট হয়ে আসায় এসব নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে বর্ষার পানি বৃদ্ধিতে স্থানীয়ভাবে বন্যা দেখা দেয়।

সামুদ্রিক কারণ

১) জলোচ্ছাসঃ উপকূলবর্তী সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সামুদ্রিক জলোচ্ছাস বন্যার একটি অন্যতম কারণ। জোয়ারের সময় এরূপ জলোচ্ছাসের পানি **১২-১৫** ফুট পর্যন্ত উচ্চ হয়ে উপকূলে আঘাত করে। ফলে উপকূলে সামুদ্রিক বন্যা সৃষ্টি করে।

২. সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বৃদ্ধিঃ বহুকাল যাবৎ অবিরত পলি সঞ্চয়ের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশের গড় উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে জোয়ারের পানি পূর্বের চেয়ে দেশের অনেক ভিতরে প্রবেশ করে নদীর পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা সাময়িকহ্রাস করে এবং বন্যার সৃষ্টি হয়।

সাংস্কৃতিক কারণসমূহ

১. নদীর গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টিঃ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে গিয়ে দেশের বহু জায়গায় নদীর গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে। সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ করার জন্য এসব অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে পানি নিষ্কাশিত হতে না পেরে বন্যার সৃষ্টি করে।

২. বাঁধ ও বেরি বাঁধ তৈরিঃ কৃষি ভূমিতে পানি সেচের প্রয়োজনে গতি পথে বাঁধ তৈরি করা হয়। গঙ্গা নদীর ভারতীয় অংশে ৩৪ টি বেশি বড় আকারের এবং **১৭০** টি মাঝারী আকারের প্রকল্প চালু রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের ভারতীয় অংশে অনুরূপ বহু বাধ নির্মাণ করা হয়েছে। যাহার উপর ফারাক্কা বাধ নির্মাণ শুষ্ক ঋতুতে পানি আটকে রেখে কৃষিক্ষেত্রে পানি সেচ করা হয় আবার বর্ষা মৌসুমে বাধের ফটক খুলে দেয়া হয়। ফলে অনেক সময় অনাকাঙ্খিত বন্যার উদ্ভব হয়ে থাকে।

৩. পানি সংরক্ষণাগারঃ পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের নামে বহুমুখী কৃত্রিম পানি সংরক্ষণাগার তৈরি বন্যা সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী। নদী ব্যবস্থার এসব নিয়ন্ত্রণ কর্মপন্থা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধার সৃষ্টি করে।

৪. বন উৎপাটনঃ ভারত, নেপাল ও ভুটানের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র পার্বত্য এলাকার বহু বনভূমি, শিল্প, গৃহনির্মাণ, জ্বালানী ইত্যাদি কর্মকান্ডের নিমিত্তে পার্বত্য ভূমিতে ব্যাপক বন উৎপাটন শুরুকরণ অর্থাৎ বনভূমি পরিস্কার করে বসতি, চারণভূমি, কৃষিভূমি তৈরি করা হয়েছে। বন নিধন করার ফলে পানির নিচে নেমে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত খাল শাখানদী প্রভৃতি না থাকায় পানি জমে বন্যার সৃষ্টি করে।

মানব সৃষ্ট কারণ

মানব সৃষ্ট কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

নদীর গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টিঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদীগুলো উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি। আর আমাদের সড়ক ও রেলপথগুলো হলো পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি। তাই এই সড়ক ও রেলপথের জন্য নদ-নদীর পানি নিষ্কাশন বাধার সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে রেল ও সড়ক পথের উজান অংশে পানি ফুলে বন্যার সৃষ্টি করে।

বাঁধ ও ভেরি বাঁধ নির্মাণঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদীগুলো ভারত থেকে আগত আর ভারত এসকল নদ-নদীগুলোতে বাঁধ দিয়ে শুষ্ক মৌসুমে পানি আটকিয়ে দিচ্ছে ফলে খরা দেখা দিচ্ছে। আবার বর্ষার সময় পানি ছেড়ে দিচ্ছে ফলে ভূমি প্লাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এই বাঁধ নির্মাণও বন্যার অন্যতম কারণ। গঙ্গ-ব্রহ্মপুত্র এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

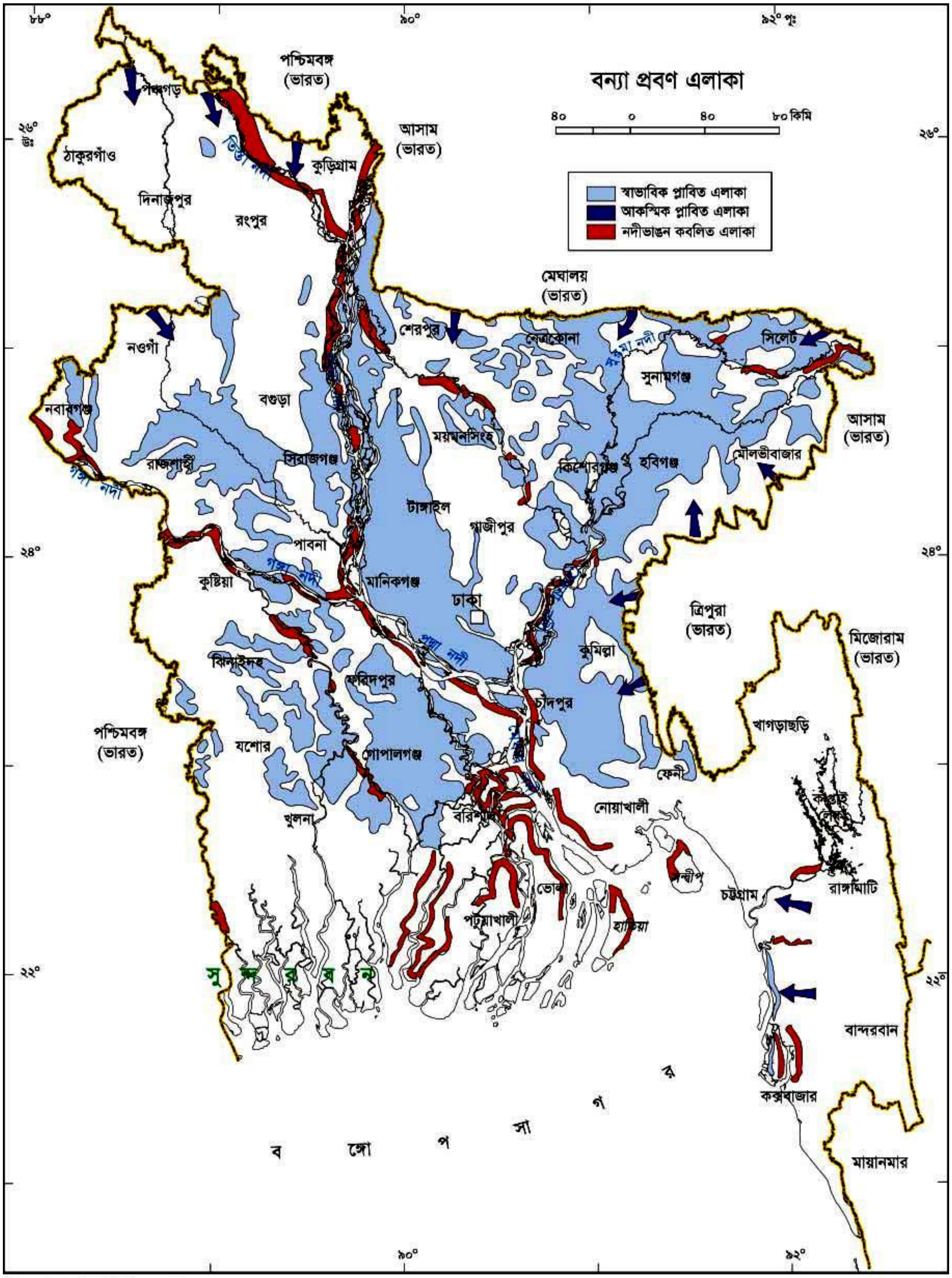

উৎস : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ, জুলাই, ২০০০

চিত্র: ২.৫.১ : বাংলাদেশ, জনসংখ্যার ঘনত্ব ম্যাপ

জলাবদ্ধতা বা পানি সংরক্ষণাগার তৈরিঃ বাংলাদেশের অনেক স্থানে নিম্ন জলাশয় কিংবা নদীখাতে পানি আটকিয়ে পানি সংরক্ষণাগার তৈরি করে বন্যার সৃষ্টি করে। কারণ পানি সংরক্ষণাগার থাকায় পানি সঠিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে না। ফলে বন্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

বৃক্ষকর্তনঃ হিমালয় ও পাহাড়ীয়া অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ কর্তন করে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ ব্যাপকভাবে বৃক্ষ কর্তনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে নদীর দূকুল ভেঙ্গে বন্যার সৃষ্টি করছে। নদীর দুপাড় ভেঙ্গে বন্যা গঠনে সহায়তা করছে।

বন্যার প্রকৃতিঃ বন্যার প্রকৃতি বিভিন্নতা অনুসারে এদেশের বন্যাকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

১. আকষ্মিক বন্যাঃ হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চলে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ী বৃষ্টিজনিত বন্যা প্রধানত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়ে থাকে। এই পানি দ্রুত নেমে এসে বাংলাদেশের পূর্বাংশের ব্যাপক এলাকা প্লাবিত করে। অধিক গতিবেগ সম্পন্ন এলাকায় এ বন্যার স্থিতিকাল খুবই সংক্ষিপ্ত মাত্র ১-৩ দিনের মধ্যে। নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাক্ষনবাড়িয়া, কুমিল্লা জেলার ব্যাপক অঞ্চল, ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশ, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর প্রভৃতি স্থানে আকষ্মিক বন্যা দেখা দেয়।

২. বৃষ্টিপাত জনিত বন্যাঃ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ৩-১০ দিনের স্থানীয় বৃষ্টিপাতের ফলে নিষ্কাশন স্বল্পতার জন্য স্থানীয়ভাবে এক প্রকার বন্যা হয়। বৃষ্টিপ্রবাহ বন্যার পানির প্রধান উৎস। ঝড় বৃষ্টির অবস্থার ভিত্তিতে বাংলাদেশের যে কোন নিম্নাঞ্চলে এ ধরনের বন্যা হতে পারে। তবে রাজশাহী অঞ্চলের যমুনার পশ্চিম পার্শ্বে সংকীর্ন এলাকা, পদ্মা নদীর উত্তরে সংকীর্ন এলাকা এবং বরেন্দ্রভূমির ও উত্তরের পাদদেশীয় অঞ্চল সমগ্র রাজশাহী বিভাগ ও খুলনা বিভাগের মৃতপ্রায় বদ্বীপ অঞ্চল ব্যতীত কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার পশ্চিমাংশ এ ধরনের বন্যা জনিত অঞ্চল।

৩. ঘূর্ণিবার্তা জনিত বন্যাঃ এপ্রিল থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসে স্বল্পকালীন স্থানীয় প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সাথে উপকূল এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে বন্যা হয়। ফলে সুন্দরবন অঞ্চল, পিরোজপুর, মাদারীপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, বরিশাল ও ভোলা জেলার দক্ষিণাংশ এবং চট্টগ্রাম জেলার পশ্চিমাংশে ফসল ও জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়।

৪. প্রধান নদী দ্বারা প্লাবিত বন্যাঃ দেশের তিনটি নদী ব্যবস্থার বিভিন্ন উচ্চতা সম্পন্ন প্লাবনভূমি গুলোতে মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থানীয় বর্ষাকালে নদীর ভিতর উভয় পাশে বন্যা হয়। বাংলাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল বিশেষ করে পদ্মা যমুনা এবং এদের শাখাগুলোর উভয় পাশে এ বন্যা ফসল ও জনমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

বন্যার অপকারিতা

বিংশ শতাব্দীতে ২০ টিরও বেশি বন্যা হয়েছে। এগুলো যথাক্রমে **১৯০০, ১৯০২, ১৯০৭, ১৯১৮, ১৯২২, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৪, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৮,** ২০০০ সালে বন্যা হয়েছে। এসব বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। **১৯৫৪** সালে দেশের প্রায় ২৭% এলাকা, **১৯৭৪** সালে ৩৪%, **১৯৮৮** সালে ৬৮%, **১৯৯৮** সালে ৭২%, **১৯৯৪** সালে ৬৮% এলাকা বন্যা কবলিত ছিল। বন্যা সাধারণত নিম্নলিখিত ক্ষতিসাধন করে থাকে।

১. বন্যায় বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয় আর বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করে।
২. বন্যা কবলিত এলাকায় বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয়।
৩. দেশের পশু সম্পদ ও হাঁসমুরগী প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।
৪. মাঠের উঠতি ফসল ডুবে যায় ফলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শস্য আমদানী করতে হয়।
৫. যাবতীয় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়।
৬. সড়ক পথ, রেল পথ, বিমান বন্দর ডুবে যাতায়াতের প্রচুর ক্ষতি হয়।
৭. সেতু কালভার্ট ধ্বংস হয়।
৮. শিল্প কারখানায় যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়।
৯. যোগাযোগ, যাতায়াত, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়।
১০. নদীখাতে ব্যাপক আকারে ভাঙ্গন শুরু হয়। ফলে বহু লোকের বসত ভিটা ও ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।
১১. টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, যোগাযোগ, ডাক ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হয়।
১২. শহর নগর অঞ্চলে, পয়োনালী ও গ্যাস লাইনের প্রচুর ক্ষতি হয়।
১৩. দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়।
১৪. বন্যার কারণে বহু মানুষ বাস্তভিটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।
১৫. বন্যার ফলে মানুষের পেশা বৃত্তির পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৬. বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয়।
১৭. বিভিন্ন দূর্ঘটনায় বিশেষ করে সাপের কামড়ে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
১৮. বন্যা পীড়িত লোকজন, সরকার, বিভিন্ন এনজিও ও সমাজের সম্পদশালী লোকদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় সমাজের মাস্তানদের শিকারী হয়ে অসম্মানজনক কার্যকলাপে নিযুক্ত হতে দেখা দেয়।
১৯. দেশের রপ্তানী বাণিজ্যে মারাত্মক ব্যাহত হয়।
২০. দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।
২১. উন্নয়নে পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।
২২. ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

বন্যার উপকারিতা

১. বন্যার ফলে মাটিতে দস্তা ও তামাজাতীয় সারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
২. বন্যা বাহিত পানিতে কৃষি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
৩. বন্যার ফলে প্রচুর আবর্জনা ভেসে যায়; যার ফলে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হয়।
৪. মৎস্য সম্পদের বৃদ্ধি পায়।
৫. উন্নয়নের নূতন চিন্তা ধারণার উন্মেষ ঘটে।
৬. সুলভে পরিবহণের ব্যবস্থা হয়।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

যেহেতু বন্যা এদেশে নিয়ত সঙ্গী এবং উপকারের চেয়ে অপকারিতা বেশি বিধায় একে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক যাতে বন্যার ভয়াবহতার মাত্রা হ্রাস পায়। বর্তমানে বাংলাদেশে বন্যাকে ৩টি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, যেমনঃ ১) চিরাচরিত বা কাঠামোগত পদ্ধতি -এ পদ্ধতিতে নদী তীরবর্তী এলাকায় বা নদীর উপরে বাঁধ, লেভী স্লুইস গেট, ডাইক, বন্যা প্রাচীর, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে নদীর প্রবাহ হ্রাসকরণ তথা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ২) অকাঠামোগত পদ্ধতি যাতে বৃহৎ আকারের ও ব্যয় বহুল নির্মাণ কাজের পরিবর্তে এ কাজে সকলকে অবহিত করণ ও সচেতন করে তোলায় বন্যার সঙ্গে বসবাস উপযোগী ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে আর (৩) বর্তমান পদ্ধতি যেটি উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে অর্থাৎ বন্যার সঙ্গে সহবস্থান প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও জনগণকে অন্যত্র স্থানান্তর করণ এবং প্রয়োজনে স্থায়ীভাবে কাঠামো নির্মাণ কর্ম কান্ডকে বুঝানো হয়ে থাকে। এতে সার্বিকভাবে বন্যার ভয়াবহতা ও ব্যাপক ধরনের ধ্বংসলীলার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। এর জন্য সুষ্ঠ নদী ও বন্যা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক।

বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতি

১) বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের ব্যবস্থা আধুনিকরণ অতি বন্যা প্রবণ এলাকায় মাঠ উচু করে বাড়ি ঘর তৈরি করতে হবে। (২) বন্যা প্রবণ এলাকায় সড়ক ও গ্রামের রাস্তাগুলো যথেষ্ট উচু ও প্রশস্ত করে তৈরি করতে হবে। (৩) বন্যা উপদ্রুত এলাকায় বন্যা প্রতিরোধমূলক বড় দালান নির্মাণ করতে হবে। (৪) পর্যাপ্ত পাকা উচু আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। (৫) বন্যা প্রবণ এলাকায় মজবুত সরকারী খাদ্য গুদাম, সরকারী ডিসপেন্সারী ও জরুরী ঔষধ সরবাহ কেন্দ্র স্থাপন, রেডিও টিভিতে জনগণের দ্রুত খবর প্রচার ব্যবস্থা, সতর্কী করণ ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয় সাধন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ভৌগোলিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার সাথে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সামাজিক ও মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে বন্যা ব্যবস্থাপনার ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করণ (৬) বন্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভূমি ব্যবস্থা, বীজ বপন, শষ্যকর্তন প্রভৃতি সময়ের পরিবর্তন, বন্যা প্রবন এলাকায় কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে। (৭) বন্যার পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে সামঞ্জস্য রেখে বোরো, আমন, আউশ ধানের উৎপাদনের ব্যবস্থাকরণ, শীত মৌসুমে রবিশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা, কৃষকদের ঘরবাড়ি, গবাদী পশু খাদ্যশস্য বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সর্বশেষ প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

পাঠসংক্ষেপঃ

বন্যা একটি ভয়াবহ দূর্যোগ যা বাংলাদেশে নিয়ত ঘটনা বলে পরিচিত। ইহা পরিবেশগত অবস্থাসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় রূপে চিহ্নিত। একদিকে যেমন ইহা যাতায়াত ব্যবস্থা, মৎস্যখাত ও মৃত্তিকার উর্বরতা ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তেমনি আবার ইহা মানুষের ক্ষেতের শস্যসহ জানমালের ব্যাপক ধ্বংসলীলয় তৎপর থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২:৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ**

১.১. অতি সম্প্রতি ২০০৪ সালে .... প্রায় .... বন্যার কবলে পড়ে এবং ব্যাপক .... করে।
১.২. সমভূমি .... ও মোহনায় কিছু .... প্রায়ই .... লেগে থাকে।
১.৩. বন্যা হলো .... ক্ষমতার অতিরিক্ত .... যা নদীখাত দিয়ে .... ভূমি বা জনপদকে .... করে।
১.৪. বন্যা সাধারণত .... সমভূমি .... বেশি হয়।
১.৫. গ্রীষ্মের অধিক .... হিমালয় .... প্রচুর ....গলাতে শুরু করে।
১.৬. ২১ শে মার্চ সূর্যের .... অতিক্রমের পর .... দ্রুত উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।
১.৭. ক্রমাগত পলি সঞ্চয়ের ফলে .... অনেকাংশে .... হয়ে যায়।
১.৮. বর্ষার পানি নেমে যাবার মতো পর্যাপ্ত খাল, ... না থাকায় পানি এসে .... সৃষ্টি করে।
১.৯. বন.... করার ফলে পানি নিচে নেমে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত ...., ... প্রভৃতি না থাকায় .... জমে .... সৃষ্টি করে।
১.১০. বন্যা কবলিত এলাকায় ...., ... দেখা যায়।
১.১১. বন্যা বাহিত পানিতে .... ভূমির .... বৃদ্ধি পায়।

২. **সঠিক উত্তরের পার্শ্বে ‘স’ এবং মিথ্যা উত্তরের পার্শ্বে ‘মি’ লিখুন।**

২.১. বাংলাদেশের বড় বড় নদী এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হতে দেখা যায়।
২.২. বাংলাদেশের নদীগুলোর পানি পলি মাটিতে সমৃদ্ধ।
২.৩. দেশের অধিকাংশ স্থানেই অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।
২.৪. বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদীগুলো উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি।
২.৫. হিমালয় ও পাহাড়ীয়া অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ কর্তন করে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে।
২.৬. বন্যার ফলে মাটিতে দস্তা ও তামা জাতীয় সারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুনঃ

১. বন্যার সংজ্ঞা লিখুন এবং এর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশে বন্যার কারণ আলোচনা করুন।
৩. বাংলাদেশে বন্যার সমস্যা ও তার নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের বন্যা সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।
২. বন্যা কত প্রকার? বাংলাদেশে বন্যার কারণ, শ্রেণীবিভাগ ও সমস্যা আলোচনা করুন।

ইউনিট-২

উত্তরমালা

পাঠ-২.১

১.১. উত্তরঃ পর্যাপ্ত, ঢালবিশিষ্ট, ভূমি।
১.২. উত্তরঃ সরোবর, বৃষ্টির, উপেত্তি।
১.৩. উত্তরঃ প্রবাহিত, জলধারা, নদী।
১.৪. উত্তরঃ অঞ্চল ভূ-অভ্যন্তরে, নদী তীর, খাত।
১.৫. উত্তরঃ গতিবেগ, ঢালের।
১.৬. উত্তরঃ দক্ষিণ, মায়ানমার, টেকনাফ, নাফ।
১.৭. উত্তরঃ অধিকাংশ, পাহাড়ীয়া, নদী ব্যবস্থা।
২.১. স, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. স, ২.৫. স,

পাঠ- ২.২

১.১. উত্তরঃ পূর্বদিক, অলকানন্দ, ভাগীরথী, দেবপ্রয়াগ, গঙ্গা।
১.২. উত্তরঃ ঘাঘরা, গন্ডক, কোশী, গঙ্গার।
১.৩. উত্তরঃ ভাগীরথী, কালিনী, হুগলী, বঙ্গোপসাগরে।
১.৪. উত্তরঃ সর্বোচচ, পানি, ৪২০০।
১.৫. উত্তরঃ জীবনযাত্রা, বসতি, পরিবহণ।
১.৬. উত্তরঃ অতিরিক্ত পানি, ছেড়ে।

পাঠ-২.৩

১.১. উত্তরঃ শানপো, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা।
১.২. উত্তরঃ কুড়িগ্রাম, নারায়নপুর, মাঝিয়াল, বাংলাদেশে।
১.৩. উত্তরঃ মিলন, ২৭০০।
১.৪. উত্তরঃ দীর্ঘ, উপনদী, মিলিত।
১.৫. উত্তরঃ বালি, সা⍰^{2}, কনার।
২.১. স, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. স, ২.৫. স, ২.৬. স, ২.৭. স,

পাঠ-২.৪

১.১. উত্তরঃ প্রভাব, প্রপঞ্চ, নদীর।
১.২. উত্তরঃ মাধ্যমিক, ভিন্ন ভিন্ন, নদীগুলো, আন্তর্জাতিক।
১.৩. উত্তরঃ পর্বত, নাগাপাহাড়, মনিপুর।
১.৪. উত্তরঃ আসাম রাজ্যের, কাছাড়, শিলচরের, অমলশিদ।
১.৫. উত্তরঃ মালভূমি, নদী, পানি প্রবাহ, সুরমার।
১.৬. উত্তরঃ কুশিয়ারা, আজমীরিগঞ্জের, মেঘনা, নদী , হাওড়।
১.৭. উত্তরঃ নদীর, পাহাড়ী, জলধারা।
১.৮. উত্তরঃ উপমহাদেশের, বৃষ্টিবহুল অঞ্চল, বৃষ্টিপাতের।
১.৯. উত্তরঃ অপেক্ষা, বড়, প্রশস্ততম।
১.১০. উত্তরঃ সীমান্তবর্তী, মেঘনা, গুরুত্বপূর্ণ।
২.১. স, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. স, ২.৫. স,

পাঠ-২.৫

১.১. উত্তরঃ দেশের, ৭৫ ভাগ, ক্ষতি সাধন।
১.২. উত্তরঃ অঞ্চলে, উজানে, বন্যা।
১.৩. উত্তরঃ ধারণ, পানি প্রবাহ, উপচিয়ে, পার্শ্ববর্তী প্লাবিত।
১.৪. উত্তরঃ প্লাবন, অঞ্চলে।
১.৫. উত্তরঃ উত্তাপে, পর্বত, অঞ্চলে, বরফ।
১.৬. উত্তরঃ নিরক্ষরেখা, উত্তর, গোলার্ধে।
১.৭. উত্তরঃ নদীখাত, ভরাট।
১.৮. উত্তরঃ শাখানদী, পয়োনালী, সাময়িক, বন্যার।
১.৯. উত্তরঃ নিধন, খাল, শাখানদী, পানি, বন্যার।
১.১০. উত্তরঃ বিভিন্ন রোগ ব্যাধি।
১.১১. উত্তরঃ কৃষি, উর্বরতা।
২.১. স, ২.২ ২.৩. স, ২.৪.. স, ২.৫. স

ইউনিট-৩

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সম্পদসমূহ

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সম্পদসমূহ
(Economy & Resources in Bangladesh)

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নদ-নদীর উপর নির্ভরশীল। নদীমাতৃক বাংলাদেশ অসংখ্য নদী এবং এদের উপনদী ও শাখা নদী দ্বারা বিধৌত। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদ-নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরও মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। মৃত্তিকা, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, মৎস্য, বনভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর ও জলাশয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কয়লা, লৌহ, পেট্রোলিয়াম, প্রকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি খনিজ সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্পের গুরুত্বও অপরিসীম। কৃষি একদিকে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য যোগান দেয় আবার অন্যদিকে দেশের শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করে। বর্তমানে শিল্পের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদনে এখনও স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশের একমাত্র শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে অর্থনৈতিকভাবে কাজে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষে দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করতে হবে।
বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সম্পদসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ইউনিটকে নয়টি ভাগে ভাগ করে নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপঃ

- *পাঠঃ ৩.১: বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি*
- *পাঠঃ ৩.২: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শস্যসমূহ*
- *পাঠঃ ৩.৩: কৃষিক্ষেত্রের সমস্যা ও প্রতিকার সমূহ*
- *পাঠঃ ৩.৪: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ*
- *পাঠঃ ৩.৫: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদসমূহ*
- *পাঠঃ ৩.৬: বনজ সম্পদ*
- *পাঠঃ ৩.৭: মৎস্য সম্পদ*
- *পাঠঃ ৩.৮: শিল্প*
- *পাঠঃ ৩.৯: বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও বাণিজ্য*

পাঠ-৩.১

বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি
(Agrarian Economy of Bangladesh)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-
- বাংলাদেশের কৃষির ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে পারবেন; এবং
- কৃষি কিভাবে দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে তা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবেন।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিতে কৃষি অন্যতম বড় খাত। কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৬২.৩ ভাগ কৃষিখাতে নিয়োজিত, (বি. বি এস, লেবার ফোর্স সার্ভে; ১৯৯৯-২০০০)। দেশের মোট রপ্তানিতে কৃষিজাত পণ্যের (কাঁচাপাট, পাটজাতদ্রব্য ও চা সহ) অবদান শতকরা ৫.৭৬ ভাগ (২০০১- ২০০২); উৎসঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী। গুরুত্বের দিক দিয়ে নীটওয়্যার ও তৈরী পোশাক (RMG) রপ্তানীর পরেই কৃষির অবদান। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।১৯৯০ এর দশকের সময়ে বাংলাদেশ কৃষির জন্য এক স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে কৃষিখাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল -০.৬%।

নিম্নের সারনীতে বিগত কয়েক বছরের কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার তুলে ধরা হলোঃ

সারণী: ৩.১.১ : কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হারঃ (শতকরা হারে)

খাত	৯১/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৮/৯৯	৯৯/০০	০০/০১	০১/০২	০২/০৩ সাময়িক
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৪.৫৭	৪.০৮	৪.৯৩	৪.৬২	৫.৩৯	৫.২৩	৪.৮৭	৫.৯৪	৫.২৭	৪.৪২	৫.৩৯
কৃষি	১.৪	-০.৭	-১.৯	২.০	৫.৬	১.৬	৩.২	৬.৯	৫.৫	-০.৬	৩.৬

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৫৪

কৃষির বৃদ্ধির অবস্থা এবং এর প্রয়োগিক দিকঃ
বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন পর্যন্ত ৫% হারে বৃদ্ধি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষি অর্থনীতিবিদদের মন্তব্য অনুসারে বলা যায় যে, অদ্যাবদি আমাদের অর্থনীতি ঐতিহাসিকভাবেই ৪.৬% হারে বৃদ্ধি সাধিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, মাথাপিছু উৎপাদনের হার এখন পর্যন্ত ৩% এর কমে রয়েছে।

নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আলোচনা করা হলোঃ

১. জাতীয় আয়ের প্রধান উৎসঃ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশী আসে কৃষি থেকে। তাই কৃষি দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি এবং জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস।

২. প্রধান পেশাঃ কৃষি বাংলাদেশের জনগনের প্রধান পেশা। কৃষিই বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের কর্মসংস্থান যোগায়। কৃষির উন্নতির উপর আমাদের দেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জনগনের জীবনযাত্রার মান নির্ভরশীল।

৩. খাদ্যের যোগানদারঃ কৃষি দেশের জনগনের খাদ্য যোগায়। বিভিন্ন সমস্যাজনিত কারণে বাংলাদেশ এখনও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি হয়। এ ঘাটতি খাদ্য আমদানি করতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার এক বিরাট অংশ ব্যয় হয়ে যায়।

৪. কৃষি শিল্পের কাঁচামাল যোগায়ঃ বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নও কৃষির উপর নির্ভরশীল। শিল্পকারখানা প্রসারের জন্য যে সমস্ত কাঁচামালের প্রয়োজন হয় তা মূলতঃ কৃষি থেকেই আসে। পাট, চা, চিনি, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামালের উৎস হল কৃষি। সুতরাং দেশের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও কৃষির ভূমিকা প্রধান।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনঃ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যও কৃষির উপর নির্ভরশীল। অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা বাংলাদেশ বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি করে থাকে। সুতরাং কৃষি বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. কৃষির মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নঃ কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পায় এবং তারা অধিক শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করে। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এবং দেশের অভ্যন্তরে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়। ফলে কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে বেকার সমস্যা দূর হয়। তাই দেশের শিল্প উন্নয়ন কৃষির উপর নির্ভরশীল।

৭. সরকারী আয়ের উৎসঃ কৃষি বাংলাদেশ সরকারের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। জমির খাজনা, কৃষিপন্য পরিবহন বাবদ রেল ভাড়া , কৃষিপন্যের রপ্তানি শূল্ক প্রভৃতি বাবদ সরকারের যথেষ্ট আয় হয়।

উপরোল্লেখিত কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। যার ফলস্বরূপ অবদান হিসেবে দেখা যায় যে এটি দেশের যেমন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য যোগান দেয় তেমনি দেশের শিল্পোন্নয়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করে। কৃষি অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হওয়ায় দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কৃষি খাতের উন্নয়নের বিকল্প নেই। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় কৃষিখাতের উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি এবং জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।	পাট, চা, চিনি,বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামালের উৎস হলো কৃষি।	কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।
	কৃষির উপর বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগনের জীবন যাত্রার মান নির্ভশীল।	

পাঠ সংক্ষেপঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি অন্যতম বড় খাত। কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে নীটওয়্যার ও তৈরী পোশাক (RMG) রপ্তানীর পরেই কৃষির অবদান। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে কৃষিখাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছিল -০.৬%।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১.শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ বাংলাদেশ ---- দেশ।
১.২ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ----।
১.৩ ----- দশককে বাংলাদেশের কৃষির স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যয়িত করা হয়।
১.৪ কৃষির উন্নতির উপর ----- জনগনের জীবন যাত্রার মান নির্ভরশীল।
১.৫ বাংলাদেশে প্রতিবছর ------ থেকে ----- লাখ টন খাদ্য ঘাটতি হয়।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি কি?
ক) কৃষি খ) শিল্প
গ) বাণিজ্য ঘ) রপ্তানী

২.২ কোন দশককে বাংলাদেশের কৃষির স্বর্ণযুগ বলা হয়?
ক) ৬০ এর দশক খ) ৭০ এর দশক
গ) ৮০ এর দশক ঘ) ৯০এর দশক

২.৩ প্রতিবছর বাংলাদেশকে কি পরিমাণ খাদ্য আমদানী করতে হয়?
ক) ১০ - ১৫ লাখ টন খ) ১৫ - ২০ লক্ষ টন
খ) ২০ - ২৫ লক্ষ টন ঘ) ২৫ - ৩০ লক্ষ টন

২.৪ নিম্নের কোনটি কৃষিজ দ্রব্য নয়?
ক) পাট খ) চা
গ) তৈরী পোষাক ঘ) তামাক

২.৫ নিম্নের কোনটি কৃষিখাতে সরকারী আয়ের উৎস নয়?
ক) জমির খাজনা খ) তৈরী পোষাক
গ) কৃষিপণ্যের রপ্তানী শুল্ক ঘ) কৃষিপণ্য পরিবহণ বাবদ রেল ভাড়া

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের কত শতাংশ শ্রমশক্তি কৃষিতে জড়িত?
২. দেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান কত শতাংশ?
৩. বাংলাদেশকে প্রতিবছর কি পরিমাণ খাদ্য আমদানী করতে হয়?
৪. কৃষি কিভাবে শিল্পে কাঁচামাল যোগান দেয়?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ-৩.২

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শস্যসমূহ
(Major crops in Bangladesh)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি–

- বাংলাদেশে কি কি ফসল উৎপাদিত হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরণের খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের প্রধান ফসল যথা- ধান, গম, পাট, চা এর উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশের ফসলগুলো বছরের কোন কোন সময়ে উৎপাদিত হয়, সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

বাংলাদেশে নানা ধরণের ফসল উৎপাদিত হয়। এসব ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ক) খাদ্য শস্য খ) অর্থকরী শস্য। খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, বার্লি, ডাল, তেলবীজ প্রভৃতি অন্যতম এবং অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, চা, তামাক, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি প্রধান। ১৯৯৬-৯৭ সালে জি.ডি.পি-তে খাদ্যশস্যের ২৪% অবদান ছিল এবং জি.ডি. পি-তে ৭৩% অবদান ছিল অর্থকরী শস্যের। নিম্নে এদের সম্বন্ধে ধারনা দেয়া হলোঃ

১. খাদ্যশস্য (Food Crops)

ক) ধানঃ বাংলাদেশের খাদ্য শস্যের মধ্যে ধানই প্রধান। অতি প্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশে ধানের চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশে কৃষিজ ফসল ও খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশী। দেশের ৯৯% লোকের প্রধান খাদ্য ভাত হওয়ায় মোট আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৭০% জমিতে ধানের চাষ হয় এবং ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ। ১৯৭০-৭২ থেকে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত ধান উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুন পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যার উল্লেখযোগ্য হিসেবে রয়েছে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির (উফশী) প্রয়োগ।

ধানের শ্রেণী বিভাগ

বাংলাদেশে প্রায় ৫০০ ধরনের ধান দেখা যায়। এদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে ধানের চাষ হয়। চাষের সময় অনুযায়ী ধানকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন- আউশ, আমন এবং বোরো ধান। বর্তমানে বাংলাদেশে ইরি নামে এক প্রকার উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হয়ে থাকে।
নিম্নে এদের বিবরণ দেয়া হলঃ

- **আউশ ধানঃ** সাধারণত উচ্চ ভূমিতে আউশ ধানের চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নীচু চরাঞ্চলের নতুন উর্বর জমিতেও ব্যাপকভাবে এ ধানের চাষ হয়। এসব অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী মাসে ধান চাষ করে মে ও জুন মাসে ধান কাটা হয়। ২০০১-২০০২ সালে এ জাতীয় ধানের একর প্রতি ফলন প্রায় ০.৫৯ টন।
- **আমন ধানঃ** দেশের উৎপাদিত ধানের মধ্যে আমন ধানের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশের নিম্ন জমিতে আমন ধানের চাষ হয় সবচেয়ে বেশী। আমন ধান দু'ধরনের যথা- ১. রোপা আমন ২. বপন আমন। বপন আমনের ধানের বীজ এপ্রিল- মে মাসে বপন করা হয় এবং নভেম্বর - ডিসেম্বর মাসে কাটা হয়। কিন্তু রোপন করা ধানের চাষই আমাদের দেশে অধিক। ২০০১-২০০২ সালে আমন ধানের একর প্রতি ফলন প্রায় ০.৭৭ টন।
- **বোরো ধানঃ** এ শ্রেণীর ধান খাল, বিল ও নদীর তীরবর্তী নিচু উর্বর পলিযুক্ত মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয়। নভেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসের মধ্যে চারা রোপন করা হয় এবং মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে কাটা হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলের পূর্বদিকের বিলসমূহ, সিলেট অঞ্চলে হাওড়, ধলেশ্বরী, মেঘনা, এবং পদ্মা নদীর চর অঞ্চল, গোপালগঞ্জের বিল, রাজশাহীর চলনবিল প্রভৃতি স্থান বোরা চাষের জন্য বিখ্যাত। ২০০১-২০০২ সালে এ ধানের একর প্রতি ফলন প্রায় ১.২৬ টন।
- **ইরি ধানঃ** ইরি ধানের একর প্রতি ফলন প্রায় ৫০ হতে ১০০ মন। চারা রোপন করার মাত্র তিনমাসের মধ্যে ধান কাটা হয়। ইরির ফলন অধিক বলে এর চাষ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নোয়াখালী, প্রভৃতি অঞ্চলে ইরি ধানের চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় বিগত কয়েক বছর ধরে একটি উর্দ্ধমুখি ধারা বিদ্যমান রয়েছে। পরপর কয়েকবছর ধরে ফসলের বাম্পার উৎপাদন হওয়ায় বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরের হিসেব অনুযায়ী, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ২৬০.৫৮ লক্ষ মেট্রিকটন। এর মধ্যে আউশ ১৮.১ লক্ষ মেট্রিকটন, আমন ১০৭.৩ লক্ষ মেট্রিকটন, বোরো ১১৭.৭ লক্ষ মেট্রিকটন ও গম ১৫.১ লক্ষ মেট্রিকটন।

সারণীঃ ৩.২.১ : খাদ্যশস্য উৎপাদন (১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০২-২০০৩ পর্যন্ত) লক্ষ মেট্রিক টন

খাদ্য শস্য	৯২/৯৩	৯৩/৯৪	৯৪/৯৫	৯৫/৯৬	৯৬/৯৭	৯৭/৯৮	৯৯/০০	০০/০১	০১/০২	০২/০৩
আউশ	২০.৭	১৮.৫	১৭.৯	১৬.৮	১৮.৭১	১৮.৭৫	১৭.৩৪	১৯.১৬	১৮.০৮	১৮.৫১
আমন	৯৬.৮	৯৪.২	৮৫.০	৮৭.৯	৯৫.৫২	৮৮.৫০	১০৩.০৬	১১২.৫	১০৭.২৬	১১১.১৫
বোরো	৬৫.৯	৬৭.৭	৬৫.৪	৭২.২	৭৪.৬০	৮১.৩৭	১১০.২৭	১১৯.২১	১২৭.৬৬	১২৪.২৮
মোট ধন	১৮৩.৪	১৮০.৪	১৬৮.৩	১৭৬.৯	১৮৮.৮৩	১৮৮.৬২	২৩০.৬৭	২৫০.৮৭	২৪৩.০০	২৫৩.৯৪
গম	১১.৮	১১.৩	১২.৫	১৩.৭	১৪.৫৪	১৮.০২	১৮.৭০	১৬.৭০	১৬.০৬	১৫.০০
ভূট্টা	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
মোট	১৯৫.২	১৯১.৭	১৮০.৮	১৯০.৬	২০৩.৩৭	২০৬.৬৪	২৪৯.০৭	২৬৯.০৬	২৬০.৫৮	২৭০.৯৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৩।

ধান উৎপাদন ও উৎপাদনকারী অঞ্চলঃ

বাংলাদেশের আবাদী জমির প্রায় ৭০% ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয়ে থাকে। এদেশের মাটি ও জলবায়ু ধান চাষের বিশেষ উপকারী হওয়ায় এর প্রায় সর্বত্রই ধানের চাষ হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ ৪০ হাজার টন ধান উৎপাদন হয় এবং ২০০০-২০০১ সালে এই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ৫০ লাখ ৮৭ হাজার টনে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের সকল জেলায় ধান উৎপাদিত হলেও সবচেয়ে বেশী ধান উৎপন্ন হয় বৃহত্তর রংপুর, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, বগুড়া, দিনাজপুর, ঢাকা ও নোয়াখালী অঞ্চলে। তন্মোধ্যে আউশ ধানের উৎপাদনে বৃহত্তর যশোর প্রথম, সিলেট দ্বিতীয় এবং কুমিল্লা তৃতীয়। আমন ধান উৎপাদনে বৃহত্তর রংপুর প্রথম, দিনাজপুর দ্বিতীয়, এবং রাজশাহী তৃতীয়। আবার বোরো ধান উৎপাদনে বৃহত্তর কুমিল্লা প্রথম, কিশোরগঞ্জ দ্বিতীয় এবং ঢাকা তৃতীয়। এছাড়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধান হিসেবে বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলের বালাম, দিনাজপুর অঞ্চলের কাটারীভোগ, ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিরই ধান এবং নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলের কালিজিরা ইত্যাদি ধান খুবই প্রসিদ্ধ।

গমঃ

বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের পরেই গমের স্থান। গম নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের ফসল। এ গম উৎপাদনের জন্য মাঝারি ধরণের তাপ ও সামান্য বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। এ কারণে বাংলাদেশে শীতকালে গমের চাষ করা হয়। এটি এখন বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

গমের উৎপাদন ও উৎপাদনকারী অঞ্চলঃ

বর্তমানে খাদ্যশস্যের অভাবহেতু বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই গমের চাষ হয়। তবে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে গম চাষ বেশি প্রসার লাভ করেছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে বাংলাদেশে ১১ লাখ ৩০ হাজার টন গম উৎপন্ন হয়। এই উৎপাদন ২০০০-২০০১ সালে ১৬ লাখ ৭০ হাজার টনে এসে দাঁড়ায়। বর্তমানে দিনাজপুর, পাবনা, রংপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, যশোর, ফরিদপুর ,ঢাকা, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অধিকাংশ গম উৎপন্ন হয়। তবে এদের মধ্যে দিনাজপুর অঞ্চল প্রথম, পাবনা দ্বিতীয়, রংপুর তৃতীয় এবং রাজশাহী চতুর্থ। বর্তমানে রাজশাহী বিভাগে অধিক গম উৎপন্ন হয়। এরপরে ঢাকা বিভাগের স্থান। রাজশাহী বিভাগে দেশের প্রায় ৫২% ভাগ, ঢাকা বিভাগে প্রায় ২৪% ভাগ এবং খুলনা বিভাগে ১৫% ভাগ গম উৎপন্ন হয়। তবে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে গমের চাষ অতি নগন্য।

অন্যান্য খাদ্যশস্যঃ

১. **বার্লি বা যব (Barley)ঃ**
বার্লি গম জাতীয় খাদ্য। এ থেকে আটা প্রস্তুত হয়। দেশে উৎপাদিত বার্লির পরিমান অতি নগন্য। স্বল্প বৃষ্টিপাত এবং সামান্য উর্বর জমিতে যবের চাষ হয়।

২. ভূট্টা (Maize) ঃ

ভূট্টা মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। ভূট্টা চাষের জন্য ১০০ সে:মি থেকে ১৫০ সে:মি বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন এবং ১০০ সে: থেকে ২২০ সে: উত্তাপ প্রয়োজন। এ জন্য বাংলাদেশে ভূট্টার চাষ খুবই কম। এ দেশের রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে কিছু ভূট্টা জন্মে।

৩. ডাল (Pulses) ঃ

বাংলাদেশে ডাল জাতীয় শস্যের মধ্যে মসুর, ছোলা, মটর, মুগ, মাষ কলাই, খেসারি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এগুলো রবিশস্যের অন্তর্গত এবং দোঁ-আশ মাটিতে ভাল জন্মে। বাংলাদেশে প্রায় ১৭ লাখ ১০ হাজার একর জমিতে বিভিন্ন ধরণের ডালের চাষ হয়। বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৬ লাখ ৩০ হাজার টন। বালি মিশ্রিত দো-আঁশ মৃত্তিকায় ডালের চাষ ভাল হয় বলে বাংলাদেশের চর অঞ্চলগুলো ডাল চাষের জন্য বিখ্যাত।

৪. তৈলবীজ (Oil Seeds)ঃ

বাংলাদেশে উৎপন্ন তেল বীজের মধ্যে তিল, সরিষা, বাদাম, তিসি, রেড়ি প্রভৃতি প্রধান। এদের মধ্যে সরিষা, তিল, চিনাবাদাম প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বালিযুক্ত দো-আঁশ মৃত্তিকায় তিলও তিসির চাষ ভাল হয়। ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচুর তৈলবীজ জন্মে। ১৯৯৩-৯৪ সালে প্রায় ১৩ লাখ ১০ হাজার একর জমিতে প্রায় ৬ লাখ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। তেল উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ন নয়। বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার টন ভোজ্য তেলের প্রয়োজন। এর মধ্যে সরিষা ও অন্যান্য তেলবীজ থেকে ৬০ হাজার টনের মতো ভোজ্য তেল পাওয়া যায়। বর্তমানে আমিষ ও ভোজ্য তেলের ঘাট্তি পূরণের জন্য রবি মৌসুমে অপেক্ষাকৃত নিম্নঅঞ্চলে সয়াবিনের চাষ করা হয়।

৫. মসলা (Spices) ঃ

বাংলাদেশে উৎপাদিত মসলার মধ্যে মরিচ, হলুদ, পিঁয়াজ, রসুন, ধনে, জিরা, তেজপাতা ও আদা প্রভৃতি প্রধান। আমাদের দেশের মাটি ও জলবায়ু নানা জাতীয় মসলা চাষের পক্ষে অনুকূল। ফলে দেশেই অনেক মসলা জাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়। তবে এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গঁ প্রভৃতি বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

অর্থকরী শস্য/ ফসলঃ

যেসকল ফসল সরাসরি বিক্রির উদ্দেশ্য চাষ করা হয় তাদের অর্থকরী ফসল বলা হয়। বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল গুলোর মধ্যে পাট, চা, ইক্ষু, তামাক, নানা রকমের তেলবীজ, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া, তুলা, রাবার প্রভৃতি প্রধান। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হবার কারণে বিভিন্ন ধরনের ফসলের মধ্যে অর্থকরী ফসলের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পের কাঁচামাল অর্থকরী ফসলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- পাট, চিনি, রেশম প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল আমাদের অর্থকরী ফসল থেকে আসে। পাট, চা প্রভৃতি অর্থকরী ফসলই বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। এসব ফসল রপ্তানি করে বাংলাদেশ বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমাদানি করে থাকে।

পাট (Jute)ঃ

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী বা বাণিজ্যিক ফসল। যা বাংলাদেশের স্বর্ণতন্তু হিসেবে সুপরিচিত। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমানে এদেশে পৃথিবীর মাত্র ২৬% পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু পাট জন্মে। তন্মধ্যে রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, জামালপুর ,টাঙ্গাইল, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে বেশী পাট উৎপন্ন হয়। বর্তমানে পাট উৎপাদনে সাবেক রংপুর অঞ্চল প্রথম, ফরিদপুর অঞ্চল দ্বিতীয়, যশোর অঞ্চল তৃতীয় এবং কুষ্টিয়া অঞ্চল চতুর্থ। তবে পাবত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালী অঞ্চলে পাটের চাষ নেই বললেই চলে।

চা (Tea)ঃ

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে চা অন্যতম। বর্তমানে এটি দেশের ২য় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল। দেশে উৎপাদিত চা এর প্রায় ৭০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে একাদশ

স্থানের অধিকারী। সাবেক সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলায় চা এর চাষ হচ্ছে। তবে, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলার পাহাড়িয়া অঞ্চলে দেশের প্রায় ৯০% ভাগ চা উৎপন্ন হয়। চা বাংলাদেশের ২য় প্রধান রপ্তানি যোগ্য ফসল। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম চা রপ্তানীকারক দেশ। যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের চা এর প্রধান ক্রেতা। এছাড়া জাপান, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশও বাংলাদেশ হতে চা আমাদানী করে থাকে।

তামাক (Tobacco)ঃ

বাংলাদেশে কিছু তামাক উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার একর জমিতে বার্ষিক প্রায় ৪০ হাজার টন তামাক উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই কিছুনা কিছু তামাকের চাষ হয়। এদের মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চল তামাক চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। বর্তমানে যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলেও তামাক চাষ প্রসার লাভ করেছে।

অন্যান্য অর্থকরী ফসলঃ

অন্যান্য অর্থকরী শস্যের মধ্যে রেশম, রাবার, বার্লি, সুপারি, আলু, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান।

রেশমঃ

রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২০ হাজার একর জমিতে তুঁত গাছের চাষ করা হয়। বার্ষিক রেশম উৎপাদনের পরিমান প্রায় ৪০ হাজার টন। এছাড়াও বগুড়া, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলেও তুঁত গাছ থেকে রেশম সুতা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

পানঃ

পান বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই পানের চাষ হয়ে থাকে। এ দেশের সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালি, রাজশাহী, নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলে পানের চাষ বেশী হয়। বাংলাদেশে বার্ষিক সর্বমোট প্রায় ৩৩ হাজার একর জমিতে ৬৫ হাজার টন পান উৎপাদিত হয়।

আলুঃ

বাংলাদেশে গোল ও মিষ্টি উভয় প্রকার আলুই জন্মে। ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আলু চাষ হয়। আলু খাদ্য শস্যের অর্ন্তভূক্ত হলেও আলুকে অর্থকরী ফসল বলা চলে। কারন এটি বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষ করা হয়।

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট ও চা প্রধান।	বাংলাদেশে নানা ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়।
বাংলাদেশের খাদ্য শস্যের মধ্যে ধানই প্রধান	বাংলাদেশে কৃষিজ ফসল ও খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশী।

সুপারি ও নারকেলঃ

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সুপারি ও নারকেল জন্মে। তবে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী , কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় এদের চাষ বেশী হয়ে থাকে।

পাঠ সংক্ষেপঃ

বাংলাদেশে নানা ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের ফসলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. খাদ্যশস্য ও ২. অর্থকরী শস্য। খাদ্য শস্যের মধ্যে ধান, গম, বার্লি, ডাল, তৈলবীজ প্রভৃতি অন্যতম এবং অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, চা, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি প্রধান। বাংলাদেশের কৃষিজ ফসল ও খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশী। চাষের সময় অনুযায়ী ধানকে প্রধানত ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন - আউশ, আমন ও বোরো ধান। সাধারণত উচ্চভূমিতে আউশ ধানের চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের নীচু জমিতে আমন ধানের চাষ হয় সবচেয়ে বেশী। বোরো ধান খাল, বিল ও নদীর তীরবর্তী নীচু উর্বর পলিযুক্ত মৃত্তিকায় উৎপন্ন হয়। যেসকল ফসল সরাসরি বিক্রির উদ্দেশ্যে চাষ করা হয় তাদের অর্থকরী ফসল বলা হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পের কাঁচামাল অর্থকরী ফসলের অন্তর্ভূক্ত। পাট, চা প্রভৃতি অর্থকরী ফসলই বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১.শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ বাংলাদেশের ফসলকে ------------- এবং ------------- ফসল হিসেবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১.২ ধান একটি ------------ফসল এবং পাট একটি ------------- ফসল।

১.৩ বাংলাদেশের মোট আবাদী জমির প্রায় ----------- শতাংশ জমিতে ধান চাষ করা হয়।

১.৪ ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে -------------।

১.৫ বাংলাদেশে প্রায় ---------- ধরণের ধান দেখা যায়।

১.৬ দিনাজপুর অঞ্চলের ------------- ধান খুবই প্রসিদ্ধ।

১.৭ পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ হলো ---------------।

১.৮ চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে --------------- স্থানের অধিকারী।

১.৯ আলুকে অর্থকরী ফসলও বলা হয় কারণ এটি ----------------উদ্দেশ্যে চাষ করা হয়।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের ফসলকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে?

ক) ১ খ) ২

গ)৩ ঘ) ৪

২.২ গম কি ধরনের ফসল?

ক) খাদ্যশস্য খ) অর্থকরী ফসল

গ) রবিশস্য ঘ) কোনটিই নয়

২.৩ বাংলাদেশে কত ধরণের ধান উৎপাদিত হয়?

ক) ২০০ খ) ৩০০

গ) ৪০০ ঘ) ৫০০

২.৪ দেশের উৎপাদিত ধানের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশী হয়?

ক) আউশ খ) আমন

গ) বোরো ঘ) ইরি

২.৫ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পাট উৎপাদিত হয় কোথায়?

ক) বাংলাদেশ খ) ভারত

গ) নেপাল ঘ) থাইল্যন্ড

২.৬ সরিষা কোন ধরণের ফসল?

ক) অর্থকরী জাতীয় খ) তৈলবীজ জাতীয়

গ) ডাল জাতীয় ঘ) সব্জী জাতীয়

২.৭ বাংলাদেশের নিম্নলিখিত কোন জায়গায় চা চাষ হয় না?

ক) চট্টগ্রাম খ) পার্বত্য - চট্টগ্রাম

গ) ফরিদপুর ঘ) সিলেট

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের ফসলকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কি কি?

২. ডাল এবং তামাক কোন ধরণের ফসল?

৩. গম উৎপাদনের জন্য কোন ধরনের জলবায়ু প্রয়োজন?

৪. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থকরী ফসল সমূহ কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শস্য সমূহ কি কি? জাতীয় উন্নয়নে অর্থকরী ফসলসমূহের অবদান সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ-৩.৩

কৃষি ক্ষেত্রের সমস্যা ও প্রতিকার সমূহ
(Problems and Remedies in Agri Sector)

এই অংশটুক পাঠ করে আপনি-

- বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য সমূহ সম্পর্কে বুঝতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষির উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের কৃষিতে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ধারনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো কিভাবে প্রতিকার করা যায় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বাংলাদেশ প্রধানত কৃষি প্রধান দেশ। দেশের কৃষিকাজ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। বাংলাদেশের কৃষির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো - কৃষিক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ, স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা অধিক ইত্যাদি। নিম্নে দেশের কৃষির সমস্যা সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো:

ভূমির উর্বরতা হ্রাসঃ

বাংলাদেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলেই একই জমিতে বহুদিন ধরে চাষাবাদ করার ফলে মৃত্তিকার উৎপাদন শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। উর্বরাশক্তি হ্রাস পাওয়া সত্বেও এর উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কোনরূপ চেষ্টাই করা হয়নি। জমির প্রাকৃতিক উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাবার ফলেই দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

পুরাতন পদ্ধতির কৃষি ব্যবস্থাঃ

বাংলাদেশে এখনও সনাতন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করা হয়ে থাকে। অজ্ঞতার কারণে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও তাদের চাষাবাদ লাঙ্গল জোয়ালের মাধ্যমে সম্পাদন হয়ে থাকে। এমনকি তারা সঠিক মাত্রায় রাসায়নিক সারের প্রয়োগও জানেনা। এ পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করার ফলে ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। আমাদের কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদের সাথে তেমনভাবে পরিচিতি ঘটেনি। ফলে জমিতে আশানুরূপ ফসল জন্মে না।

জমির বহুবিভাগঃ

বাংলাদেশের কৃষিকাজে জমির খন্ডবিখন্ডতা একটি মারাত্মক সমস্যা। তদুপরি, উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী কৃষি জোতগুলো দিন দিন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। ফলে চাষাবাদে বহুবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এ সমস্ত জমিতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা অসম্ভব।

জলবায়ুর উপর নির্ভরশীলতাঃ

বাংলাদেশের কৃষি কার্যের বেশীরভাগই জলবায়ুর স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল। কৃষি কার্যের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা অনস্বিকার্য। বৃষ্টিপাত পানির চাহিদা পূরণ করে থাকে। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সময়মত প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হলে ফসল ভাল হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মৌসুমী বায়ুর তারতম্যের কারণে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হয়, যা কৃষিকার্যের অন্যতম বাধা। এজন্য বাংলাদেশের কৃষিকে মৌসুমী বায়ুর জুয়াখেলা বলা হয়।

ভাল বীজ ও সারের অভাবঃ

বাংলাদেশে কৃষিকার্যের অন্যতম সমস্যা হলো ভাল বীজ ও সারের অভাব। অধিক ফসল জন্মাতে ভাল বীজ ও সারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে উন্নতমানের ভাল জাতের বীজ এবং রাসায়নিক সারের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তদুপরি অর্থের অভাবে কৃষকগণ ভাল বীজ ও সার ক্রয় করতে পারে না। ফলে এদেশে জমির ফসল খুবই কম।

সেচ ব্যবস্থার অভাবঃ

সেচ ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল হওয়ার কারণে কৃষকদের পানির জন্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করতে হয়। সময় মতো বৃষ্টিপাত না হলে দেশে ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে শীতকাল প্রায় বৃষ্টিহীন থাকে। এজন্য রবি ফসলের ফলনও কম হয়। বাংলাদেশে প্রয়োজন অনুযায়ী পানিসেচ ব্যবস্থার দারুন অভাব রয়েছে। এটি কৃষি সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য কারণও বটে।

মূলধনের অভাবঃ

বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম সমস্যা হলো মূলধনের অভাব। এর জন্য গরীব কৃষকগণ ভূমিতে অধিক পরিমান মূলধন খাটিয়ে উৎপাদন বাড়াতে পারে না। উন্নত ধরনের বীজ, সার এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করার মতো সামর্থ্য তাদের না থাকায় সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে না।

পঙ্গপাল ও শস্যের রোগ সমূহ:

বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গের আক্রমনে আমাদের দেশে প্রতি বছর যথেষ্ট ফসল নষ্ট হয়। অজ্ঞতার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করার প্রবণতা কৃষকদের মধ্যে খুবই কম। অজ্ঞতার কারণে কৃষকরা সঠিক পরিমাণে জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করেন না।

মৃত্তিকা ক্ষয়:

ভুমি ক্ষয় ও কৃষিকার্যের এক বিরাট সমস্যা। প্রতি বছর নদীস্রোতের দ্বারা বাংলাদেশের বহু মূল্যবান আবাদি জমি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

জমির লবনাক্ততা:

কৃষিতে লবনাক্ততা সমস্যা দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রায়ই দেখা যায়। এই লবনাক্ততা বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে কৃষির অন্তরায়।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ:

বাংলাদেশের কৃষির আর একটি অন্যতম সমস্যা হলো বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কারণ বন্যা, ঘূর্নিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির ফলে বছরে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়।

গবাদি পশুর অভাব:

পশু শক্তিই বাংলাদেশের কৃষির মূল ভিত্তি। কিন্তু বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় পশুর খুবই অভাব। আবার যা রয়েছে তার বেশীরভাগই দূর্বল প্রকৃতির, এর ফলে কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয়।

ভূমিহীনতা:

বাংলাদেশে কৃষিকার্যে নিয়োজিত প্রায় অর্ধেক লোকের কোনো নিজস্ব জমি নেই। তারা সকলে দিন মজুর হিসেবে কাজ করে। জমির মালিক না হওয়ায় এরা কৃষির উন্নতির জন্য সঠিক মাত্রায় পরিশ্রম করতে চায় না। আর ফলস্বরূপ জমিতে ফলন কম হয়ে থাকে।

শিক্ষার অভাব:

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক অশিক্ষিত। কৃষি বিষয়ক শিক্ষা না থাকায় সরকারী প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কৃষির আধুনিকায়ন বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

ত্রুটিপূর্ণ বাজার:

বাজার ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য বাংলাদেশের কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। দালাল, আড়তদার প্রভৃতি যারা এ ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছে তারা ফসলের মূল্যের এক বিরাট অংশ ভোগ করে এবং কৃষকরা তাদের ন্যায্য হিস্যা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলে কৃষকদের অবস্থার তথা কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন হয় না।

অন্যান্য সমস্যা:

কৃষির অন্যান্য সমস্যার মধ্যে স্বত্ব আইনের জটিলতা, অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, পন্যাগারের অভাব প্রভৃতি প্রধান।

কৃষি সমস্যার প্রতিকার: (Remedies of Agricultural Problems)

বাংলাদেশর সমস্যা সংকুল কৃষির সঠিক প্রতিকার সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। কৃষির বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকারের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি সাধন করা সম্ভব। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বনের মাধ্যমে সঠিকভাবে কৃষি সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে:

ভূমি একত্রীভূতকরণ:

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত জমিগুলো একত্রিত করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব। তাই প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের মাধ্যমে অথবা স্বেচ্ছাকৃতভাবে জমি একত্রীভূতকরণ করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক চাষপদ্ধতি:

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু হলে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব। তাই প্রাচীন পদ্ধতি পরিহার করে যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থা:

বর্তমানে কৃষিকাজ অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা একান্ত প্রয়োজন।

কৃষিঋনের ব্যবস্থা:
সমবায় ঋনদান সমিতি ও কৃষি ব্যাংকের শাখা গ্রামে গ্রামে স্থাপন করে কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ঋন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা:
দেশে যথেষ্ট সংখ্যক কৃষিবিদ্যালয় , কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে কৃষকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা কার্যক্রম যাতে সামগ্রিক অর্থে কৃষির ক্ষেত্রে সঠিক উন্নতি বয়ে আনতে পারে তার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বীজ ও সার প্রয়োগ:
একমাত্র ভাল বীজ ও সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ থেকে ২৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব । তাই কৃষকদেরকে ভাল বীজ ও সার সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

কীটনাশক সরবরাহ ও বালাই ব্যবস্থাপনা :
পোকা-মাকড়ের আক্রমনে প্রতি বছর প্রচুর ফসল নষ্ট হয়। ফসলকে পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় কীটনাশক সরবরাহ করতে হবে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে শস্য নষ্টকারী কীটসমূহকে প্রতিরোধ করা যায়।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ নিরোধ:
বন্যা, ঘূর্নিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হবে। কৃষির উন্নতির জন্য সরকারকে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান অবশ্যই করতে হবে। এ ছাড়াও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বেড়ীবাঁধ নির্মান করে সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের হাত থেকে সেখানকার ফসলকে রক্ষা করতে হবে।

পানি নিষ্কাশন:
শীতকালে দেশের হাওড়-বাঁওড় ও বিল-ডোবা ইত্যাদিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে ব্যাপকভাবে বোরো ও ইরি ধানের চাষ করতে হবে।

বাজারের সুবন্দোব্যস্ত নিশ্চিত করা:
কৃষকগনের ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য বাজার ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করতে হবে। এ ছাড়া দেশের সর্বত্র একই ওজন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত।

আদর্শ খামারের ব্যবস্থা করা:
কৃষকদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য গ্রামে গ্রামে আদর্শ খামার স্থাপন করা উচিত। এ সমস্ত খামারে কিরূপে অধিক ফসল ফলায় তা দেখে গ্রামের কৃষকগণ শিক্ষা লাভ করতে পারবে। যা সামগ্রিকভাবে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।
উপরোল্লেখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহন করা হলে বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হবে। এই সফলতার উপর নির্ভর করে দেশের সামগ্রিক কৃষির উন্নতি।

বাংলাদেশের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা অধিক।	বাংলাদেশের কৃষির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদ।
বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।	বাংলাদেশের কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল।

পাঠ সংক্ষেপঃ

বাংলাদেশের একর প্রতি ফসল উৎপাদন খুবই কম। বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা অধিক। এদেশের কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। এদেশের কৃষিকার্যে জমির খন্ড-বিখন্ডতা একটি মারাত্মক সমস্যা। মৌসুমি বায়ুর তারতম্যের কারণে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত আমাদের দেশের কৃষির অন্যতম প্রধান বাঁধা। বাংলাদেশের কৃষিকে "মৌসুমি বায়ুর জুয়াখেলা" বলা হয়। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে শস্য নষ্টকারী কীটসমূহকে প্রতিরোধ করা যায়। বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

১. শূন্যস্থান পূরন করুনঃ

১.১ জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাবার ফলে দেশের ------ উৎপাদন কমে যাচ্ছে।
১.২ বাংলাদেশের কৃষিকাজে জমির ------ একটি মারত্মক সমস্যা।
১.৩ বাংলাদেশের কৃষি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ------ উপর নির্ভরশীল।
১.৪ দেশের কৃষিতে শীতকালে ------ ব্যবস্থার দারুণ অভাব রয়েছে।
১.৫ কৃষিতে লবনাক্ততার সমস্যা দেশের ------- অঞ্চলে দেখা যায়।
১.৬ একমাত্র ------- ও------ প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের কৃষি জমিতে একর প্রতি ফসলের উৎপাদন কেমন?
ক) খুব বেশী খ) বেশী
গ) মাঝারী ঘ) খুবই কম

২.২ বাংলাদেশের কৃষি জমিতে প্রাকৃতিক উর্বরা শক্তি কেমন?
ক) হ্রাস পাচ্ছে খ) বৃদ্ধি পাচ্ছে
গ) অপরিবর্তিত আছে ঘ) এর কোনটিই নয়

২.৩ বাংলাদেশের কৃষিকে মৌসুমি বায়ুর জুয়া খেলা বলা হয় কেন?
ক) বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরতা খ) তাপমাত্রার উপর নির্ভরতা
গ) বায়ুর উপর নির্ভরতা ঘ) আর্দ্রতার উপর নির্ভরতা

২.৪ দেশের কৃষিতে লবনাক্ততা সমস্যা কোন অঞ্চলে দেখা যায়?
ক) নদী তীরবর্তী এলাকায় খ) পাহাড়ী এলাকায়
গ) সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ঘ) সোপান এলাকায়

২.৫ ভাল বীজ ও সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উৎপাদন শতকরা কতভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব?
ক) ১০ থেকে ১৫ ভাগ খ) ১৫ থেকে ২৫ ভাগ
গ) ২৫ থেকে ৩৫ ভাগ ঘ) ৪০ থেকে ৫০ ভাগ

২.৬ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কি?
ক) ক্ষতিকর কীট প্রতিরোধক ব্যবস্থা খ) উপকারী কীট প্রতিরোধক ব্যবস্থা
গ) ভাল বীজ সরবরাহ ঘ) ভালমানের সার সরবরাহ

২.৭ পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কোন ফসল ব্যাপক উৎপাদন সম্ভব?
ক) আউস ধান খ) আমন ধান
গ) বোরো ধান ঘ) কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের কৃষি জমি গুলোর উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে কেন?
২. বাংলাদেশের কৃষিকে মৌসুমী বায়ুর জুয়াখেলা বলা হয় কেন?
৩. বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় কৃষিতে লবনাক্ততা সমস্যা দেখা যাচ্ছে?
৪. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কি?
৫. পানি নিষ্কাশনের কারণে কোন কোন ফসল উৎপাদন সম্ভব ?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের কৃষিতে যেসব সমস্যা রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক এইসব সমস্যা কিভাবে সমাধান বা প্রতিকার করা যায় তা সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ-৩.৪

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

(Natural Resources of Bangladesh)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- ◆ বাংলাদেশে কি কি প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ রয়েছে তা সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- ◆ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে সহজ কথায় প্রাকৃতিক সম্পদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির দান। এই সৃষ্টিতে মানুষ হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রাকৃতিক সম্পদের সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকা, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, মৎস্য, বনভূমি, পাহাড় পর্বত, নদ-নদী, সাগর-হ্রদ ও জলাশয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। এ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। নিম্নে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ ও তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মৃত্তিকাঃ

মৃত্তিকা প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। মৃত্তিকার উর্বরা শক্তির উপর কৃষির উন্নতি সম্পুর্ণ নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মৃত্তিকা উর্বর বলে এখানে প্রচুর পরিমাণে নানা ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়। এটেল, দোঁআশ, কাদা, বালি মাটি প্রভৃতি নানা ধরনের ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে। কৃষিজাত দ্রব্য দেশের জনগনের খাদ্যের সংস্থান এবং শিল্পের সহায়তা করে।

জলবায়ুঃ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাত, তাপ ইত্যাদি জলবায়ুর প্রধান নিয়ামক। তাই প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার উপর কৃষি কাজ সম্পূর্ণ রূপে নির্ভরশীল। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। জলবায়ুও প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ। তাই জলবায়ুর উপর দেশের কৃষি তথা সামগ্রিক উন্নতি নির্ভশীল।

খনিজ সম্পদঃ

স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয় বলে খনিজ সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। ভারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রচুর খনিজ সম্পদের প্রয়োজন। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতির যন্ত্রপাতিও ভারী শিল্প সরবরাহ করে থাকে। অতএব ভারী শিল্পের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই খনিজ সম্পদের ওপর ভারী শিল্প নির্ভর করে বিধায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে খনিজ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সঞ্চিত খনিজ সম্পদগুলো হলো- কয়লা, খনিজ তেল, চুনাপাথর, চীনামাটি, তামা, কঠিন শিলা, সিলিকাবালি, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি। তাই সর্বপরি খনিজ সম্পদের সঠিক সদ্ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

মৎস্য সম্পদঃ

মৎস্যও প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্গত। নদী মাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল এবং সমুদ্রে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। মাছ বাঙ্গালীদের প্রিয় খাদ্য। প্রচুর প্রোটিন থাকে এ সকল মৎস্যে। আবার মৎস্য রপ্তানীকরে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। আবার এই মৎস্য থেকে মৎস্য তেল, সার, সিরিশ ইত্যাদি তৈরী হয়। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি পূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৪২৪৮২ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তানি করে ১৬৭৩.১৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

বনজ সম্পদঃ

বনজ সম্পদও প্রাকৃতিক সম্পদ। বন হতেই শিল্পের নানা প্রকার কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের কাগজ, রেশম, দিয়াশলাই প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল বনভূমি থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া বন দেশের বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রন

করে এবং বন্যা ও ঝড়ের তীব্রতা আংশিক রোধ করে। গাছের ঝরাপাতা ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। দেশের বনজসম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে।

পাহাড়-পর্বতঃ

পাহাড়-পর্বতও প্রাকৃতিক সম্পদরূপে গন্য হয়। কারণ পাহাড়-পর্বতের প্রভাবে দেশে বৃষ্টিপাত হয় এবং নানা ধরনের ফসল জন্মে। এছাড়া পাহাড় -পর্বতে বহু মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে এবং এদের ঢালু ভূমি চা, রাবার ও আনারস চাষের জন্যে আদর্শ স্থান। তাই পাহাড় -পর্বত প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সর্বপরি পাহাড়-পর্বতকে ব্যাপকভাবে উজার হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব।

নদ-নদী, জলাশয় ও সমুদ্রঃ

নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, সমুদ্র প্রভৃতিও প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্গত। নদ-নদীর পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের কৃষিকার্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো মৎস্য সম্পদের উৎস। বাংলাদেশের নদীগুলো অভ্যন্তরীন যোগাযোগ ও পরিবহনের প্রধান উপায় হিসাবে কাজ করে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে নদ-নদী, জলাশয়, সমুদ্র ইত্যাদি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সর্বপরি নদ-নদী, জলাশয়, সমুদ্রকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও সদ্ব্যবহার করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভরশীল।	প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির দান।	বন দেশের বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করে।

পাঠ সংক্ষেপঃ

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। মৃত্তিকা, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, মৎস্য, বনভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-হ্রদ, জলাশয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি এবং প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার উপর কৃষির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। ভারী শিল্পের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাছাড়া বন দেশের বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রন করে এবং বন্যা ও ঝড়ের তীব্রতা আংশিক রোধ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ মৃত্তিকা ---- সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

১.২ প্রাকৃতিক সম্পদ --- দান।

১.৩ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের --- অগ্রগতি নির্ভরশীল।

১.৪ স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয় বলে খনিজ সম্পদ ---- সম্পদের অন্তর্ভূক্ত।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ কি ধরণের?

ক) মনুষ্য সৃষ্ট খ) প্রকৃতির সৃষ্ট

গ) মনুষ্য ও প্রকৃতি উভয়ের সৃষ্ট ঘ) কোনটিই নয়।

২.২ মৃত্তিকার উর্বরা শক্তির উপর কিসের উন্নতি নির্ভরশীল?

ক) কৃষির খ) পাহাড়-পর্বতের

গ) মৎস্য সমূহের ঘ) কোনটিই নয়

২.৩ বাংলাদেশের মৃত্তিকা কি ধরণের?

ক) উর্বর প্রকৃতির খ) অনুর্বর প্রকৃতির

গ) উভয়ই ঘ) কোনটিই নয়।

২.৪ বন দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি পরিমাণ রোধ করে?

ক) সম্পূর্ণরূপে খ) আংশিকরূপে

গ) রোধ করেনা ঘ) কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ কি কি?

২. প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে কিনা?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ উল্লেখপূর্বক বিবরণ প্রদান করুন।

২. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

পাঠ-৩.৫

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদ
(Major Mineral Resources in Bangladesh)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- বাংলাদেশে কি কি খনিজ সম্পদ আছে তার সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন;
- বাংলাদেশের খনিজ ক্ষেত্রগুলোর অবস্থান মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানোর ফলে জায়গাগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশের প্রধান খনিজদ্রব্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদনকারী এলাকাগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের তালিকার মধ্যে খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দিক বিবেচনায় আনলে বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ পর্যাপ্ত নয়। আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় খনিজ সম্পদের পরিমান কম থাকার কারণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশে যে সকল খনিজ সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে তার বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

কয়লাঃ

কয়লাকে শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় । কলকারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালনা করার জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জ্বালানী হিসেবেও কয়লা ব্যবহৃত হয়। কয়লা সম্পদে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ তত উন্নত নয়। আমাদের দেশের ফরিদপুরের বাঘিয়া ও চান্দা বিল , খুলনার কোলাবিল এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

খনিজ তেলঃ

বিশেষজ্ঞগনের ধারনা অনুযায়ী উল্লেখকরা যায় যে, বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে খনিজ তেল মজুদ রয়েছে। ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া গেছে। এ কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল তোলা হচ্ছে। এ অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামের তেল শোধনাগারে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। অশোধিত তেল থেকে পেট্রোল, কেরোসিন, বিটুমিন ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি অবস্থিত। এ ক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ১২০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয়।

চুনাপাথরঃ

সিলেট জেলার জাফলং, জকিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলার ভাঙ্গারঘাট, বাগলিবাজার, লালঘাট এবং চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড ও কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া যায়। রাজশাহী বিভাগে জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ ও জয়পুরহাটে চুনাপাথর পাওয়া যায়। সিমেন্টের জন্য কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গণ্ডাস, বিণ্ডচিং পাউডার, সাবান, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে চুনাপাথর ব্যবহার হয়ে থাকে।

চীনামাটিঃ

রাজশাহী, নওগাঁ ও ময়মনসিংহে চীনামাটি পাওয়া গেছে। এটি তৈজসপত্র তৈরীতে এবং বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারী সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

তামাঃ

রংপুর জেলার রানীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সঙ্গে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

কঠিন শিলাঃ

রেলপথ, রাস্তাঘাট, গৃহ, সেতু ও বাঁধ নির্মান এবং বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রভৃতিকাজে কঠিনশিলা ব্যবহৃত হয়। রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুরে এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। রংপুরের রানীপুকুর থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের তথ্য মতে, এই

স্থান থেকে বছরে প্রায় ১৭ লক্ষ টন শিলা উত্তোলন করা যাবে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়া থেকে শিলা উত্তোলন করার জন্য বৈদেশিক সহযোগিতা গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সিলিকাবালিঃ

সিলিকাবালি সাধারনত কাঁচ নির্মানে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রং, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি তৈরিতেও সিলিকাবালি ব্যবহৃত হয়। সিলেট জেলার নয়াপাড়া, শাহজীবাজার, কুলাউড়া, শেরপুর জেলার বালিজুরি, চট্টগ্রাম এর দোহাজারীতে সিলিকাবালির সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট সিলিকাবালি উৎপাদিত হয়ে থাকে।

পারমানবিক খনিজ পদার্থঃ

পারমানবিক খনিজ পদার্থ সাধারনত ভারি ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর খনিজ বালির সন্ধান পাওয়া গেছে। পারমানবিক খনিজ পদার্থগুলো হল জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, লিউকক্সেন প্রভৃতি। এ খনিজ সংগ্রহের জন্য অষ্ট্রেলিয়া সরকারের সহায়তায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

গন্ধকঃ

গন্ধক সাধারনত রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বারুদ, কীটপতঙ্গ নাশক ঔষধ তৈরী, এসিড, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, দিয়াশলাই, আতশবাজি প্রভৃতি তৈরীতে গন্ধক ব্যবহার করা হয়। কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়া গেছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের তুলনায় খনিজ সম্পদে পিছিয়ে রয়েছে। তবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ রয়েছে এ দেশ। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ন জ্বালানী সম্পদ, যা সমগ্র দেশের মোট জ্বালানী ব্যবহারের শতকরা ৭০ ভাগ চাহিদা পূরণ করে থাকে। ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ পর্যন্ত দেশের আবিস্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২২ টি। বর্তমানে ১২টি ক্ষেত্রের ৫৪ টি কূপ হতে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। নিম্নের প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ সারনীতে দেয়া হলোঃ

সারণী ঃ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ (বিলিয়ন ঘনফুট)

সাল	উৎপাদনের পরিমাণ (বিলিয়ন ঘনফুট)
২০০১-০২	৩৯২
১৯৯৮--৯৯	৩০৮
১৯৯৭-৯৮	

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩। (পৃষ্ঠা - ৮৫)

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ প্রায় ২৪.৭৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বাংলাদেশের গ্যাস ক্ষেত্রগুলো হল সিলেট, ছাতক, রশীদপুর, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা, বাখরাবাদ, তিতাস, বেগমগঞ্জ, কুতুবদিয়া, কামতা, সেমুতাং. ফেনী, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, জালালাবাদ, মেঘনা, নরসিংদী, শাহবাজপুর, সাঙ্গু, বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার প্রভৃতি।

সর্বোপরি বলা যায় যে, খনিজ সম্পদগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যদি উত্তোলন ও এর সদ্ব্যবহার করা যায় তবে তা দেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়।

নিম্নে বাংলাদেশের খনিজ ক্ষেত্রগুলোর অবস্থান মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

সারণীঃ ৩.৫.২ : বাংলাদেশের খনিজ ক্ষেত্রগুলোর অবস্থান

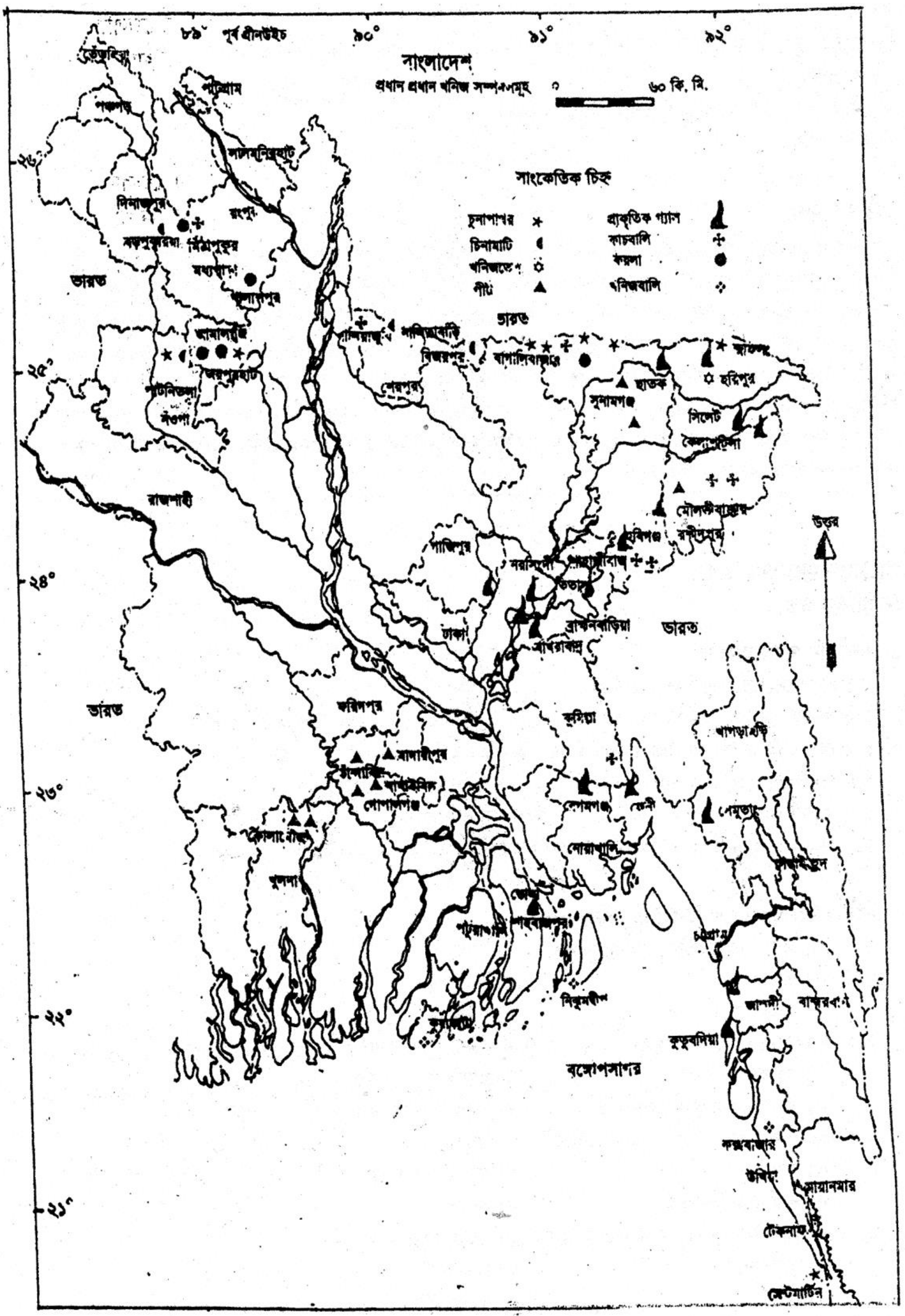

মানচিত্র-৩.৫.১ : বাংলাদেশ, খনিজ সম্পদ

সারণী ঃ

সিমেন্টের জন্য কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়।	প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ।
দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে।	বাংলাদেশের সমুদ্র উপকুল অঞ্চলে খনিজ তেল মজুদ রয়েছে বলে ধারনা করা হয়।
অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামের শোধনাগারে প্রক্রিয়া জাত করা হয়।	

পাঠ সংক্ষেপঃ

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের মধ্যে খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে যেসব খনিজ সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে তা হলো- কয়লা, খনিজ তেল, চুনাপাথর, চীনামাটি, তামা, কঠিনশিলা, সিলিকা বালি, পারমাণবিক খনিজ পদার্থ, গন্ধক, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ। সিলেট, সুনামগঞ্জ, ব্রাক্ষনবাড়িয়া, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, মৌলভী বাজার,ভোলা প্রভৃতি জেলায় প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। বাংলাদেশের রাজশাহী, বগুড়া, নঁওগা এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্ট মানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে খনিজ তেল মজুদ রয়েছে। সিমেন্টের জন্য কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক খনিজ পদার্থ সাধারণত ভারী ধাতব শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মুল্যায়নঃ ৩.৫
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ বাংলাদেশের প্রাপ্ত কয়লা তত বেশী ---------- নয়।
১.২ ধারণা করা যাচ্ছে বাংলাদেশের ----------------- অঞ্চলে খনিজ তেল মজুদ রয়েছে।
১.৩ সিলেটের হরিপুরের তেল ক্ষেত্র থেকে ---------------- উত্তোলন করা হয়।
১.৪ দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় --------------- সন্ধান পাওয়া গেছে।
১.৫ কক্সবাজার জেলার ---------------- দ্বীপে গন্ধক পাওয়া গেছে।
১.৬ বাংলাদেশে মোট আবিস্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্য ---------------- টি।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বিটুমিনাস কি জাতীয় খনিজ পদার্থ?
ক) কয়লা খ) চুনাপাথর
গ) কঠিন শিলা ঘ) চীনামাটি

২.২ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণ খনিজ তেল মজুদ আছে বলে ধারণা করা হয়?
ক) সোপান এলাকা খ) টারশিয়ারী পাহাড় এলাকা
গ) প- াবণ সমভূমি এলাকা ঘ) সমুদ্র উপকূল এলাকা

২.৩ চুনাপাথর থেকে নিচের কোন জিনিষটি তৈরী করা যায় না?
ক) গ- াস খ) বি- চিং পাউডার
গ) স্যানিটারী সরঞ্জাম ঘ) সাবান

২.৪ পারমানবিক খনিজ পদার্থ নীচের কোন স্থানে পাওয়া যায় না?

ক) কুতুবদিয়া খ) টেকনাফ

গ) কুমিল্লা ঘ) কক্সবাজার

২.৫ নীচের কোন দ্বীপে গন্ধক পাওয়া গেছে?

ক) কুতুবদিয়া খ) ভোলা

গ) হাতিয়া ঘ) সন্দ্বীপ

২.৬ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানী ব্যবহারে কত শতাংশ চাহিদা পূরণ করছে?

ক) ৫০ ভাগ খ) ৬০ ভাগ

গ) ৭০ ভাগ ঘ) ৮০ ভাগ

২.৭ বাংলাদেশে কয়টি কুপ থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে?

ক) ৫১ টি খ) ৫২ টি

গ) ৫৩ টি ঘ) ৫৪ টি

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদসমূহ কি কি?

২. বাংলাদেশে কঠিন শিলা কোথায় পাওয়া গেছে?

৩. বাংলাদেশে কি পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত আছে?

৪. বাংলাদেশের কোথায় কোথায় প্রাকৃতিক গ্যাস আবিস্কৃত হয়েছে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদসমূহের ভৌগোলিক বন্টন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ-৩.৬

বনজ সম্পদ

(Forest Resources)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি -

- ◆ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ তুলনা করতে পারবেন;
- ◆ বাংলাদেশের মানচিত্রে বনভুমির অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ◆ বাংলাদেশের বনভূমিকে যে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় তা বুঝতে পারবেন;
- ◆ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদের অবদান সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ◆ বাংলাদেশের বৃক্ষরোপন ও বন সংরক্ষণ বিষয়ে করণীয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সাধারণত বৃক্ষরাজির সমারোহকে বনভূমি বা অরণ্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বনভূমি থেকে যে সম্পদ উৎপাদিত হয় বা পাওয়া যায় তাকে বনজ সম্পদ বলে। একটি দেশের সামগ্রিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে দেশের মোট জমির ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমান হলো প্রায় ২৫,০০০ বর্গকিলোমিটার। অর্থাৎ ৬২ লক্ষ একর বনভূমি রয়েছে বাংলাদেশে যা দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ। দেশের মোট জনশক্তির শতকরা প্রায় ২ ভাগ এই খাতে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের বনভূমি প্রয়োজনের তুলনায় বেশ অপ্রতুল। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে গৃহনির্মাণ সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে গাছপালার অধিক ব্যবহারের ফলে বনভূমির পরিমান দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের বনভূমির পরিমান নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো:

সারণী: ৩.৬.১: মোট ভূ-ভাগের শতকরা হার হিসেবে অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা (বাংলাদেশের বনভূমি)

দেশ	বনভূমি (%)	দেশ	বনভূমি (%)
ফিনল্যান্ড	৭৪	কানাডা	৪৫
মায়ানমার	৬৭	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩৪
জাপান	৬৩	ভারত	২২
সুইডেন	৫৫	বাংলাদেশ	১৭
রাশিয়া	৫১	-	-

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩ পৃ: ৬৩

বিভিন্ন প্রকার বনভূমি:

জলবায়ু ও মৃত্তিকার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন বনাঞ্চল পর্যালোচনার সাপেক্ষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বনভূমি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পর্নমোচী বৃক্ষের অন্তর্গত। তবে এদেশে সরল বর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি ও পরিলক্ষিত হয়। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত। যার ফলে এদেশের বনভূমির বন্টন অনেকটা হয় ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী। বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এদেশের বনভূমির বন্টন অনেকটা ক্রান্তীয় জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সামান্য উচ্চভূমি ব্যতিত সমগ্র দেশ এক বিস্তীর্ন সমভূমি। উচ্চভূমির পরিমান সীমিত হলেও দেশের অধিকাংশ বনভূমি এ উচ্চ ভূমিতেই অবস্থিত।

নিম্নে বাংলাদেশের বিভিন্ন বনভূমির বিবরণ দেয়া হলোঃ

মাটি ও জলবায়ু জনিত পার্থক্য বিরাজমান থাকার কারণে বাংলাদেশের সর্বত্র একই ধরনের উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায় না। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উদ্ভিদ জন্মে। নিম্নে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণী বিভাগ করা হলোঃ

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি।

২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি।
৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

নিম্নে এদের বর্ণনা দেয়া হলো:

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি

যে সকল গাছের পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না এবং পাতাগুলো চিরসবুজ থাকে তাদেরকে চিরহরিৎ গাছ কিন্তু যে সকল পাতাগুলো ঋতু বিশেষে একসঙ্গে ঝরে পড়ে সেগুলোকে পাতাঝরা বৃক্ষ বলা হয়। বাংলাদেশে এ দুই শ্রেণীর বনভূমি দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও সুন্দরবনের প্রায় সব অংশে এবং সিলেট জেলার কিছু অংশে এবং চট্টগ্রামে এ বনভূমি বিস্তৃত। এর আয়তন ১৪,১০২ বর্গ কিলোমিটার। অতিবৃষ্টির জন্য এ সব বনভূমিতে চিরহরিৎ বৃক্ষের সৃষ্টি হয়েছে।

চিরহরিৎ গাছের মধ্যে চাপালিশ, ময়না, তেলসুর ইত্যাদি এ বনে রয়েছে। পাতাঝরার মধ্যে এ বনভূমিতে রয়েছে গামার, শিমুল, কড়ই, সেগুন, জারুল প্রভৃতি গাছ । এ ছাড়া বাঁশ, বেত, মোম, মধু ও ঔষধি গাছ ও এ বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি:

ক্রান্তীয় অঞ্চলে যে সব গাছের পাতা বছরে একবার সম্পূর্ণ ঝরে যায় সেগুলোকে ক্রান্তীয় পাতাঝরা উদ্ভিদ বলা হয়। বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিন কালের সোপান সমূহে এ বনভূমি রয়েছে। এ জাতীয় বনভূমি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ও গাজীপুর, রংপুর ও দিনাজপুরে দেখা যায়। এ বনভূমিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার বনভূমিকে মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভুমি এবং
২. দিনাজপুর জেলার বনভূমিকে বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি বলা হয়। উভয় অঞ্চলের বনভূমিতে শাল গাছের প্রাধান্য রয়েছে। মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমির গাছগুলো স্থানীয়ভাবে গজারী নামে পরিচিত। এ বনভূমিতে কড়ই, হিজল, বহেরা, হরিতকী, কাঁঠাল, নিম প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমির শতকরা ৯৫ ভাগ গাছই শাল।

স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন:

এ বনভূমির আয়তন ৬,৪৭৪ বর্গ কি.মি.। খুলনা , সাতক্ষীরা, বাগের হাট ও বরগুনা জেলায় এ বনাঞ্চল অবস্থিত। সুন্দরী ও গরান এ বনভূমির প্রধান গাছ। অন্যান্য গাছের মধ্যে গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বায়েন প্রভৃতি প্রধান। সুন্দরবনে প্রচুর গোলপাতা জন্মে।

বনজ সম্পদের গুরুত্ব:

বনজ সম্পদ যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের পরিমান সীমিত তবুও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনভূমির ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশের বনভূমির দেশের উন্নয়নে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫% অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদের ভূমিকা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. পন্য সামগ্রী সংগ্রহ:

মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু, মোম প্রভৃতি বন থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এ ছাড়া জীবজন্তুর চামড়া ও ভেষজ দ্রব্য বনভূমি থেকে আহরিত হয়ে থাকে।

২. নির্মান সামগ্রীর উপকরণ সমূহ:

মানুষ বনভূমি থেকে তার ঘরবাড়ি ও আসবাব পত্র নির্মানের জন্য কাঠ, বাঁশ , বেত, প্রভৃতি যাবতীয় উপকরন সংগ্রহ করে। বাড়িঘর ও আসবাব পত্র নির্মানের জন্য মানুষ বনভূমি থেকে সাল, সেগুন, মেহগনি, গর্জন, গামার, কড়ই গাছের মূল্যবান কাঠ সংগ্রহ করে।

৩. কৃষি উন্নয়ন:

এ দেশের বনভূমি দেশের আবহাওয়াকে আর্দ্র রাখে। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে যা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক। এ ছাড়া বনভূমি মাটির ক্ষয়রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রনে সহায়তা করে।

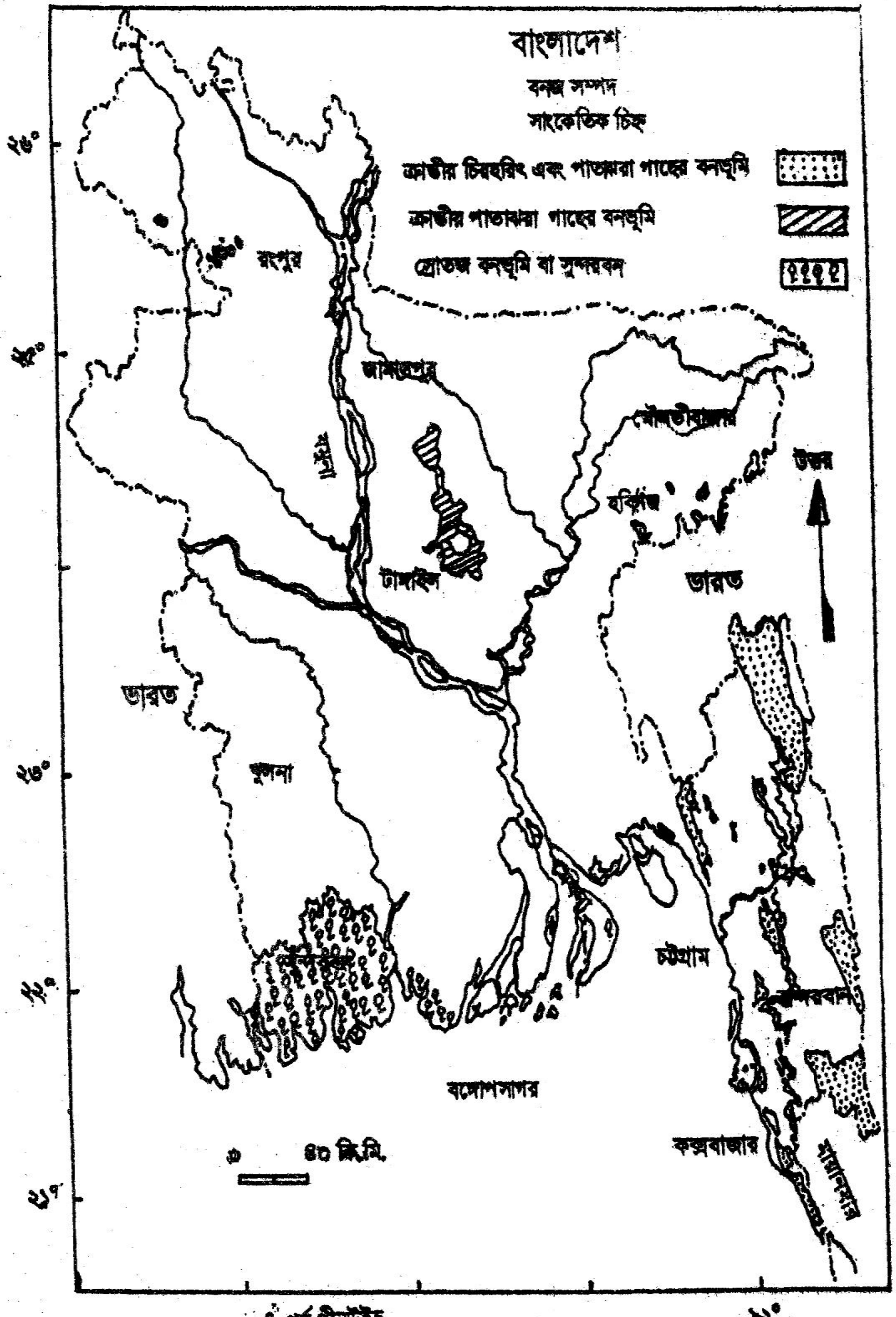

উৎস ঃ বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, ১৯৯৯

মানচিত্র-৩.৬.১ : বাংলাদেশ বনজ সম্পদ

৪. শিল্পের উন্নতিঃ

বাংলাদেশে কাগজ, রেয়ন, দিয়াশলাই, ফাইবার বোর্ড, খেলনার সরঞ্জাম প্রভৃতির উৎপাদন কাজে বনজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে। কর্নফুলী কাগজকল, খুলনা নিউজ প্রিন্ট কারখানা বনজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

৫. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ

বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা দিয়ে রেললাইনের স্লিপার, মোটরগাড়ি , নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ প্রভৃতির কাঠামো, বৈদ্যুতিক খুঁটি, রাস্তার পুল প্রভৃতি নির্মান করা হয়।

৬. সরকারের আয়ের উৎসঃ

বনজ সম্পদের সরকারের আয়ের একটি উৎস। যেমনঃ বনজ সম্পদ বিক্রি ও এর উপর কর ধার্য করে সরকার রাজস্ব আয় বাড়িয়ে থাকে।

৭. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনঃ

বনের বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া, দাঁত, শিং, পশম এবং জীবন্ত বন্য জন্তু রপ্তানি করে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

বাংলাদেশের বৃক্ষরোপন ও বনসংরক্ষণঃ

বনায়ন হচ্ছে মানুষের তৈরী বন। প্রাকৃতিক বন বিভিন্ন কারণে নিঃশেষ হলে বা হওয়ার উপক্রম হলে বনায়নের প্রয়োজন হয়। পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বৃক্ষরোপনের মাধ্যমে বনায়ন কর্মসূচী শুরু করে। দেশে প্রধানত সরকারী পর্যায়েই বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকটা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃক্ষরোপন এবং বনসংরক্ষণের প্রতি সচেষ্ট হওয়া দরকার। বনভূমির পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল থাকায় এর বৃদ্ধি সাধন করা প্রয়োজন। এ জন্য দেশের পানি সেচযোগ্য কিছু অংশে এবং পতিত জমিতে বৃক্ষাদির চারা রোপন করে বনভূমি সৃষ্টি করা দরকার। নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশের বৃক্ষরোপনের অবস্থা তুলে ধরা হলোঃ

সারণীঃ ৩.৬.২ :বৃক্ষরোপনের পরিমান (একরে)

শ্রেণী বিভাগ	১৯৯১-৯২	১৯৯২৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
উপকূলীয় বনভূমি/সুন্দরবন	৮৮১০	১০৬৮৭	১২৩২৮	৯৫০৯	৬৭৪৩	৬৯১৬
পাহাড়ী বনভূমি	৮৯৬৫	১০৪৬৫	১০৪৭৫	১০৪৭২	১০৩০১	১২৭৩৩
শ্রেণী বহির্ভুত বনভূমি	-	৩৩৩০	১৯২১৫	১২৭৮০	৩২৯০	৩৯৩২
সামাজিক বনভূমি	-					
ক. কাঠ নির্ভর	৭০৫০	৯৩৯০	১১৪২৬	৬৮৬৯	৩৩	১২০২
খ. কৃষি বনভূমি	১১০৩	১৮৫৩	১৯৭৭	২৫৫৮	২৪৭	৪৩৯০
গ. রাস্তা, রেল, বাধ প্রভৃতি নির্মাণ	৪৩৮	৩৫৭৮	৫৪৭৬	৩৯৩৩	১৬৬৬	৩৩৩০
ঘ. প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত বনভূমি	-	১৮	২৯	৩২	৮	৪০

উৎসঃ বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯, ১৯৯৭ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা, (পরিবেশ পরিসংখ্যান)। এবং বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট, ২০০১, সংখ্যা-২ (তথ্য সারণী নির্ভর), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

বনভূমির সম্প্রসারন ও এর উন্নয়নের জন্য সরকারী খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। তাই আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বনজ সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হবে। নিম্নে বনজ সম্পদ উন্নয়নে কতিপয় সুপাারিশ মালা দেয়া হলোঃ

১. বনজ সম্পদের সংরক্ষন ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আরো জোরদার করতে হবে।
২. ধ্বংস হয়ে যাওয়া বনাঞ্চল পূর্ণবনায়ন করতে হবে এবং অপরিকল্পিতভাবে বন নিধন বন্ধ করতে হবে।
৩. বনভূমির মূল্যবান গাছ অপরিপক্ক অবস্থায় যাতে না কেটে ফেলা হয় তার ব্যবস্থা করা।
৪. পাহাড়ের ঢালে, সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করতে হবে।
৫. পরিকল্পিত উপায়ে মূল্যবান বৃক্ষ রোপন করতে হবে।

৬. বন গবেষণা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু করা।
৭. বন্য প্রাণী রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
৮. সর্বোপরি বনভূমির অপব্যবহার ও অপচয় রোধ করতে হবে।

দেশে ব্যাপক বনায়ন ও বন সংরক্ষণ, বনজসম্পদের ঘাটতি পূরণ; কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করণ, জীববৈচিত্র্য পরিবেশ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা সার্বিক বন উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ লক্ষে ২০ বছর ব্যাপী (১৯৯৫ - ২০১৫) বন মহাপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। বন মহাপরিকল্পনার তিনটি মূল অঙ্গ। যথা- (i) উৎপাদনমুখী, (ii) অংশীদারিত্বমূলক এবং (iii) প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির জোরদার করণ কর্মসূচী।

যেকোন দেশের মোট জমির ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।	বাংলাদেশের অধিকাংশ বনভূমি উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত।
বনজ সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।	বাংলাদেশের বনভূমি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পর্ণমোচী বৃক্ষের অন্তর্গত।

পাঠ সংক্ষেপঃ

বনভূমি থেকে যে সম্পদ উৎপাদিত হয় তাকে বনজ সম্পদ নামে আখ্যায়িত করা হয়। একটি দেশের সামগ্রিক ভারসাম্য ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে দেশের মোট জমির ২৫ শতাংশ বনভূমি। বাংলাদেশের বনভূমি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বর্ণমোচী বৃক্ষের অন্তর্গত। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি
২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা
৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

বনজসম্পদ যেকোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে জোরদার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে; সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এবং নদী-তীরবর্তী এলাকায় নতুন বনভূমি সৃষ্টি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৬
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরন করুনঃ
১.১ একটি দেশে কমপক্ষে ------ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।
১.২ বাংলাদেশে মোট আয়তনের ------ ভাগ বনভূমি রয়েছে।
১.৩ ------ বৃদ্ধিজনিত কারণে বনভূমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।
১.৪ বাংলাদেশের বনভূমি ক্রান্তীয় ------ বৃক্ষের অন্তর্গত।
১.৫ সুন্দরবনে প্রচুর ------ জন্মে।
১.৬ বনভূমি মাটির ------ প্রতিরোধ করে।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের মোট আয়তনের কতভাগ বনভূমি?
ক) প্রায় ১৫ ভাগ   খ) প্রায় ১৭ ভাগ
গ) প্রায় ২০ ভাগ   ঘ) প্রায় ২৫ ভাগ

২.২ যে সকল গাছের পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না এবং সবুজ থাকে তাদেরকে কি বৃক্ষ বলা হয়?
ক) চিরহরিৎ বৃক্ষ   খ) পাতাঝরা বৃক্ষ
গ) স্রোতজ বৃক্ষ   ঘ) পত্রপতনশীল বৃক্ষ

২.৩ ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভুমি কোথায় দেখা যায়?
ক) টারশিয়ারী পাহাড় এলাকায়   খ) প্লাইষ্টোসিন চত্বর এলাকায়
গ) নোনাভূমি এলাকায়   ঘ) প- াবন সমভূমি এলাকায়

২.৪ ক্রান্তীয় পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমির প্রধান বৃক্ষ কোনটি?
ক) চাপালিশ   খ) সুন্দরী
গ) শাল   ঘ) ময়না

২.৫ কর্ণফুলী কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কি?
ক) বেত   খ) সেগুন কাঠ
গ) বাঁশ   ঘ) সুন্দরী কাঠ

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ
১. বনভূমি কাকে বলে?
২. বাংলাদেশের স্রোতজ বনভূমি কোথায় দেখা যায়?
৩. বনজ সম্পদসমূহ কি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে?
৪. বনজ সম্পদ উন্নয়নে আমাদের কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার?

রচনামূলক প্রশ্নঃ
১. বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণী বিভাগ করুন।
২. বাংলাদেশের বনভূমির উন্নয়নে আপনার মতামত সমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরুন।

পাঠ-৩.৭

মৎস্য সম্পদ
(Fisheries)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি -

- বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদন ও রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে সৎস্য সম্পদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারনা পাবেন;
- বাংলাদেশের ধৃত মৎস্যের পরিমাণ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারনা পাবেন; এবং
- বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ পৃথিবীর কোন কোন দেশে রপ্তানী হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য আমরা মাছের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। পূর্বে এদেশে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যেত এবং এটিই প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হতো । কিন্তু বর্তমানে জলাভূমি কমে যাওয়ায় মাছের অভাবহেতু 'মাথাপিছু' ব্যবহার খুবই কমে গেছে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি পূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান হল শতকরা প্রায় ৫ ভাগ এবং মোট রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান প্রায় ৫.১২ ভাগ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

খাদ্য হিসেবে মৎস্যঃ

মৎস্য বাংলাদেশের অধিবাসীদের একটি উপাদেয় খাদ্য। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে খনিজ আমিষের প্রায় ৬০% আসে মাছ থেকে। বর্তমানে দৈনিক গড় মাথাপিছু মাছ সরবরাহের পরিমাণ প্রায় ২৮ গ্রাম, যেখানে প্রয়োজন কমপক্ষে ৩৫ গ্রাম। আমাদের খাদ্য তালিকায় যেখানে প্রোটিন এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব রয়েছে সেখানে মৎস্য সেই অভাব বহুলাংশে মেটাতে পারে।

জীবিকা নির্বাহের উপায়ঃ

নদীবহুল বাংলাদেশের সর্বত্র অসংখ্য ছোট বড়, নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, হাওড়, কৃত্রিম জলাশয় রয়েছে। এ সব জলাশয় বিভিন্ন ধরনের মৎস্যে পরিপূর্ণ। এসব মৎস্য শিকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় ১২ লাখ ৫২ হাজার লোক জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া আরো অনেক লোক পরোক্ষভাবে মৎস্য শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনঃ

মৎস্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। রপ্তানীকৃত মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছের পরিমানই বেশী। জাতীয় আয়ের প্রায় ৫.৩% এবং দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৬% আসে মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তানি থেকে। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে ৩৮৯৮৮ মেট্রিকটন মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তনি করে ২০৩২.৭৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে। ২০০১-২০০২ অর্থবছরে ৪২৪৮২ মেট্রিকটন মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য রপ্তানি করে ১৬৭৩.১৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

শিল্পের উপকরণঃ

মাছের চর্ম, হাড়, কাঁটা, চর্বি ইত্যাদি কতিপয় শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- হাঙ্গর, কচ্ছপ হতে আহরিত তেল দ্বারা নানা ধরনের ওষুধ, বার্নিশ, গ্লিসারিন, সাবান ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। আবার চামড়া প্রক্রিয়াজাত করনেও এসব মৎস্য তেল ব্যবহৃত হয়।

আনুষাঙ্গিক শিল্পের উন্নতিঃ

মৎস্য শিল্পকে কেন্দ্র করে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পূরক শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন- নৌকা ও জাল তৈরীর কারখানা, বরফ ও লবন উৎপাদন কারখানা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের মৎস্য ক্ষেত্রসমূহ:

বাংলাদেশের নদী-নালা, খালবিল, পুকুর-ডোবা, হাওড়-বাঁওড়, নদীর মোহনা, উপকূল ও সমুদ্র অঞ্চল ইত্যাদি মৎস্যের প্রধান ক্ষেত্র। এছাড়া কৃত্রিম জলাশয়, ধান ও পাট ক্ষেতও মৎস্যের ক্ষেত্র হিসেবে পরিগনিত। বাংলাদেশের এ সকল মৎস্য ক্ষেত্রে প্রায় ২৫০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। দেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ের পরিমাণ প্রায় ৪৪.৪ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ১১ লাখ ১২হাজার হেক্টর পরিমান জমিতে মৎস্য ক্ষেত্র রয়েছে। এসব মৎস্য ক্ষেত্র থেকে ধৃত মৎস্যের পরিমান প্রায় ৮ লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন। মৎস্যের উৎপাদন ক্ষেত্রের অবস্থান অনুযায়ী তাদের ২টি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

ক. অভ্যন্তরীন মৎস্য ক্ষেত্র ও

খ. সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্র।

সারণীঃ ৩.৭.১ : বাংলাদেশের মৎস্য ক্ষেত্রের পরিমান (হেক্টর হিসেবে)

মৎস্য ক্ষেত্রের প্রকার	পরিমাণ (হেক্টর হিসেবে)
১. পুকুর এবং ডোবা	৬৯,৪৫৫.৪২
২. খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়	২,৯৩০০২.৮০
৩. নদী-নালা	৮,৩০,১২০.৬৪
৪. কর্নফুলী কাপ্তাই হ্রদ	৯০,৬৫২.৮০
৫. নদীর মোহনা, সুন্দরবন অঞ্চল	১৮,২৯২.০০
৬. ধানক্ষেত ও পাট ক্ষেত (৪-৫ মাসের বেশি যে ক্ষেত্রে পানি থাকে)	১০,১১,৭৫০.০০
৭. উপকূল ও সমুদ্র অঞ্চল	১০,১১,৭৫০.০০
সর্বমোট-	১,১১,১২,৫৮৫.৮৬

উৎসঃ Directorate of Fisheries.

ক. অভ্যন্তরীন বা মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্রঃ

বাংলাদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, হাওড়-বাঁওড়, ধান ও পাট ক্ষেত এবং নদীর মোহনা ইত্যাদিকে অভ্যন্তরীন মৎস্য ক্ষেত্র বলে। এ সকল অঞ্চলের ধৃত মৎস্যকে অভ্যন্তরীন বা মিঠা পানির মৎস্য বলা হয়। অভ্যন্তরীন মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মৎস্যের মধ্যে রয়েছে ইলিশ, রুই, কাতলা, মৃগেল, চিতল, আইড়, বোয়াল, পাঙ্গাশ, শোল, কই, মাগুর, শিং, চিংড়ি, পাবদা, সরপুটি ইত্যাদি।

খ. সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রঃ

মৎস্য শিল্পে উন্নত না হলেও বাংলাদেশ মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ । দেশের বিভিন্ন জলাশয় নানা ধরনের মাছ ও মাছ জাতীয় সম্পদে পরিপূর্ণ। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন জলাশয় হতে প্রচুর মৎস্য ধৃত হলেও , সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের পরিমান খুবই কম। ১৯৮৪-১৯৯৮ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মোট ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ৬৩% থেকে কমে গিয়ে ৪৬% দাঁড়িয়েছে। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- রুপচাঁদা, লইট্যা, ছুড়ি, সুরমা প্রভৃতি। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন এলাকায় সমন্বিত মৎস্য চাষ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ২০০১ সালের হিসাব অনুযায়ী সরকারী পর্যায়ে ১১২ টি এবং বেসরকারী পর্যায়ে ৬৬৭ টি সহ সর্বমোট ৭৭৯ টি মৎস্য হ্যাচারি ও খামার রয়েছে। এছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে প্রায় ১৭০০ টি মৎস্য খামার আছে। নিম্নে অবদান অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মৎস্য সম্পদের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৯৯/২০০০ থেকে ২০০২/০৩) তুলে ধরা হলো।

সারণী : ৩.৭.২: বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ঃ

জলাশয়ের বিবরণঃ	আয়তন (লক্ষ হে:)	৯৯/২০০০	২০০০/০১	২০০১/০২	২০০২/০৩
১। অভ্যন্তরীন জলাশয় ক. মুক্ত জলাশয়		উৎপাদন (মে.টন)	উৎপাদন (মে.টন)	উৎপাদন (মে.টন)	উৎপাদন (মে.টন)
নদী ও নদী মোহনা	১০.৩২	১.৫৪	১.৫০	১.৬৫	১.৭৯
সুন্দরবন	---	০.১১	০.১২	০.১৩	০.১৪
ডবল	১.১৪	০.৭৩	০.৭৫	০.৮০	০.৮৯
কাপ্তাই লেক	০.৬৯	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮৯
প্লাবনভূমি	২৮.৩৩	৪.২৫	৪.৪৫	৪.৫০	৫.০১
মোট মুক্ত জলাশয়	৪০.৪৭	৬.৭০	৬.৮৯	৭.১৬	৭.৯২
খ. বদ্ধ জলাশয় পুকুর	২.৪২	৫.৬১	৬.১৬	৬.৫০	৭.২৩
বাওড়	০.০৫	০.০৪	০.০৪	০.০৫	০.০৫
চিংড়ি খামার	১.৪১	০.৯২	০.৯৩	১.০০	১.১১
মোট বদ্ধ জলাশয়	৩.৮৮	৬.৫৭	৭.১৩	৭.৫৫	৮.৪০
মোট অভ্যন্তরীন	৪৪.৩৬	১৩.২৮	১৪.০২	১৪.৭০	১৬.৩২
২। সামুদ্রিক জলাশয় ক. বণিজ্যিক ভিত্তি	০.৪৮	০.১৬	০.২৪	০.৩০	০.৩৩
খ. আর্টিসনাল ভিভিতে	---	৩.১৮	৩.৫৫	৩.৭০	৪.১২
মোট সামুদ্রিক	---	৩.৩৪	৩.৭৯	৪.০০	৪.৪৫
দেশের মোট মৎস্য উৎপাদন	১৬.৬১	১৬.৬১	১৭.৮১	১৮.৭০	২০.৭৭

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

মৎস্যের বাণিজ্য:

দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ প্রচুর মৎস্য বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। রপ্তানিকৃত মাছের মধ্যে চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, ইলিশ প্রভৃতি প্রধান। এ সকল মাছ তাজা অবস্থায় বরফ দিয়ে এবং শুকনা অবস্থায় লবন দিয়ে বিদেশে রপ্তানী করা হয়। ২০০১-২০০২ সালে বাংলাদেশ থেকে ১৬৭৩.১৪ কোটি টাকা মূল্যের ৪২,৪৮২ মেট্রিক টন মৎস্য বিশ্ববাজারে রপ্তানী হয়।

আমদানী কারক দেশসমূহ:

যে সকল দেশ বাংলাদেশ হতে মাছ ও মাছ জাতীয় পন্য আমদানী করে তাদের মধ্যে ভারত, চীন, জাপান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, সৌদি আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রধান। নিম্নের সারণীতে মৎস্যের রপ্তানী বাণিজ্য দেয়া হলো:

সারণী : ৩.৭.৩: মৎস্যের রপ্তানী বানিজ্য

সাল	রপ্তানীকৃত মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্য (মেট্রিক টন)	মূল্য (কোটি টাকা হিসেবে)
২০০০-২০০১	৩৮,৯৪৮	২০৩২.৭৫
২০০১-২০০২	৪২,৪৮২	১৬৭৩.১৪

উৎস: অর্থনৈতিক জরিপ, ২০০১-২০০২।

পরের পাতায় মৎস্য সম্পদের অবস্থান মানচিত্রে উপস্থাপন করা হলো:

উৎস ঃ বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, ১৯৯৯

চিত্র ৩.৭.১ : বাংলাদেশ এর মৎস সম্পদ

বাংলাদেশের মৎস্য শিল্পঃ

মৎস্য চাষ, মৎস্য ধরা, মৎস্য সংরক্ষণ, মৎস্য বাজারজাতকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মৎস্য হতে কতিপয় শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপকে মৎস্য শিল্প বলা হয়। বাংলাদেশ প্রচুর মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও এ শিল্পে অনুন্নত। সম্প্রতি সরকারী ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। উপরিউক্ত আলোচনা হতে বুঝা যায় যে, প্রাথমিক শিল্প হিসেবে খাদ্য ও প্রোটিন সরবরাহ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কতিপয় শিল্পের কাঁচামাল যোগান, বহু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে মৎস্য শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মৎস্য বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।	মৎস্য বিশেষত চিংড়ী মাছ রপ্তানী করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।	বাংলাদেশের বিভিন্ন মৎস্য ক্ষেত্রে প্রায় ২৫০ প্রজাতির মৎস্য পাওয়া যায়।
মৎস্য প্রোটিন ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মিটিয়ে থাকে।	

পাঠ সংক্ষেপঃ

মৎস্য বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অভ্যন্তরীন চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ মৎস্য রপ্তানি করে প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এক্ষেত্রে স্বেতস্বর্ণ (White Gold) হিসেবে পরিচিত চিংড়ীর অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নদী -নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, হাওর- বাওড়, নদীর মোহনা, উপকুল ও সমুদ্র অঞ্চল প্রভৃতি মৎসের প্রধান ক্ষেত্র। বাংলাদেশের এসকল মৎস্য ক্ষেত্রে প্রায় ২৫০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। মৎস্যের উৎপাদন ক্ষেত্রের অবস্থান অনুযায়ী তাদের দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. অভ্যন্তরীন বা মিঠা পানির মৎস্য ক্ষেত্র এবং

খ. সামুদ্রিক বা লোনাপানির মৎস্য ক্ষেত্র।

দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে নানা ধরনের মাছ ও মাছ জাতীয় সম্পদে পরিপূর্ণ। সর্বপরি মৎস্য শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য সম্পদের অবদান শতকরা প্রায় ---------- ভাগ।

১.২ বাংলাদেশের শতকরা --------- ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।

১.৩ মৎস্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ বার্ষিক ------------ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

১.৪ বাংলাদেশের বিভিন্ন মৎস্য ক্ষেত্রে প্রায় ------------ প্রজাতির মৎস্য পাওয়া যায়।

১.৫ রুই মাছ একটি ------------ পানির মৎস্য।

১.৬ সৌদি আরব বাংলাদেশ থেকে মৎস্য -------------- করে।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

২.১ বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য সম্পদের অবদান কত?

ক) শতকরা ৫ ভাগ　　খ) শতকরা ১০ ভাগ

গ) শতকরা ১২ ভাগ　　ঘ) শতকরা ১৫ ভাগ

২.২ বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদের অবদান কত?

ক) প্রায় ৪ ভাগ　　খ) প্রায় ৪.১২ ভাগ

গ) প্রায় ৫ ভাগ　　ঘ) প্রায় ৫.১২ ভাগ

২.৩ বাংলাদেশের কত শতাংশ জনগন মৎস্য শিকার ও মৎস্য ব্যবসার সাথে জড়িত?

ক) প্রায় ৫ শতাংশ　　খ) প্রায় ১০ শতাংশ

গ) প্রায় ১৫ শতাংশ　　ঘ) প্রায় ২০ শতাংশ

২.৪ মাছ থেকে নিম্নের কোন উপাদানটি বেশী পাওয়া যায়?

ক) ভিটামিন　　খ) প্রোটিন

গ) কার্বোহাইড্রেট　　ঘ) ফ্যাট

২.৫ বাংলাদেশে কয় প্রজাতির মৎস্য পাওয়া যায়?

ক) ২০০ প্রজাতি　　খ) ২৫০ প্রজাতি

গ) ৩০০ প্রজাতি　　ঘ) ৩৫০ প্রজাতি

২.৬ ইলিশ মাছ কোথায় পাওয়া যায়?

ক) নদীর মোহনায়　　খ) গভীর সমুদ্রে

গ) নদীর উজানে　　ঘ) বিলে

২.৭ নিচের কোন দেশটি বাংলাদেশ থেকে মৎস্য আমদানি করে?

ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র　　খ) চীন

গ) জাপান　　ঘ) সবগুলোই ঠিক

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের অবদান কতটুকু?

২. বাংলাদেশের কি পরিমাণ লোক মৎস্য শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে?

৩. বাংলাদেশের মৎস্য ক্ষেত্রকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

৪. মিঠাপানির মৎস্য ও লোনাপানির মৎস্যের উদাহরণ দাও।

৫. বাংলাদেশ থেকে কোন কোন দেশ মৎস্য আমদানি করে থাকে?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলুন।

২. বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদকে শ্রেণী বিভাগ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

পাঠ-৩.৮

শিল্প
(Industries)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- বাংলাদেশে কি কি শিল্প আছে তার সম্পর্কে একটি সম্যক ধারনা পাবেন;
- দেশের শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার পেছনে প্রধান কারণসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখা পোষাক শিল্প সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- বাংলাদেশের মানচিত্রের মাধ্যমে শিল্পগুলোর অবস্থান দেখতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি র্নিভর। কৃষিনির্ভর দেশ হলেও উন্নয়নশীল দেশের বিবেচনায় এ দেশে শিল্পের গুরুত্বও অপরিসীম। বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে এখনও সমৃদ্ধশালী নয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশের শিল্পসমূহ হলোঃ পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, কাগজ শিল্প,সারশিল্প, চিনিশিল্প, পোশাকশিল্প, রাসায়নিক শিল্প, ঔষধ শিল্প, কৃষি-সম্পর্কিত শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রমাত্রার শিল্প প্রভৃতি। বেশীরভাগ শিল্পগুলোর অবস্থান হলোঃ বৃহত্তর ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনা। বৃহত্তর ঢাকার মধ্যে শিল্প গুলোর অবস্থান হলো তেজগাঁও, হাজারীবাগ, ডেমরা, টঙ্গি, জয়দেবপুর, নরসিংদী এবং নারায়নগঞ্জ। চট্টগ্রামের মধ্যে এর অবস্থান হলো কালুরঘাট, নাসিরাবাদ, ষোলশহর, পতেঙ্গাঁ, কাপ্তাই, ভাটিয়ারী, বাড়বকুন্ড এবং ফৌজদারহাট। খুলনার মধ্যে এলাকাগুলো হলো শিরমণি, খালিসপুর, বয়রা এবং রুপসা উল্লেখযোগ্য। এ শিল্পগুলোর বেশীরভাগ অবস্থানই হলো নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহে এবং নগরীর উপকণ্ঠ সমূহে। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহের বর্ননা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

পাট শিল্পঃ

পাটশিল্প গড়ে ওঠার পিছনে যে সকল ভৌগোলিক কারণ রয়েছে সেগুলো হল জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা ও শক্তি সম্পদ প্রাপ্তি। অর্থনৈতিক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে- কাঁচামাল প্রাপ্তি, দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক, বাজার, মূলধন, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, সরকারের শিল্পনীতি ইত্যাদি। ১৯৫০সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন পাটকল গড়ে উঠেনি। ১৯৫১ সালে ১০০০ তাঁত নিয়ে নারায়নগঞ্জের আদমজীনগরে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম পাটকল। এটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল। বর্তমানে আদমজী পাটকল অলাভজনক হওয়ার কারণে বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বেসরকারী খাতে মোট ৯৯ টি পাটকল রয়েছে। বর্তমানে এগুলোর মধ্যে ৭৩টি চালু রয়েছে (উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা,২০০৩, পৃঃ ১৬২)। নারায়নগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রাম প্রধান তিনটি পাটশিল্প কেন্দ্র। এছাড়া ডেমরা, ঘোড়াশাল, নরসিংদী, ভৈরববাজার, গৌরীপুর, মাদারীপুর, চাঁদপুর সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও পাটকল রয়েছে। এ পাটকলে সাধারণত চট, বস্তা, কার্পেট, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়ে থাকে। এছাড়াও পাট থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, স্যান্ডেল, শো-পিস প্রভৃতি তৈরী করা হয়। নিম্নে সারনীতে বিগত কয়েক বছরের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ এবং রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত আয় দেখানো হলোঃ

সারণীঃ ৩.৮.১ : বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও আয় (১৯৯৭-২০০২)

সাল	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	অর্জিত আয় (মিলিয়ন ইউ,এস ডলার)
১৯৯৬-৯৭	৪০৫.০০	৩১৮
১৯৯৭-৯৮	৪১১.০০	২৮১
১৯৯৮-৯৯	৩৬৭.৯৩	৩০৪
১৯৯৯-০০	৩৩৯.০০	২৬৬
২০০০-০১	৩৪০.৩৭	২৩০
২০০১-০২	২৯৩.২২	২৪৪

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণী- ২৭, সারণী- ৪২

পাটক্রয়কৃত দেশসমূহঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, মিশর, রাশিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ইতালি, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে কৃত্রিম তন্তুজাত দ্রব্য ব্যাবহার শুরু হওয়ায় বিশ্বের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। যার ফলস্বরুপ বাংলাদেশে পাট শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট কমে গেছে।

বস্ত্রশিল্পঃ

বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প হচ্ছে বস্ত্র। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক চাহিদা রয়েছে তার মধ্যে খাদ্যের পরেই বস্ত্রের প্রয়োজন। বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হলো তুলা যা বাংলাদেশে খুব কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে বাৎসরিক বস্ত্রের চাহিদা ৮২৩ মিলিয়ন মিটার, কিন্তু দেশীয় বস্ত্রশিল্পের বাৎসরিক উৎপাদন ৪৫০ মিলিয়ন মিটার। তাছাড়া প্রয়োজনীয় তুলার উৎপাদন বাংলাদেশে খুবই কম এবং নিম্নমানের। এজন্য বস্ত্রশিল্পকে তুলা আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে মোট বস্ত্র কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮টি। এসব বস্ত্রকলে তাঁতের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭১৭ টি। বস্ত্রকলের সংখ্যা ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল ৪৪টি। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৬৩ টি বস্ত্র ও সুতাকল চালু রয়েছে। বর্তমানে ২৫ টি কল বেসরকারি খাতে পরিচালিত হচ্ছে। বস্ত্রশিল্পে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় রয়েছে। তবে এদের অধিকাংশ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তাঁত শিল্পে নিয়োজিত আছে। বস্ত্রকলে প্রায় ৭৫ হাজার শ্রমিক কর্মরত আছে। বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন নিম্নে সারনীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণী ঃ ৩.৮.২ :বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন, বাংলাদেশ, ১৯৯২-২০০২

সাল	সুতা উৎপাদন (মিলিয়ন কে.জি	কাপড় উৎপাদন (মিলিয়ন মিটার)	সাল	সুতা উৎপাদন (মিলিয়ন কে.জি)	কাপড় উৎপাদন (মিলিয়ন মিটার)
১৯৯২-৯৩	৬০.৬০	৪৫.১০	১৯৯৭-৯৮	৫২.৮৮	১০.২৬
১৯৯৩-৯	৫৭.৩০	৩১.৬০	১৯৯৮-৯৯	৫৪.৮০	১১.১৫
১৯৯৪-৯৫	৪৯.১০	১৭.০০	১৯৯৯-০০	৫৮.০০	১১.৪১
১৯৯৫-৯৬	৪৯.৯০	১০.২৮	২০০০-০১	৬০.৮২	১৪.৭৩
১৯৯৬-৯৭	৫০.১৬	১০.৯০	২০০১-০২	৬৫.৫৮	১৬.১৪

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণী - ২৭।

বাংলাদেশের ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প গড়ে উঠেছে। ঢাকা অঞ্চলে ঢাকা এবং এর আশেপাশে প্রায় ২৪টি বস্ত্রশিল্প স্থাপিত হয়েছে। টঙ্গি, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ, কাঁচপুর, ডেমরা, সাভার প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্র ও বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ফৌজদারহাট, ষোলশহর, পাঁচলাইশ, হালিশহর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বস্ত্র শিল্প কেন্দ্র। চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় প্রধান বস্ত্রশিল্প অঞ্চল। কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলের দুর্গাপুর, দৌলতপুর হালিমা নগর, ব্রাক্ষনবাড়িয়া, দেবীদ্বার, ফেনী প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রকল রয়েছে। এ অঞ্চলটি বাংলাদেশের তৃতীয় প্রধান বস্ত্র শিল্পাঞ্চল। বর্তমানে বাংলাদেশে যে বস্ত্র উৎপাদিত হয় তা চাহিদার তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত। বাংলাদেশ প্রতি বছর জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোরিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা, সুতিবস্ত্র ও সুতা আমদানি করে থাকে।

কাগজ শিল্পঃ

কাগজ শিল্প বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি কাগজকল, ৪ টি বোর্ডমিল ও ১টি নিউজপ্রিন্ট কারখানা আছে। কাগজের কলগুলো হলো রাঙ্গামাটি জেলার চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী কাগজকল, পাবনা জেলার পাকশীর উত্তরবঙ্গ কাগজকল, ছাতকের সিমেন্ট মন্ড ও কাগজ কল এবং নারায়নগঞ্জের মেঘনা ঘাটের নিকট বসুন্ধরা, মাগুড়া ও শাহজালাল কাগজকল। এছাড়া নিউজপ্রিন্ট কারখানার মধ্যে খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানা উল্লেখযোগ্য। বোর্ড মিলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ হার্ডবোর্ড মিলস্, আদমজী পাটকল বোর্ড মিলস, কাপ্তাই ও টঙ্গির বোর্ড মিলস উল্লেযোগ্য। কাগজ উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাঁশ, নরমকাঠ, নলখাগড়া, আখের ছোবড়া, পাটকাঠি প্রভৃতি। এছাড়া বর্তমানে কাঁচাপাট দিয়েও কাগজ তৈরীর উন্নত প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়েছে। কাগজকলগুলোতে প্রধানত লেখার কাগজ,

ছাপার কাগজ, প্যাকিং ও অন্যান্য কাগজ এবং প্রচুর নিউজপ্রিন্ট উৎপন্ন হয়। নিম্নে সারনীতে বিগত কয়েক বছরের কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট এর উৎপাদন দেখানো হলোঃ

সারণীঃ ৩.৮.৩ : কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন, বাংলাদেশ, ১৯৯০-১৯৯৯।

সাল	কাগজ উৎপাদন (মে.ট.)	নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন (মে.ট.)	সাল	কাগজ উৎপাদন (মে.ট.)	নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন (মে.ট.)
১৯৯০-৯১	৪৩০৯৩	৪৭০০৫	১৯৯৫-৯৬	৪১৮২৯	৪৩৯৭২
১৯৯১-৯২	৪১২৯৩	৪৭০৬৮	১৯৯৬-৯৭	৩৯৮৪০	২৭৬৭৫
১৯৯২-৯৩	৪৩৪৫৫	৪৬২৯০	১৯৯৭-৯৮	৩৮২০৮	৭৬৭৩
১৯৯৩-৯৪	৪৪২৮৮	৪৬৫২৭	১৯৯৮-৯৯	৩৮২৮৯	২১৫৭৩
১৯৯৪-৯৫	৩৯৭৩৬	৪৩০৬২	--	--	--

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ বর্ষগ্রন্থ, ২০০০, সারণী ৫.১৩।

বাংলাদেশ কাগজ ও কাগজ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে দেশের অধিকাংশ চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরে কিছু নিউজপ্রিন্ট রপ্তানি করে থাকে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মায়ানমার, নেপাল, ইরাক প্রভৃতি দেশে কাগজ রপ্তানী করে থাকে। কাগজ শিল্পে কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্য, শক্তি সম্পদ প্রভৃতির অভাব বিরাজমান রয়েছে। এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কাঁচামালের সুষ্ঠ সরবরাহ, পর্যাপ্ত ও নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিশ্ববাজার সৃষ্টি প্রভৃতি।

সার শিল্পঃ

বাংলাদেশ প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ। জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে সারের গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরনের জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ফসল আর এর জন্যই ভুমির একর প্রতি ফসল বৃদ্ধির জন্য সারের প্রয়োজন রয়েছে। জমিতে জৈব সার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারশিল্প গড়ে উঠার জন্য যে সকল নিয়ামক প্রয়োজন রয়েছে সেগুলো হলো কাঁচামালের পর্যাপ্ততা, শক্তি সম্পদের প্রাপ্তি, বাজার, সুলভ শ্রমিক ও সুষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থা। ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা স্থাপিত হয়। বর্তমানে ৮টি সারকারখানা থেকে সার উৎপাদিত হচ্ছে। সারকারখানাগুলো হলো ঘোড়াশাল সারকারখানা, আশুগঞ্জ জিয়া সার কারখানা, পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা ও যমুনা সার কারখানা ও ফেঞ্চুগঞ্জ অ্যামোনিয়াম সালফেট সার কারখানা। নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশের বিগত কয়েক বছরের সারের উৎপাদন দেখানো হলো-

সারণী: ৩.৮.৪: সার উৎপাদন, বাংলাদেশ ১৯৯২-২০০২

সাল	উৎপাদন ('০০০মেট্রিকটন)	সাল	উৎপাদন ('০০০মেট্রিকটন)
১৯৯২-৯৩	২০৫০.৬০	১৯৯৭-৯৮	২০৩০.৬৭
১৯৯৩-৯৪	২৩৬৬.১০	১৯৯৮-৯৯	১৭৯৯.৩৬
১৯৯৪-৯৫	২১৪৪.৯০	১৯৯৯-২০০০	২০৩০.৬৭
১৯৯৫-৯৬	২২৪৮.০০	২০০০-২০০১	১৭৯৯.৩৬
১৯৯৬-৯৭	১৭৭২.৬৬	২০০১-২০০২	১৯০৪.০২

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ২০০৩, সারণী-২৭।

সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ন না হওয়ায় বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর সার আমদানি করে। ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশ প্রায় ৬১৫ কোটি টাকা মূল্যের সার আমদানি করে (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা; ২০০৩, সারণী-৪৩)। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম। প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সারশিল্প উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

চিনি শিল্পঃ

চিনি শিল্প বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। চিনি খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে ৫ টি চিনির কল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৭টি চিনির কল রয়েছে। বাংলাদেশের চিনিকলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শ্যামপুর চিনির কল , সেতাবগঞ্জ চিনির কল, ঠাকুরগাঁও চিনির কল, দর্শনা চিনির কল,

ফরিদপুর চিনির কল প্রভৃতি। চিনি উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল আখ। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় আখের উৎপাদন ভাল হয়। তাই আবহাওয়া ও মৃত্তিকাজনিত কারনে বাংলাদেশে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে। চিনির কলগুলো বেশির ভাগই দেশের উত্তর ও পশ্চিমে অংশে অবস্থিত। ১৯৯৪-৯৫ সালে চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদনের পরিমান ছিল ২.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৯২-২০০২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হলোঃ

সারণীঃ ৩.৮.৫: চিনি উৎপাদন, বাংলাদেশ ১৯৯২-২০০২

সাল	উৎপাদন ('০০০মেট্রিকটন)	সাল	উৎপাদন ('০০০মেট্রিকটন)
১৯৯২-৯৩	১৮৭.৫০	১৯৯৭-৯৮	১৬৬.৪৬
১৯৯৩-৯৪	২২১.৪০	১৯৯৮-৯৯	১৫২.৯৮
১৯৯৪-৯৫	২৭০.১০	১৯৯৯-২০০০	১২৩.৪৩
১৯৯৫-৯৬	১৮৪.০০	২০০০-২০০১	৯৭.৮২
১৯৯৬-৯৭	১৩৫.৩২	২০০১-২০০২	২০৪.৩৩

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারনী -২৭।

বাংলাদেশের চিনি শিল্পের প্রধান সমস্যা হল আখ সরবরাহের অনিশ্চয়তা। আখ উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য একদিকে যেমন চিনিকলগুলো পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছে না অপরদিকে তেমনি আর একটি সমস্যা হল মাঠেই গুড় উৎপাদনের প্রবণতা।

পোশাকশিল্পঃ

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ন শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। অভ্যন্তরীন বাজারে বিক্রির জন্য ষাটের দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্প উৎপাদন শুরু করে ক্রমান্বয়ে এ শিল্পে রপ্তানী মুখী উৎপাদন শুরু হয়েছে। ১৯৮৩ সালের শেষ নাগাদ সারাদেশে মাত্র ৯২ টি রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এর পরবর্তীতে এ শিল্প অতি দ্রুত বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের শীর্ষে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের তৈরী পোশাক কারখানাগুলি কাঁচামাল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণের জন্য আমদানির ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল। এসব পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের সামর্থ্য সীমিত। রপ্তনীযোগ্য তৈরী পোশাক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় তাঁত বস্ত্রের প্রায় ৯০ ভাগ এবং বুনন কাপড়ের শতকরা ৬০ ভাগ বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়।কিন্তু বর্তমানে ২০০৫ সালের প্রারম্ভেই কোটামুক্ত গার্মেন্টস শিল্প চালু হওয়ায় এ শিল্পের বিশ্ববাজারে রপ্তানীর ক্ষেত্রে এক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমেই বিশ্বের বাজারে এ শিল্পের ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় এক হাজারের মতো রপ্তানীমুখী পোশাকশিল্প ইউনিট রয়েছে। এগুলোর প্রায় ৭৫% ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত। অবশিষ্ট ইউনিটগুলোর প্রায় সবই চট্টগ্রাম বন্দর নগরীতে এবং কিছু খুলনা এলাকায় রয়েছে। এ শিল্পে প্রায় ৭ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় আছে। এদের শতকরা ৮৫ জনই মহিলা। ২০০১-২০০২ সালে এ শিল্পে বাংলাদেশ প্রায় ১৭৯৪৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে যা মোট রপ্তানীর আয়ের প্রায়৫২%। নিম্নের সারণীতে কয়েক বছরের পোষাক শিল্প হতে রপ্তানী আয়ের তালিকা দেখানো হলোঃ

সারণীঃ ৩.৮.৬: পোশাক শিল্প হতে রপ্তানী আয়, বাংলাদেশ

সাল	মোট রপ্তানী আয় (কোটি টাকায়)	তৈরি পোষাকের রপ্তানীর আয় (কোটি টাকায়)	মোট রপ্তানী আয়ে তৈরি পোষাকের অংশ (শতকরা হার)
১৯৯০-৯১	৬১২৯.৮২	২৬২৬.০৪	৪২.৮৪
১৯৯৫-১৯৯৬	১৫৮৫৪.০৯	৭৯৫৯.৭২	৫০.২১
১৯৯৮-১৯৯৯	২৫৫৮৭.১৪	১৪৩৪৫.৯১	৫৬.০৬
১৯৯৯-২০০০	২৮৯৩৮.৩১	১৫৫১০.৫৭	৫৩.৫৯
২০০০-২০০১	৩৪৮৯৫.৯৩	১৮১৫২.১৪	৫২.০১
২০০১-২০০২	৩৪৩৩৭৭.৬০	১৭৯৪৬.৮৮	৫২.২০

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারণী -৪২।

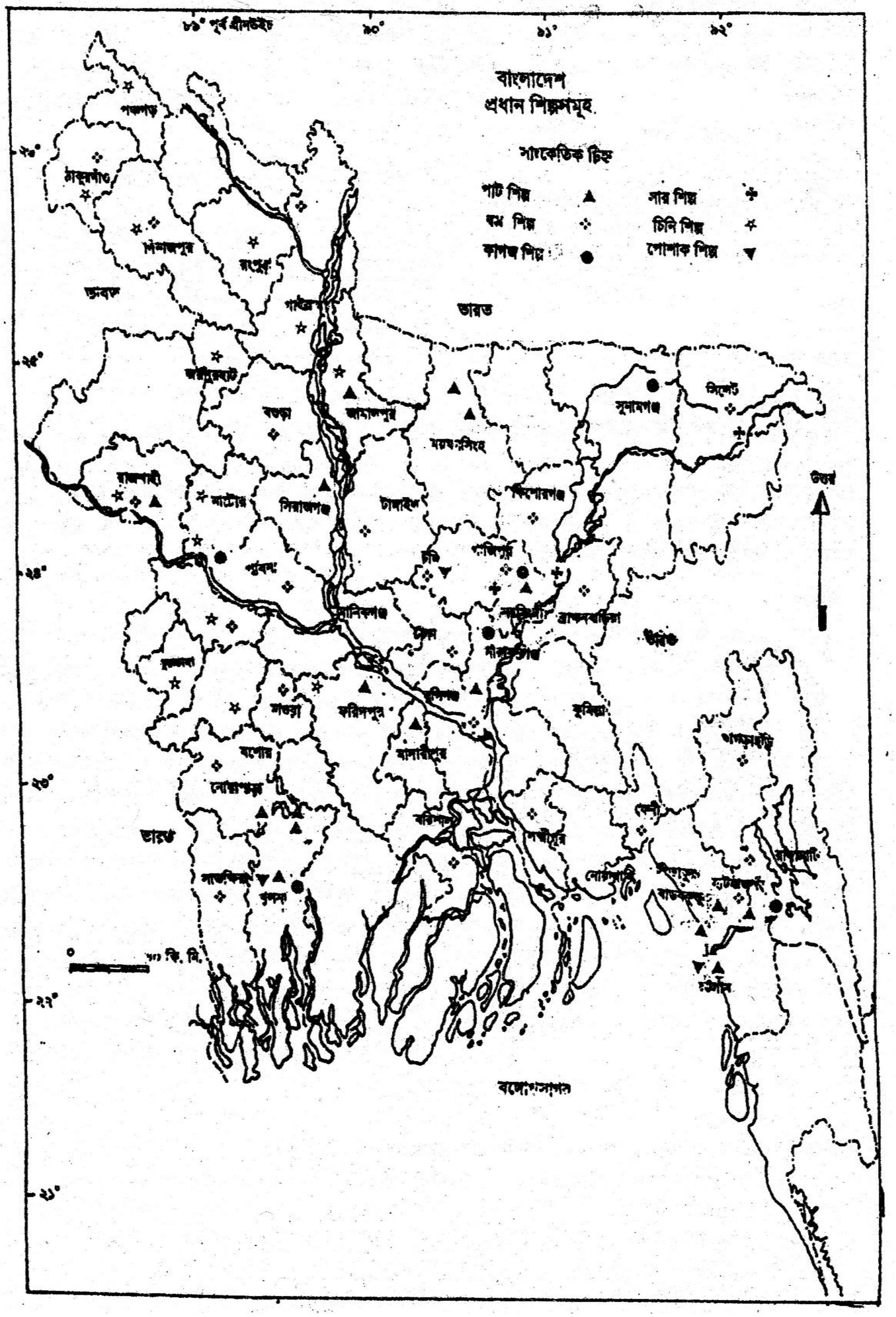

চিত্র-৩.৮.১ : বাংলাদেশ এর প্রধান শিল্পসমূহ

রপ্তানীকৃত দেশসমুহঃ

বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশী পোশাক রপ্তানী হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এরপরে রয়েছে জার্মানীর অবস্থান। এরপরে যথাক্রমে ফ্রান্স, ইতালি, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, বেলজিয়াম, স্পেন ও অন্যান্য দেশ। বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্প বিকাশের অনুকুল পরিবেশ বিদ্যমান। অন্যান্য নিয়ামকের মধ্যে স্বল্প মজুরীতে শ্রমশক্তির সহজলভ্যতা অন্যতম। পোশাক শিল্পকে বর্তমানে বলা হয় "বিলিয়ন ডলার" শিল্প।

বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পের অবস্থান হলো নদী তীরবর্তী এলাকা সমূহ এবং নগরীর উপকণ্ঠসমূহ।	বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প হচ্ছে বস্ত্র শিল্প।
বাংলাদেশের চিনি শিল্পের প্রধান সমস্যা হলো আখ সরবরাহের অনিশ্চয়তা।	পোষাক শিল্পকে বলা হয় "বিলিয়ন ডলার" শিল্প।

পাঠ সংক্ষেপঃ

বাংলাদেশে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশের শিল্পসমূহ হলো- পাট শিল্প, কাগজ শিল্প, বস্ত্রশিল্প, সার শিল্প, চিনি শিল্প, পোষাক শিল্প, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি। পাট থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, স্যান্ডেল, শোপিস প্রভৃতি তৈরী করা হয়। বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প হচ্ছে বস্ত্র শিল্প। বাংলাদেশের ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে। কাগজ উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাঁশ, নরম কাঠ, নলখাগড়া, আখের ছোবরা প্রভৃতি। বাংলাদেশ কাগজ ও কাগজ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে দেশের অধিকাংশ চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরে কিছু নিউজপ্রিন্ট রপ্তানী করে। পোষাক শিল্পকে বলা হয় " বিলিয়ন ডলার " শিল্প।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৮

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত ---------------- নির্ভর।
১.২ বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্প কারখানা -------------------- তীরবর্তী এলাকায় গড়ে উঠেছে।
১.৩ বাংলাদেশের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় ----------------------- নগরে।
১.৪ --------------------- সালে বাংলাদেশে প্রথম কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়।
১.৫ বাংলাদেশে বর্তমানে ---------------------- টি সারকারখানা আছে।
১.৬ চিনি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো ----------------------।
১.৭ গত ২০০২ সালে পোষাক শিল্প মোট রপ্তানীতে ----------------- শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।
১.৮ বিলিয়ন ডলার শিল্প বলা হয় ----------------------- কে।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কি নির্ভর?
ক) কৃষি খ) শিল্প
গ) বাণিজ্য ঘ) রপ্তানি

২.২ বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্পকারখানা কোন এলাকায় গড়ে উঠেছে?
ক) উপকূলে খ) নদীর তীরে
গ) সমুদ্রের নিকট ঘ) গ্রাম এলাকায়

২.৩ পাট শিল্প গড়ে উঠার পেছনে নিচের কোন উপাদানসমূহ বেশী ভূমিকা রাখে?
ক) জলবায়ু খ) ভূ-প্রকৃতি
গ) মৃত্তিকা ঘ) উপরের সবগুলোই

২.৪ বস্ত্র শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কি?
ক) পাট খ) তুলা
গ) সার ঘ) চিনি

২.৫ কাগজ উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে নীচের কোনটি ব্যবহৃত হয় না?
ক) বাঁশ খ) নরম কাঠ
গ) পাটকাঠি ঘ) সুন্দরী গাছ

২.৬ বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ফেঞ্চুগঞ্জ খ) আশুগঞ্জ
গ) ঘোড়াশাল ঘ) চট্টগ্রাম

২.৭ বাংলাদেশের অধিকাংশ চিনিকলগুলো কোথায় অবস্থিত?
ক) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে খ) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে
গ) দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ঘ) দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে

২.৮ বাংলাদেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস শিল্প কোথায় অবস্থিত?
ক) ঢাকা শহর খ) চট্টগ্রাম শহর
গ) খুলনা শহর ঘ) বরিশাল শহর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিনঃ

১. বাংলাদেশে কি কি শিল্প কারখানা আছে?
২. বাংলাদেশের পাট শিল্প গড়ে উঠার পেছনে প্রধান কারণ কি কি?
৩. বর্তমানে বাংলাদেশে কয়টি চিনি কল আছে?
৪. পোষাক শিল্পকে কেন “বিলিয়ন ডলার” শিল্প বলা হয়?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ কি কি? জাতীয় উন্নয়নে এসব শিল্পের অবদান সংক্ষেপে বর্ননা করুন।

পাঠ-৩.৯

বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও বাণিজ্য
Transport & Trade of Bangladesh

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- ◆ বাংলাদেশের পরিবহন ও যাতায়াত সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ◆ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- ◆ বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের সমস্যাবলী ও রপ্তানী বানিজ্য বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

আধুনিক যুগে পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে যাতায়াত ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যাতায়াত ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে সভ্যজগতে কাজকর্ম চালানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সহজ কথায়, যাতায়াত ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন স্থানে **যোগাযোগের** মাধ্যমে এবং **মালপত্র ও লোক** চলাচলের মাধ্যমে। বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থাকে **তিন** ভাগে ভাগ করা যায়: যথা- স্থল পরিবহন, জল পরিবহন এবং আকাশ পরিবহন। স্থল পরিবহন আবার দুই প্রকার, যথা- রেলপথ ও সড়ক পথ। তবে বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হবার কারণে অসংখ্য খাল-বিল ও নদ-নদী জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে।

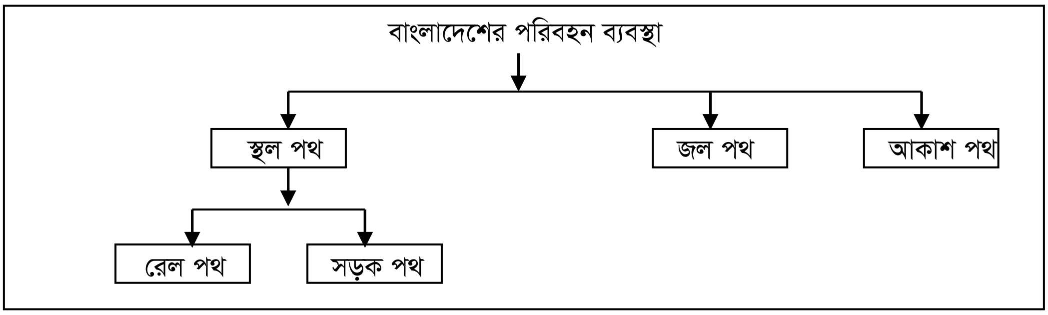

নিম্নে বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থার বিবরণ দেয়া হল:

১. স্থল পথ:

বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থাকে ৩(তিন) ভাগে ভাগ করা যায়।

স্থল পথে যাতায়াত বলতে বোঝায় সড়ক পথ ও রেল পথে যাতায়াত। সড়ক পথে যাতায়াতের যানবাহন হল- বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি, মোটর সাইকেল, রিক্সা, সাইকেল, অটোরিক্সা প্রভৃতি। রেল পথে রেলগাড়ি যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ক. সড়ক পথ:

অসংখ্যা নদীনালা, খালবিল, বৃষ্টি পাতের আধিক্য, ভূ-প্রাকৃতিক গঠন এবং আর্থিক অসুবিধা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশে সড়ক নির্মাণ ও মেরামত অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। ১৯৪৭ সালে দেশে পাকা রাস্তার পরিমাণ ছিল মাত্র ১,৯৩১.১৭ কিলোমিটার। এর মধ্যে সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী সড়ক পথ ছিল মাত্র ২৮৬.২৩ কিলোমিটার। নিম্নের সারনীতে সড়ক ও পরিবহন অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে বিভিন্ন ধরনের সড়কের উপাত্ত (১৯৯৪-২০০৩) পর্যন্ত তুলে ধরা হল:

৩.৯.১. সারনী বিভিন্ন প্রকার সড়ক পথের দৈর্ঘ্য (কি. মি.) : (১৯৯৪-২০০৩)

সাল (জুন ৩০ পর্যন্ত)	জাতীয় সড়ক (কি. মি)	আঞ্চলিক সড়ক (কি. মি)	সংযোগ সড়ক এ ধরণ (কি. মি)	মোট (কি. মি.)
১৯৯৪	২৯২০	১৬৮৭	১১০৬৩	১৫৬৭০
১৯৯৫	২৯২০	১৭০০	১১৪৫০	১৫৬৭০
১৯৯৬	২৯২০	১৭০০	১২৯৩৪	১৭৫৫৪
১৯৯৭	২৯২০	১৭০০	১৫৫৬	২৬২৭৬
১৯৯৮	৩১৪৪	১৭৪৬	১৫৯৬৪	২০৮৫৪
১৯৯৯	৩০৯০	১৭৪২	১৬১১৬	২০৯৫৮
২০০০	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০১	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০২	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০৩	৩৪২০	৪২৪১	১৬১৩৮	২০৭৯৯

উৎস: সড়ক ও পরিবহন অধিদপ্তর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলে লক্ষ্য করা যায় যে, সড়ক পথে যান্ত্রিক যানবাহনের পাশাপাশি বহু সংখ্যক পুরাতন যানবাহন যথা-রিক্সা, গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশের সড়কপথের একটি বৈশিস্ট্য হলো-নদীর কারণে সড়ক পথগুলো বহু জায়গায় বিচিছন্ন। এর জন্য সড়কপথে সংযোগ রাখার জন্য ফেরী সার্ভিসের প্রবর্তন করা হয়েছে। যমুনা বহুমুখী সেতুর মাধ্যমে দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে সংযোগ করা হয়েছে। দেশের সড়ক পথের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (BRTC) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। সড়কগুলো জাতীয় জনপথ, জেলা রাস্তা, পৌরসভার রাস্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তা নামে বিভক্ত।

খ. রেলপথ:

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশ রেলপথের পরিমাণ ছিল প্রায় ২,৮৫৭ কিলোমিটার। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশে ২,৭০৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ ছিল। ২০০১-০২ সালে বাংলাদেশে ২,৭৬৮.৩৭ কিলোমিটার রেলপথ ছিল। (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩, সারনী ৩৭, পৃষ্ঠা-২০১)। এটি বাংলাদেশ রেলপথ নামে পরিচিত। এ রেলপথ দুই ধরনের। যথা-ব্রডগেজ এবং মিটার গেজ।

বাংলাদেশ ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রায় ৮৮৪ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে ৯৩৬.২৫ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ আছে। এ ধরনের রেলপথ খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত। এছাড়া ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলায় সামান্য ব্রডগেজ রেলপথ আছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১,৮২২ কিলোমিটার মিটারগেজ রেলপথ ছিল এবং বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৮৩২,১২ কিলোমিটার মিটারগেজ। এর অধিকাংশ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে অবস্থিত, বাংলাদেশে ব্রডগেজ ও মিটারগেজ রেলপথ যমুনা নদী দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে সম্পূর্ণ মিটারগেজ রেলপথ, পশ্চিম ভাগে ৯৩৬.২৫ কিলোমিটার ব্রডগেজ এবং অবশিষ্টাংশ মিটারগেজ। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং বরিশাল, পটুয়াখালি, বরগুনা ব্যতীত দেশের সব জেলাতেই রেলপথ রয়েছে। বাংলাদেশে রেলপথে সর্বমোট ৪৫৯টি রেলস্টেশন আছে। (উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক-২০০১, সারনি ৮.০১)। এর মধ্যে লাকসাম, আখাউড়া, ময়মনসিংহ, ভৈরববাজার, ঈশ্বরদী, পার্বতীপুর, সান্তাহার এবং ঢাকার কমলাপুর জংশনের নাম উল্লেখ যোগ্য। রাজধানী ঢাকা থেকে রেলপথ যোগে দেশের প্রায় সব গুরূত্বপূর্ণ শহরে যাতায়াত করা যায়।

বাংলাদেশের রেলপথে সর্বমোট ৪৫৯টি রেলস্টেশন আছে।

সারণীঃ ৩.৯.২: বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকান্ড

বিষয় সমূহ	৯৮-৯৯	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২	০২-০৩
যাত্রী পরিবহন (মিলিয়ন)	৩৬৭৫.০০	৩৯৪০.৬৯	৪২০৯.০১	৩৯৭২.০০	৪০২৪.২১
পন্য পরিবহন টন কি.মি. (মিলিয়ন)	৪৯৬.৪০	৭৭৭.১০	৯০৭.৮৮	৯৫১.৮২	৯৫১.৯৯
রেলইঞ্জিনের সংখ্যা	২৭৯	২৬৮	২৭৭	২৭৭	২৭৫
পন্য পরিবহনের ওয়াগনের সংখ্যা	১২৮৭	১২৮২	১২৭৫	১২৭২	১২৭৩
করআদায় (কোটি টাকা)	১১১৫২	৪০৯২	১০৭৭৮	১০৬৩১	১০৬০৫
অন্যান্য কোচ সমূহের সংখ্যা	১৩৯	১৩৭	১৩৬	১৩৫	১৩৭
করের জন্য ব্যয় (কোটি টাকা)	৪১৬.১৫	৪৬৯.৮৬	৫২৩.৮৮	৫৩৫.৪৮	৪২০.১০

উৎস: বাংলাদেশ রেলওয়ে, যোগাযোগ মন্ত্রনালয় ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩

২. জলপথ:

নদীপথে সাধারনত নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার এবং সমুদ্র পথে জাহাজ চলাচল করে।

ক. নদীপথ:

এদেশে রয়েছে অসংখ্য নদী-খাল-বিল। কিন্তু দেশের সব গুলো নদীই নাব্য নয়। বাংলাদেশে প্রায় ৮৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ আভ্যন্তরীন নাব্য জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪০০ কিলোমিটার সারা বছর নৌ পলাচলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নদীপথে ছোট ছোট নৌকা থেকে শুরু করে লঞ্চ, স্টীমার, সী-ট্রাক, ফেরী, ট্যাঙ্কার, কোস্টার প্রভৃতি যানবাহন যাতায়াত করে। সাধারনত দেশের দক্ষিন ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ-চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। তাই গুরূত্বপুর্ন নদী বন্দরগুলো এ অঞ্চলে অবস্থিত। এর মধ্যে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী ও খুলনা অন্যতম। অন্যান্য নদীবন্দরের মধ্যে ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, মীরকাদিম, আরিচা ও সিরাজগঞ্জের নাম উল্লেখযোগ্য।

খ. সমুদ্র পথঃ

সমুদ্রপথ ব্যবসা বানিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এ পথে সাধারনত ভারী ওজনের ও বৃহৎ আকারের পণ্য সামগ্রী বহন করা হয়। সমুদ্রপথে একদেশ থেকে অন্যদেশের সঙ্গে ব্যবসা বানিজ্য করা হয়। বাংলাদেশে ব্যবসা বানিজ্যের সুবিধার জন্য রয়েছে দুইটি সমুদ্রবন্দর। একটি হলো চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং অন্যটি মংলা সমুদ্রবন্দর। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কর্নফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয়। এ বন্দরের সঙ্গে রেল ও সড়ক পথের যোগাযোগ রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে অনেকগুলো জেটি রয়েছে এবং প্রায় ২৪ টির মতো জাহাজ এক সঙ্গে ভিড়তে পারে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ বানিজ্য এ বন্দরের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। মংলা সমুদ্রবন্দর খুলনা শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দক্ষিনে পশুর নদীর তীরে অবস্থিত। এ বন্দরের সঙ্গে নদীপথ ও সড়কপথের যোগযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রায় ৮৪০০ কি. মি. দীর্ঘ অভ্যন্তরীন নাব্য জলপথ রয়েছে।

৩. বিমান পথ

৩. বিমানপথকে আকাশপথও বলা হয়। আধুনিক যুগে বিমানে যাতায়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। দ্রুত যাত্রী ও পন্য চলাচলের জন্য বিমানই সবচেয়ে ভাল মাধ্যম। বিমানপথ বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ন স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশ দুই ধরনের বিমান সার্ভিস দেখা যায়। যথা- অভ্যন্তরীন বিমান সার্ভিস ও আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় বিমান চলাচল করার নামই হলো অভ্যন্তরীন বিমান সার্ভিস। অভ্যন্তরীন বিমান ব্যবস্থায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর, কক্সবাজার, ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম থেকে যশোর, কক্সবাজার, সিলেট, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। অপরপক্ষে, বাংলাদেশ বিমান যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলাচল করে তখন তাকে বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক সার্ভিস বলা হয়। আন্তর্জাতিক রুটে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করা যায়। ঢাকার কুর্মিটোলা একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এর নাম হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এটি বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর। এর পরেই রয়েছে চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বাংলাদেশ বিমান সংস্থার নাম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

বাণিজ্য (Trade)

মানুষের অভাব ও চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলীকে বাণিজ্য বলে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাণিজ্য দেশের অর্থনীতিতে গুরূত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। প্রাচীনকালে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু না থাকার কারনে পন্য বিনিময়ের মাধ্যমে বাণিজ্যের সূচনা হয় পণ্য-দ্রব্যের আদান-প্রদানের নামই হলো বাণিজ্য। বানিজ্যের ধরন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বাণিজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:- ১) অভ্যন্তরীন বাণিজ্য ও ২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

১. অভ্যন্তরীন বানিজ্যঃ

দেশের ভেতর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যখন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীন বাণিজ্য বলে।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যঃ

এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের পন্য যখন ক্রয়-বিক্রয় বা আদান প্রদান হয় তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক বানিজ্য আবার দুই ধরনেরঃ যথা- ক) আমদানি বানিজ্য ও খ) রপ্তানি বানিজ্য।

আমদানি বানিজ্যঃ

দেশের চাহিদা মিটানোর জন্য যখন অন্য দেশ থেকে স্বদেশে কোন পন্য সামগ্রী আনা হয় তখন তাকে আমদানি বানিজ্য বলে। উদাহরন স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে- বাংলাদেশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শিশু খাদ্য, কলকব্জা, খাদ্যসামগ্রী, শিল্পের কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য, ওষুধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, ভোগ্যপন্য প্রভৃতি আমদানি করে দেশের ঘাটতি পূরন করতে হয়। নিম্নে বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো:-

অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপন্যঃ

খাদ্য দ্রব্যের ঘাটতি পূরনের জন্য চাল, গম, ভোজ্য তেল, শিশু খাদ্য, তেলবীজ প্রভৃতি আমদানি করতে হয়।

শিল্পজাত দ্রব্যাদিঃ

শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কয়লা, সিমেন্ট, ডিজেল, পেট্রোল, তুলা, সুতা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি প্রধান আমদানি দ্রব্য।

যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালঃ

কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে অনুন্নত। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি যন্ত্রাতি, কীটনাশক ওষুধ, উন্নত বীজ ও সার প্রভৃতির প্রয়োজন। অন্যদিকে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল প্রভৃতি দরকার। সে জন্য এ সব দ্রব্যাদি আমদানি করা হয়।

এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ ওষুধপত্র, কাঁচ, মোটরগাড়ি, সাইকেল, রেডিও, ঘড়ি, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, বাস, ট্রাকের চেসিস, রবারজাত দ্রব্য প্রভৃতি পন্য সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করে। বাংলাদেশ পৃথিবীর যে সকল দেশ থেকে সাধারনত পন্য আমদানি করে থাকে সেগুলো হলো- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত, জাপান, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, চীন, তাইওয়ান প্রভৃতি।

রপ্তানী বাণিজ্যঃ

স্বদেশের কোন পন্য যখন অন্য কোন দেশে পাঠানো হয় তখন তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে। উদাহরন হিসেবে বলা যায়- বাংলাদেশের তৈরী পোশাক, পাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। নিচে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্যাদির বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

তৈরী পোশাকঃ

বর্তমানে তৈরী পোশাক রপ্তানী করে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ১৯৯৭-৯৮ সালে ১২,৯২৪ কোটি টাকার এবং ২০০১-২০০২ সালে ১৭,৯৪৭ কোটি টাকার তৈরী পোশাক রপ্তানি করা হয়।

কাঁচাপাটঃ

বিশ্বের মোট উৎপাদিত পাটের শতকরা ৭৫ ভাগ এক সময় বাংলাদেশ উৎপন্ন হত। যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের কাঁচাপাটের প্রধান ক্রেতা।

পাটজাত দ্রব্যঃ

বাংলাদেশের পাটকলে উৎপাদিত চট, থলে, বস্তা, গালিচা, প্রভৃতি বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ পাটজাত দ্রব্য থেকে অর্জিত হয়। জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী হয়।

চাঃ

বাংলাদেশে মোট ২৫৮টি চা বাগান আছে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চা এর স্থান ষষ্ঠ। বাংলাদেশে মোট ১৬২টি চা বাগান আছে বাংলাপেডিয়া (২০১২)। যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস, জাপান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশের চা রপ্তানী করে থাকে।

চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যঃ

বাংলাদেশ প্রতি বছর গরু, মহিষ ও ছাগলের চামড়া রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য চতুর্থ স্থানের অধিকারী। প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি, বেলজিয়াম, প্রভৃতি দেশের বাংলাদেশের চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানী করে।

মাছ ও হিমায়িত খাদ্যঃ

বাংলাদেশ থেকে টাটকা ও শুকনা মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী রপ্তানী করা হয়।

সারনীঃ ৩.৯.৩: বাংলাদেশের রপ্তানীর মাধ্যমে আয় (১৯৯৮-২০০২) (মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার)

পন্য দ্রব্যাদি	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-০০	০০-০১	০১-০২
১) তৈরী পোশাক	২৮৪৩	২৯৮৫	৩০৮৩	৩৩৬৪	৩১২৫
২) পাট ও পাটজাত দ্রব্য	৩৮৯	৩৭৬	৩৩৮	২৯৭	৩০৫
৩) হিমায়িত খাদ্য	২৯৪	২৭৪	৩৪৪	৩৬৩	২৭৬
৪) চামড়া	১৯০	১৬৮	১৯৫	২৫৪	২০৭
৫) রাসায়নিক দ্রব্য	৭৪	৭৯	৯৪	৯৭	৬৭
৬) চা	৪৭	৩৯	১৮	২২	১৭
৭) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৬	৮	৫	৭	৬
৮) কাগজ ও পহজত দ্রব্য	-	-	-	১	-
৯) অন্যান্য	১৩২৯	১৩৯৫	১৬৭৫	২০৬২	১৯৮৩
মোট	৫১২৭	৫৩২৪	৫৭৫২	৬৪৬৭	৫৯৮৬

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারনী ৪২ এবং রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বানিজ্য মন্ত্রনালয়।

কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট:

দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ প্রতিবছর কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট রপ্তানী করে থাকে।

অন্যান্য:

অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্যগুলো হলো ফার্নেস তেল, হস্তশিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্য প্রভৃতি। নিম্নে সারণীতে বাংলাদেশের আমদানী খাতে অর্থব্যয় এবং রপ্তানী খাতে অর্থ উপার্জনের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো:

সারনীঃ ৩.৯.৪ : বাংলাদেশের আমদানী ও রপ্তানী ১৯৯৫-২০০৩ (মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার)

সাল	আমদানী ব্যয়	রপ্তানী আয়
১৯৯৫-৯৬	৬৯৪৭	৩৮৮৪
১৯৯৬-৯৭	৭১৫২	৪৪২৭
১৯৯৭-৯৮	৭৫২০	৫১৭২
১৯৯৮-৯৯	৮০০৬	৫৩২৪
১৯৯৯-২০০০	৮৩৭৪	৫৭৫২
২০০০-২০০১	৯৩৩৫	৬৪৬৭
২০০১-২০০২	৮৫৪০	৫৯৮৬
২০০২-২০০৩	৯৬৫৮	৬৫৪৮.৪৪

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, সারনী ৪২ ও ৪৩

আমাদের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার হচ্ছেনা। এর ফলে আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হচেছ। বৈদেশিক বানিজ্যে রপ্তানী বৃদ্ধি করে আমাদের অর্থনীতিকে উন্নত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, রপ্তানী শুল্ক হ্রাস, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, রপ্তানীযোগ্য পন্যের ব্যাপক ব্রাপক প্রচার প্রভৃতি অপরিহার্য।

বাংলাদেশের রপ্তানী বানিজ্যের সমস্যাবলী:

বাংলাদেশের রপ্তানী বানিজ্যের যে সকল সমস্যা রয়েছে তা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. সুষ্ঠ রপ্তানী নীতির অভাব:

বাংলাদেশের রপ্তানী বানিজ্যের অন্যতম সমস্যা হলো সুষ্ঠু বাণিজ্য নীতির অভাব। স্বল্পমেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি বিদ্যমান থাকায় বাণিজ্য নীতি প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। যার ফলস্বরূপ রপ্তানীকারকদের বিশেষ অসুবিধা হয়।

২. স্বল্পসংখ্যক রপ্তানী দ্রব্য:

বাংলাদেশের রপ্তানী পন্যের সংখ্যা কম বলে রপ্তানী বানিজ্যের আয় খুবই কম। এ রপ্তানী পন্যের মধ্যে কেবল পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, তৈরী পোশাক, অপ্রচলিত পন্য প্রভৃতি প্রধান। তাই রপ্তানীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. নিম্নমানের রপ্তানী পন্য:

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাপূর্ন বাজারে পন্যের ভাল বাজার পেতে হলে পন্যের মান উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের পন্য অত্যন্ত নিম্নমনের হবার কারনে বিশ্ববাজারে এই পন্যের চাহিদা বেশ কম।

৪. উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি:

শ্রমিক অসন্তোষ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশী পন্যের উৎপাদন ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে প্রতিযোগিতাপূর্ন বাজারে বাংলাদেশী পন্য টিকে থাকতে পারছে না।

৫. প্রচারের অভাব:

প্রচারের মাধ্যমে পন্যের বাজার সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশী পন্যের প্রচার অত্যন্ত সীমিত।

৬. জাহাজের অভাব:

পন্য রপ্তানীর জন্য বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় জাহাজের খুবই অভাব। ফলে বিদেশী জাহাজের উপর সর্বদা নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। এতে একদিকে যেমন পরিবহন খরচ বেশী পড়ে, অন্য দিকে সময়মত মালপত্র যথাস্থানে প্রেরন করা সম্ভব হয় না। ফলে রপ্তানী বাণিজ্য ব্যাহত হয়।

বাংলাদেশের রপ্তানী বৃদ্ধির উপায়সমূহ:

বাংলাদেশের রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা বা পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. রপ্তানী যোগ্য পন্যের উৎপাদন বৃদ্ধি:

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম রপ্তানীযোগ্য পন্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এরজন্য পাট, চা, তামাক, প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের এবং কলকারখানায় শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

২. উৎপাদন ব্যয়হ্রাস:

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য পন্যের উৎপাদন ব্যয়হ্রাস করা প্রয়োজন।

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন ব্যয়হ্রাস করা প্রয়োজন। উৎপাদন খরচ কম হলে কম মূল্যে বিদেশে পন্য রপ্তানী করা যায়। ফলে বিদেশে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বাজার প্রসারিত হয়। সাধারণত উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিভিন্ন পন্যের উৎপাদন খরচহ্রাস করা যায়।

৩. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি:

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে অল্প সময়ে কম খরচে পন্যদ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী করা যায়। এর ফলে রপ্তানীর পরিমান বৃদ্ধি পায়।

৪). বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন:

সর্বোপরি বাংলাদেশের রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা উচিত।

পাঠ সংক্ষেপ:

আধুনিক যুগে পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে যাতায়াত ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করে। দেশের সড়ক পথের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (BRTC) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে রেলপথে মোট ৪৫৯টি রেলস্টেশন আছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ বাণিজ্য চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বাণিজ্যের ধরন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বাণিজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল প্রভৃতি দরকার। রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রথম রপ্তানীযোগ্য পন্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১ যাতায়াত ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন স্থানে .... মাধ্যম এবং .... চলাচলের মাধ্যম।

১.২ বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থাকে .... ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১.৩ স্থলপথে যাতায়াত বলতে বুঝায় .... ও .... যাতায়াত।

১.৪ দেশের সড়কপথের উন্নয়নের জন্য .... নামে একটি সংস্থা আছে।

১.৫ বাংলাদেশের রেলপথে সর্বমোট .... টি রেলস্টেশন আছে।

১.৬ বাংলাদেশে প্রায় .... কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীন নাব্য জলপথ রয়েছে।

১.৭ চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের .... বলা হয়।

১.৮ বাণিজ্যের ধরণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বানিজ্যকে .... ভাগে ভাগ করা যায়।

১.৯ স্বদেশের পন্য যখন অন্যকোন দেশে পাঠানো হয় তখন তাকে .... বলে।

১.১০বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চা এর স্থান ....।

১.১১ বাংলাদেশের রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে ....বানিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা উচিত।

২. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

২.১ বাংলাদেশের যাতায়াত/পরিবহন ব্যবস্থাকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায়?
ক. চার ভাগে খ. পাঁচ ভাগে গ. দুই ভাগে ঘ. তিন ভাগে

২.২ চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. সুরমা নদী খ. সাঙ্গু নদী গ. মেঘনা নদী ঘ. কর্নফুলী নদী

২.৩ বানিজ্যের ধরন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বানিজ্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে গ. চার ভাগে ঘ. কোনটিই নয়

২.৪ দেশের চাহিদা মিটানোর জন্য অন্য দেশ থেকে স্বদেশে কোনো পন্য সামগ্রী আনা হয় তখন তাকে কি বলে?
ক. রপ্তানী বাণিজ্য খ. আমদানি বাণিজ্য গ. রপ্তানী ও আমদানি বাণিজ্য ঘ. কোনটিই নয়

২.৫ বাংলাদেশে মোট কতটি চা বাগান আছে?
ক. ১৫৫টি খ. ১৫৯টি গ. ১৬২টি ঘ. ১৮০টি ২.৬
বাংলাদেশের রপ্তানীবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে কি ধরনের বানিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা উচিত?
ক. সল্পমেয়াদী খ. দীর্ঘ মেয়াদী গ. উভয় ঘ. কোনটিই নয়

সংক্ষিপ্ত উত্ত দিন:

১. বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থার শ্রেনীবিভাগ করুন।
২. সংক্ষেপে বাংলাদেশের রেলপথের বিবরন দিন।
৩. বানিজ্য কি? বানিজ্যের শ্রেনীবিভাগ করে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. বাংলাদেশের আমদানি পন্য ও পপ্তানী দ্রব্যের নাম লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থার শ্রেনীবিভাগ উল্লেখ পূর্বক বিবরন দিন।
২. বাংলাদেশের রপ্তানী বানিজ্যের সমস্যাবলি ও রপ্তানী বৃদ্ধির উপায়সমূহ লিখুন।

ইউনিট-৩

উত্তরমালা

পাঠ ৩.১

২.১. ক, ২.২. ঘ, ২.৩. খ, ২.৪. গ, ২.৫. খ

পাঠ ৩.২

২.১. খ, ২.২. ক, ২.৩. ঘ, ২.৪. খ, ২.৫. ক, ২.৬. ক, ২.৭. গ

পাঠ ৩.৩

২.১. ঘ, ২.২. ক, ২.৩. গ, ২.৪. গ, ২.৫. খ, ২.৬. ক, ২.৭. গ

পাঠ ৩.৪

২.১. খ, ২.২. ক, ২.৩. ক, ২.৪. খ

পাঠ ৩.৫

২.১. ঘ, ২.২. ঘ, ২.৩. গ, ২.৪. গ, ২.৫. ক, ২.৬. গ, ২.৭. ঘ

পাঠ ৩.৬

২.১. ক, ২.২. ক, ২.৩. খ, ২.৪. গ, ২.৫. গ

পাঠ ৩.৭

২.১. ক, ২.২. ঘ, ২.৩. খ, ২.৪. খ, ২.৫. খ, ২.৬. ক, ২.৭. ঘ

পাঠ ৩.৮

২.১. ক, ২.২. খ, ২.৩. ঘ, ২.৪. খ, ২.৫. ঘ, ২.৬. ক, ২.৭. খ, ২.৮. ক

পাঠ ৩.৯

১.১. যোগাযোগের, মালপত্র ও লোক
১.২. তিন
১.৩. সড়ক পথ, রেলপথ
১.৪. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা
১.৫. ৪৫৯
১.৬. ৮৪০০
১.৭. প্রবেশদ্বার
১.৮. দুই
১.৯. রপ্তানী বাণিজ্য
১. ১০. ষষ্ঠ
১.১১. দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী

২.১. ঘ, ২.২. ঘ, ২.৩. ক, ২.৪. খ, ২.৫. গ, ২.৬. খ

গ্রন্থপুঞ্জি

References

ইউনিট-১

পাঠ ১ঃ বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুদয়

(Geo-political evolution of Bangladesh)

১. হক লুতফুল (১৯৯৪), গোষ্ঠী ঘর ও মানব ভবিতব্য ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বরাজনীতি, নাদিয়া প্রকাশনী, ঢাকা।
২. তাহা, আবু (১৯৮৮), রাজনৈতিক ভূগোল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন বোর্ড, রাজশাহী।
৩. তাহা, আবু (১৯৯৯), জনসংখ্যা ও জনপদ ভূগোল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন বোর্ড, রাজশাহী।
৪. Ahmed, N. (1968), Geography of East Pakistan, O.U.P. Dhaka
৫. Rashid, H. (1990), Economy of Bangladesh, O.U.P. Dhaka.
৬. OHK. Spate & A.T.A Learmounth. (1967): India and Pakistan: A General & Regional Geogaphy, 3rd ed. Methuene, London.
৭. D.N. Wadia (1968) Geology of India.
৮. রাইছ উদ্দিন, মোঃ (১৯৮৮), বাংলাদেশের ইতিহাস, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ঢাকা।
৯. Eaton, R.M. (2004), The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204-1760, Scholarship edition, Ca. University.

পাঠ ২ঃ বাংলাদেশের ভূ-সংস্থান

(Topography of Bangladesh)

১. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত- (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১ম খন্ড, ঢাকা।
২. চৌধুরী, মোঃ হোঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ঢাকা।
৩. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৮৮), অর্থনৈতিক ভূগোল, বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাবিঃ সংরস্করণ।
৪. রাইছ উদ্দিন (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস।
৫. Ahmed, N. (1968), Geography of East Pakistan, O.U.P. Dhaka.
৬. Rashid, H. (1990), Economy of Bangladesh, O.U.P. Dhaka.

পাঠ ৩ঃ বাংলাদেশের জলবায়ু

(Climate of Bangladesh)

১. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত- (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১ম খন্ড, ঢাকা।
২. চৌধুরী, মোঃ হোঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ঢাকা।
৩. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৮৮), অর্থনৈতিক ভূগোল, বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাবিঃ সংরস্করণ।
৪. রাইছ উদ্দিন (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস।
৫. Ahmed, N. (1968), Geography of East Pakistan, O.U.P. Dhaka.
৬. Rashid, H. (1990), Economy of Bangladesh, O.U.P. Dhaka.

ইউনিট-২

পাঠ ১ঃ বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাঃ একটি প্রেক্ষিত

১. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
২. মিঞা, মঃ (1988) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৩. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।
৫. Mukherjee R.K. (1938): The Changing Face of Bengal: A Study of River in Economy, Calcuta: University of Calcuta.
6. Mojumder, S.C. (1942): Rivers of the Bengal Delta, Calcuta: Univesity of Calcutta Press.
7. Bagchi, K. (1944): The Ganges Delta, Calcuta: Univesity of Calcuta.

পাঠ ২ঃ গঙ্গা-পদ্মানদী ব্যবস্থা

১. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
২. মিঞা, মঃ (1988) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৩. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।
৫. Mukherjee R.K. (1938), The Changing Face of Bengal: A Study of River in Economy, Calcuta: University of Calcuta.
৬. Mojumder, S.C. (1942), Rivers of the Bengal Delta, Calcuta: Univesity of Calcutta Press.
৭. Bagchi, K. (1944), The Ganges Delta, Calcuta: Univesity of Calcuta.

পাঠ ৩ ঃ ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা

১. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
২. মিঞা, মঃ (1988) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৩. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।
৫ Mukherjee R.K. (1938): The Changing Face of Bengal: A Study of River in Economy, Calcuta: University of Calcuta.
৬. Mojumder, S.C. (1942): Rivers of the Bengal Delta, Calcuta: Univesity of Calcutta Press.
৭. Bagchi, K. (1944): The Ganges Delta, Calcuta: Univesity of Calcuta.

পাঠ ৪ ঃ মেঘনা-সুরমা নদী ব্যবস্থা

১. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
২. মিঞা, মঃ (1988) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৩. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।
৫. Mukherjee R.K. (1938): The Changing Face of Bengal: A Study of River in Economy, Calcuta: University of Calcuta.
৬. Mojumder, S.C. (1942): Rivers of the Bengal Delta, Calcuta: Univesity of Calcutta Press.
৭. Bagchi, K. (1944): The Ganges Delta, Calcuta: Univesity of Calcuta.

পাঠ ৫ ঃ বাংলাদেশে বন্যা

১. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
২. মিঞা, মঃ (1988) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৩. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।
৫. Mukherjee R.K. (1938): The Changing Face of Bengal: A Study of River in Economy, Calcuta: University of Calcuta.
৬. Mojumder, S.C. (1942): Rivers of the Bengal Delta, Calcuta: Univesity of Calcutta Press.
৭. Bagchi, K. (1944): The Ganges Delta, Calcuta: Univesity of Calcuta.

ইউনিট-৩

1. Ahmed, N. (1968), Geography of East Pakistan, O.U.P. Dhaka.
2. Rashid, H. (1990), Economy of Bangladesh, O.U.P. Dhaka.
৩. হোসেন, মোঃ ও অন্যান্য (১৯৯০)- Deluge in the Delta, Academic Publishers, Dhaka.
৪. মিঞা, মঃ (১৯৮৮) Floods in Bangldesh, Academic Publishers, Dhaka.
৫. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত- (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১ম খন্ড, ঢাকা।
৬. চৌধুরী, মোঃ হোঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ ঢাকা।
৭. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১৯৮৮), অথৎনতিক ভূগোল, বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাবিঃ সংরস্করণ।
৮. রাইছ উদ্দিন (১৯৯৩), বাংলাদেশের ইতিহাস।
৯. হাসান, সাঃ (১৯৮৩), বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১০. ৪. ওয়াজেদ, মঃ (১৯৯০), বাংলাদেশের নদীমালা, শান্তিনগর, ঢাকা।

ইউনিট-১

সংখ্যাতাত্ত্বিক ভূগোল
(Quantitative Geography)

তথ্যের উৎস
(Source of Data)

পরিসংখ্যান সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য একটি মাত্র সংজ্ঞা দেওয়া সহজসাধ্য নয়। ব্যবহারগতভাবে পরিসংখ্যান বলতে সংখ্যাগত তথ্য বুঝিয়ে থাকে। যেমন: জনসংখ্যা পরিসংখ্যান বা কৃষি পরিসংখ্যান। প্রযুক্তিগতভাবে পরিসংখ্যানকে প্রায়োগিক গণিতের একটি শাখা বুঝিয়ে থাকে, যেখানে সংখ্যাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মুখ্য উপজীব্য বিষয়। সমসাময়িককালে পরিসংখ্যানবিদ্যা বলতে গাণিতিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখাকে নির্দেশ করে যেখানে বিবিধ বিষয়ের সমগ্রকের পরিমান ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্ভাবতা তত্ত্বের সাহায্যে অনুমিত/প্রকল্পন ব্যবহার করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। আর এজন্য বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

তত্ত্বীয়ভাবে পরিসংখ্যান কৌশল ব্যবহারের ব্যাপকতার উপর বিষয়টির গুরুত্ব ও উপযোগিতা নির্ভর করে। অন্য কথায়, বিষয়টি এককভাবে প্রায় মূল্যহীন যদি না এর প্রয়োগিক ব্যবহার সম্ভব হয়। পরিসংখ্যানের বহুমুখিতার জন্য সমসাময়িককালে বিষয়টির প্রয়োগ সমাজ বিজ্ঞানের সকল শাখা থেকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে ব্যবহার ছাড়াও ইদানিং সাহিত্য ও কলা শাস্ত্রেও বিকাশ ঘটছে।

ভূগোল বিষয়ে পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহারের কাঁচামাল হচ্ছে তথ্য। এই ইউনিটে আপনি তথ্য এবং তথ্যের উৎস সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হচ্ছে-

পাঠ-১.১: *তথ্য এবং তথ্য উৎস*

পাঠ-১.২: *প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য -২*

পাঠ-১.৩: *মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য*

পাঠ-১.১

তথ্য এবং তথ্য উৎস
(Data & Source of Data)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- তথ্য;
- তথ্যের প্রকারভেদ;
- প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য;
- বহিরাঙ্গণ কৌশল; এবং
- ত্বরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

সাধারণত: তথ্য (Data) বলতে সংখ্যাগত উপাত্ত বা তথ্যমালাকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞানের শাখাগুলিতে তথ্য বলতে সামগ্রিকভাবে যে কোন উপাত্তকে সংখ্যাগত হোক বা না হোক বুঝিয়ে থাকে। তবে পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রধানত: সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করে থাকে এবং এই পুস্তকে তথ্য বলতে এই ধরনের উপাত্তকেও বুঝাবে। সারণী বা ছক আকারে বিবৃত একটি তথ্যমালাকে তথ্যসারি (Dataset) বলা হয়। যে কোন পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য এই ধরণের সংঘবদ্ধ তথ্যসারির প্রয়োজন হয়।

ভৌগোলিক সমীক্ষা, যেমন, জনসংখ্যার বিবরণ, ফসলের উৎপাদন বা চাষাবাদ, ভূমি ব্যবহার, রোগের বিন্যাস অথবা নদীর নাব্যতা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পর্যালোচনার জন্য নির্ভুল ও সম্পূর্ণ তথ্য প্রয়োজন। ধরা যাক, আপনার থানার গত ৪০ (চল্লিশ) বৎসরের জনসংখ্যার আকার ও বৃদ্ধি পর্যালোচনা করতে চান। এক্ষেত্রে আপনাকে বিভিন্ন উৎস থেকে এই 'অতীত' তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ, প্রাসঙ্গিকতাভেদে হয় নিজেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে অথবা অন্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করা যাবে। তবে, সাধারণত কোন সমীক্ষার জন্য উভয় পদ্ধতির সংযোগ ঘটানো হয়ে থাকে, তাতে সমীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও প্রায়োগিক মূল্য বৃদ্ধি পায়। এর আলোকে তথ্যের উৎসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ-

১. প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য ; এবং

২. মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য।

প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য (Primary Sources of Data)

একটি সমীক্ষা এলাকা থেকে যে তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয় তাকে প্রাথমিক তথ্য বা প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য বলা হয়। যেমন, ঢাকা মহানগরের একটি মানচিত্রে বস্তি চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিজে অথবা সাক্ষাৎগ্রহণকারীদের সাহায্যে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করলে একে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য বলা হবে। প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহিত তথ্যকে প্রাথমিক তথ্য (Primary Data) বলে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের তিন ধরণের পদ্ধতি রয়েছে ঃ

ক) বহিরাঙ্গণ কৌশল;

খ) ত্বরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়ন; এবং

গ) নমুনায়ন ও জরিপ।

এর মধ্যে গ- অংশটি পাঠ -১.২ এ পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে।

ক) বহিরাঙ্গণ কৌশল (Field Techniques)

গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গবেষককে বহিরাঙ্গণে বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করতে হয়। বিশেষ করে ভূবিদ্যা বা এলাকা সমীক্ষায় বহিরাঙ্গণ বা মাঠ কৌশলগুলিকে মূলত ঃ

১. প্রাথমিক প্রক্রিয়া;

২. ভিত্তি মানচিত্র বা আলোক চিত্রের উপর মানচিত্রাংকন করা;

৩. ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণ;

৪. তথ্য লিপিবদ্ধকরণ; এবং

৫. সাক্ষাৎকার গ্রহণ

এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

ক.১) প্রাথমিক প্রক্রিয়া (Primary Procedure)

যে কোন গবেষণার কাজ করার সময় প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। গবেষণার বিষয়টি ভালভাবে উপলব্ধি করে ঐ কাজ সমাধা করার জন্য কতগুলি উদ্দেশ্য বেছে নিতে হবে। সরেজমিনে কাজ শুরু করার আগেই এ বিষয়ের উপর প্রকাশিত তথ্য অনুসন্ধান করতে হবে। মূল মানচিত্র বা আকাশ থেকে গৃহিত বিমান চিত্র নির্বাচন করতে হবে। এলাকাটি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভের জন্য প্রাথমিক নিরীক্ষা করতে হবে। সম্পূর্ণ গবেষণার কাজটি সমাধা করার উদ্দেশ্যে এলাকা পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। প্রত্যক্ষ এলাকা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ এবং সবশেষে এলাকার বর্তমান মানচিত্র তৈরী করতে হবে। নিম্নে এই সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো (চিত্র ১.১.১)।

ক.১.১) উদ্দেশ্যের বর্ণনা (Objective) ঃ একজন গবেষককে তার গবেষণার বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও তা বর্ণনা করতে হবে।

ক.১.২) প্রামাণিক অনুসন্ধান (Literature Review) ঃ কোন গবেষণার কাজ করার সময় ইতিপূর্বে অন্য কোন গবেষক সেই বিষয়ের উপর বা অনুরূপ কোন বিষয়ের উপর কাজ করেছেন কিনা, তার লেখা প্রবন্ধ আছে রয়েছে কিনা, থাকলে কোন পত্রিকায় বা সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে ইত্যাদি তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে একজন গবেষক উক্ত এলাকার বা বিষয়ের সাথে মোটামুটি পরিচিতি লাভ করতে পারেন।

ক.১.৩) প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ঃ গবেষণা এলাকার বা তার কোন অংশের একটি প্রাথমিক কিন্তু দ্রুত জরিপ করাকে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ (Reconnaissance Survey) বলে। প্রকৃত ও বিস্তারিত সমীক্ষা শুরু করার আগে ঐ এলাকা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়ার জন্য এইরূপ জরিপ করা প্রয়োজন।

ক.১.৪) এলাকা পরিকল্পনা (Area Planning) ঃ সমীক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে সময়কে সবচেয়ে বেশী সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাবার জন্য আগে থেকেই এলাকা পরিকল্পনা করতে হয়।

ক.১.৫) এলাকা মানচিত্র তৈরী (Creating Maps of Servey Area) ঃ গবেষণা এলাকার মানচিত্র তৈরী করার সময় ভগোলবিদগণ (Geographers) আঞ্চলিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই সময় তারা কেবলমাত্র বৃহৎ স্কেলে অংকিত মানচিত্রের উপর স্বতন্ত্র গৃহ, রাস্তা প্রভৃতি বিস্তারিত উপাদান দেখাতে সক্ষম হন। তবে অনেক সময় একজন গবেষক কোনরূপ স্কেল বজায় না রেখে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থানস্থল রেখা বা বিন্দুর মাধ্যমে দেখাতে পারেন।

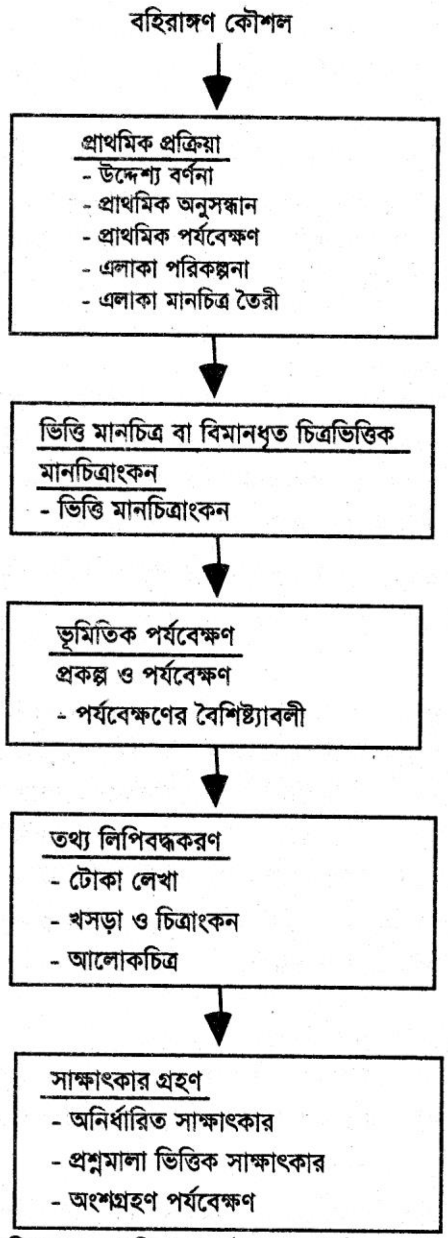

চিত্র ১.১.১ বহিরাঙ্গণ কৌশলের পর্যায়সমূহ

ক.২) ভিত্তি মানচিত্র বা বিমানধৃত চিত্র ভিত্তিক মানচিত্রাংকন (Mapping on Base Map or on Aerial Photograph)

গবেষণা এলাকার মানচিত্র অংকনের জন্য ভূবিদগণ সাধারণত: ভিত্তি মানচিত্র ও বিমানধৃত চিত্র সংগ্রহ করেন। প্রাথমিক নিরীক্ষা, বিন্দু ও রেখা লিপিবদ্ধ করা, ফালি মানচিত্র তৈরী করা, নমুনা জরিপ প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের জন্য ভূমি মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গবেষণার এলাকার নির্ভরশীল মূল মানচিত্র পূর্বাহ্নে পাওয়া গেলে গবেষকের কাজ অনেক সহজ

হয়। আমাদের দেশে বাংলাদেশ জরিপ বিভাগ, রাজস্ব দপ্তর, ভূমি নথিপত্র সংরক্ষণ দপ্তর, কৃষি বিভাগ, বন বিভাগ প্রভৃতি সরকারী দপ্তরগুলিতে মানচিত্র তৈরী করা হয় এবং জেলার নথি সংরক্ষণ দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় ভূমি মানচিত্র সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মানচিত্র তৈরী করে। এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে একজন গবেষক প্রয়োজনীয় ভিত্তি মানচিত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

সরেজমিন জরিপ পরিচালনা করে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারিত এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্য মূল মানচিত্র বা বিমানচিত্র ব্যবহার করা হয়। ভিত্তি মানচিত্র সব সময় নির্ভুল নাও হতে পারে। এইরূপ মানচিত্রে অনেক সময় ত্রুটি থাকে, আবার অনেক বৎসর আগে আঁকা এইরূপ মানচিত্রে পরবর্তীকালে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেগুলি পাওয়া যায় না । এদিক থেকে সরাসরি আকাশ থেকে তোলো আলোকচিত্র অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য।

ক.৩) ভূমিতিক পর্যবেক্ষণ (Geographic Observation)

ধারাবাহিকভাবে ভূবিদ্যা বিষয়ক ভৌগোলিক অবলোকনকে 'পর্যবেক্ষণ' নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য চোখে দেখা ও পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে বিন্যস্ত বিভিন্ন বস্তুর মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সঠিক বস্তুটি খুঁজে বের করা এবং তার বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করা পর্যবেক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং পর্যবেক্ষণীয় বিভিন্ন বস্তুর নিকটে গিয়ে বা দূর থেকে সেগুলি দেখা ও বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে:-

ক.৩.১) প্রকল্পন ও পর্যবেক্ষণ (Hypothesis and Observation) ঃ গবেষকগণ কিছু প্রকল্পন নিয়ে বহিরাঙ্গনে যান এবং সেই প্রকল্পনের আওতায় নির্বাচিত বা নির্দিষ্ট বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন।

ক.৩.২) পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্যাবলী (Features of observation) ঃ

পর্যবেক্ষণের সময় সাবধানতার সাথে বিন্যাস পর্যালোচনা করতে হয়, অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিরূপে একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত তাও পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়াও আচরণ সূত্রপাতের উদ্দীপক কি? কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে আচরণ পরিচালিত হচ্ছে এবং আচরণের গুণগতমান ও ফলাফল বা পরিণতি কি যা পর্যবেক্ষণের উপযোগী এ সমস্ত বিবেচনায় আনতে হবে। সেই সাথে পর্যবেক্ষককে সমগ্রকে বিদ্যমান উপাত্তের সংখ্যা, তাদের মধ্যবর্তী মিথষ্ক্রিয়া ও আন্ত:সম্পর্ক এবং তাদের মিথষ্ক্রিয়া ও আন্ত:সম্পর্কের ফলাফল কি সে সব জানার জন্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিত পন্থা অনুসরণ করে কোন বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিখে রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তথ্য সংগ্রহের এই কৌশলটি সমীক্ষার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

ক.৪) তথ্য লিপিবদ্ধকরণ (Recording Informatoin)

পর্যবেক্ষণকালে যে সব তথ্য পাওয়া যাবে তা তখনই লিখে রাখা অত্যাবশকীয়। কারণ যে কোন মুহূর্তে অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্য পর্যবেক্ষণকারীর স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে পারে। এ কারণে সমস্ত বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে যত্নবান হতে হবে এবং এজন্য তাৎক্ষণিক টোকা লেখা বিশেষ গুরুত্ববহ।

ক.৪.১) টোকা লেখা (Taking notes) ঃ টোকা লেখা পদ্ধতির মাধ্যমে কিছু কিছু তথ্য ভালভাবে লিখে রাখা যায়। যে সব জায়গায় ক্ষুদ্র স্কেলে মানচিত্র পাওয়া যায় সেখানে কাজ করার প্রয়োজন দেখা দিলে এবং মানচিত্রের উপর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করা বিষয়গুলি দেখানো সম্ভব না হলে সেখানে ''টোকা লেখা" যথেষ্ট সহায়ক ও প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ক.৪.২) খসড়া নকসা ও পরিলেখ চিত্রাংকন (Sketch Diagram)ঃ পরিলেখ অংকনের মাধ্যমে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারিত অবয়বের প্রতিকৃতি অংকন করা যায় এবং অপ্রয়োজনীয় অবয়বগুলি পরিহার করা হয়। নির্দিষ্ট স্কেলে অথবা কেবলমাত্র সাধারণ বর্ণনা লিখনের মাধ্যমে যে সব জিনিস দেখানো সম্ভব নয় পরিলেখ মানচিত্র সেগুলির বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করে। এইজন্য বহিরাঙ্গণে নকসাগুলি প্রাথমিক নিরীক্ষণ ও এলাকা সমীক্ষার সর্বশেষ ফলাফল উপস্থাপনে যথেষ্ট মূল্যবান অবলম্বন বলে বিবেচিত হয়।

ক.৪.৩) আলোকচিত্র (Photographs) ঃ আলোকচিত্র বিভিন্ন ঘটনার বিষয়গত ব্যাখ্যা প্রদানের অথবা এর সাহায্যে মানচিত্রে সংকেতের মাধ্যমে উপস্থাপিত এলাকার অবস্থা পরীক্ষা করার উত্তম মাধ্যম। যে জিনিসের চিত্র নেয়া হচ্ছে তা

প্রকৃতই প্রতিনিধিত্বমূলক কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে চিত্রের মধ্যে প্রতিভাত তথ্যগুলি সম্বন্ধে বিবরণ থাকতে হবে। সাধারণ ক্যামেরার সাহায্যে ছোট বিমান থেকে তীর্যকভাবে তোলা নিু সমতলের দৃশ্য বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, ভূমি থেকে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ের চিত্র তোলা সম্ভব নয়। বর্তমানে ডিজিটাল বা ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে অতি চমৎকারভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি জিনিসের আলোকচিত্র ভূমি থেকে তোলা যায় বলে তা লিপিবদ্ধকরণের জন্য যথেষ্ট সহায়ক বলে বিবেচিত।

ক.৫) সাক্ষাৎকার গ্রহণ (Interviewing)

গবেষণার ভাষায় তথ্য সংগ্রহকারী ও উত্তরদাতার মধ্যে বিশেষ উদ্দেশ্যে যে রীতিবদ্ধ আলাপ-আলাচনা হয় তাকে সাক্ষাৎকার বলে। কোন এলাকার তথ্য সংগ্রহের জন্য সাধারণত: (ক) অনির্ধারিত কথোপকথনের মাধ্যমে, এবং (খ) প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। আবার এইরূপ সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় গবেষণা এলাকার প্রতিটি অধিবাসীর সাথে আলাপ-আলোচনা না করে নির্দিষ্ট (গ) নমুনায়ন পদ্ধতি, অথবা (ঘ) অংশগ্রহণ-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় (নমুনায়ন জরিপ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে)।

ক.৫.১) অনির্ধারিত সাক্ষাৎকার (Informal Conversation) ঃ

বিশেষ ঘটনামূলক উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য অনির্ধারিত কথোপকথন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। গবেষণা এলাকায় তথ্য দানে সমর্থ ব্যাক্তিরা সন্দেহ পরবশ হয়ে যখন তথ্য দানে অস্বীকৃতি জানান তখন এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কথার মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্নভাবে নিজের আকাঙ্খিখত উত্তরটি পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে হলেও উত্তরদাতার যেন ধৈর্যচ্যুতি না হয় সেদিকে প্রশ্নকারীকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

ক.৫.২) প্রশ্নমালাভিত্তিক সাক্ষাৎকার (Interview by Questionnaire) ঃ গবেষণা এলাকায় অধিবাসীরা যদি গবেষককে ও তার তথ্য সংগ্রহকারীদের সহজভাবে গ্রহণ করেন এবং সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সহানুভূতিশীল ও আগ্রহী হয়ে ধৈর্য্য সহকারে প্রতিটি কথা শ্রবণ করেন তাহলে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকারগ্রহণ করা সম্ভব হয়। প্রশ্নমালা ব্যবহারের চারটি প্রধান ধাপ অনুসরণ করা হয়। প্রথমত: প্রশ্নগুলি যতটা সম্ভব স্পষ্ট ও সরলভাবে উপস্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত: প্রশ্নগুলি একটি শ্রেণীবদ্ধ নমুনা আকারে জিজ্ঞাসা করা হয় এবং এরই ভিত্তিতে প্রশ্নগুলির মূল্যায়ন ও পরিবর্তন করতে হয়। তৃতীয়ত: প্রশ্নমালাভিত্তিক জরিপ আলোচ্য এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে পরিচালিত হয়। চতুর্থত: প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল সংকলন ও মূল্যায়ন করা হয়। এই চারটি ধাপের মধ্যে কেবলমাত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপ দুটি গবেষণা এলাকাতেই সম্পন্ন করতে হয়।

ক.৫.৩) অংশগ্রহণ-পর্যবেক্ষণ ঃ কোন সমীক্ষার স্বার্থে, বিশেষ করে মানবিক ভূগোলের কোন শাখায় গবেষক যখন নিজেই অংশগ্রহণ করেন তখন তাকে অংশগ্রহণ-পর্যবেক্ষণ বলে। এক্ষেত্রে যে সম্প্রদায় বা এলাকাবাসীর সমীক্ষা করা হবে সেখানে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে গবেষক নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হন। সম্প্রদায়ের বা এলাকার একজন সদস্য হিসেবে প্রতিদিন কি ঘটছে, সমীক্ষা আওতাধীন ব্যক্তিদের আচরণ কিরূপ এসব কিছু অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টি রাখেন। এমনকি তিনি সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য ও ব্যাখ্যা করার জন্য তাদের ভাষা ও কথোপকথনের রীতির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি সামগ্রীকভাবে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা প্রণালী পর্যবেক্ষণ করেন। বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সম্পর্ক, এর কার্যকলাপ ও আচরণ অনুষ্ঠান লক্ষ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের সমীক্ষা পদ্ধতি সামাজিক নৃতাত্ত্বিক বিষয় থেকে ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যায় ব্যবহার হচ্ছে।

বহিরাঙ্গণ কৌশলের অসুবিধাঃ

প্রতিটি পদ্ধতির যেমন বিশেষ সুবিধা রয়েছে তেমনি কিছু অসুবিধাও থাকে। বহিরাঙ্গণ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

ক) একজন গবেষক যখন বহিরাঙ্গণ কাজে যান তখন তিনি বিষয়টি সম্বন্ধে একবারে নতুন। সেখানে অনেক কিছুই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি সামাজিক পরিবেশ ও অবস্থার কথা বিচার না করে সেগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। ফলে, তার সংগৃহিত প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে।

খ) প্রত্যেক গবেষকের একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা রয়েছে এর ফলে তিনি যা কিছু দেখেন সবই নিজ সংস্কৃতির আলোকে দেখতে সচেষ্ট হন। ফলে অনেক সময় পর্যবেক্ষণের বাস্তব দিকটি বহুলাংশে নিস্প্রভ হয়ে পরে।

গ) কোন একটি নতুন সমাজে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হলে গবেষক মূলত: সেই সমাজ সম্পর্কে তার পুথিগত জ্ঞান বা অন্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ থেকে জানতে পারেন। এর ফলে সেই সমাজ সম্পর্কে গভীরভাবে কিছু জানার প্রয়োজন হলে পর্যবেক্ষককে সমাজের লোকদের মধ্যে কিছুকাল অতিবাহিত করতে হয় যা অনেক গবেষকের জন্যে সম্ভব নয়।

ঘ) তথ্য সংগ্রহের সময় অনেক কিছুই গবেষকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। তার সুবিধামত একটি তফসীল সূচী ও পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা তৈরী করেন। কিন্তু সব রকম পরিবেশে তার সেই পরিকল্পিত কার্যক্রম কাজে আসে না।

ঙ) কোন এক দল মানুষের মধ্যে গবেষণার কাজ পরিচালনার সময় গবেষক এমন অনেক কিছু পান যা পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়। যেমন-আবেগ, অনুভূতি, মনোভাব, সংস্কার বা কুসংস্কার, ভাবপ্রবণতা, পছন্দ ও অপছন্দ প্রভৃতি।

চ) সর্বোপরি এই পদ্ধতি সব ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব সংস্কার, ভাবপ্রবণতায় কিছু মাত্রায় পক্ষপাতদুষ্টতা থাকে। এই সব গুণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সরেজমিনে যে সব তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলি নিঃ নির্ভরযোগ্যতা সম্পন্ন অথবা পূর্ব ধারণাপ্রসূত হতে পারে।

বহিরাঙ্গণ কৌশলের সুবিধা ঃ

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও নি:সন্দেহে বলা যায় যে, সমগ্র পদ্ধতিটির বহুবিধ সুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক ভূগোলের কোন বিষয়ের উপর তথ্যসংগ্রহের জন্য এটি নি:সন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। নীচে এর কতিপয় সুবিধা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল ঃ

ক) কোন জনসমষ্টির সমীক্ষার জন্য এটি সবচেয়ে সরল ও সহজ পদ্ধতি। একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষককে বহিরাঙ্গণে পাঠালে এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভব।

খ) কোন গবেষকই প্রকল্পন ব্যতীত অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেন না। সুতরাং পর্যবেক্ষণের সময় তার নিজের দ্বারা বিকশিত প্রকল্পনগুলি যদি সুদৃঢ় না হয় তাহলে তা সহজেই পরিবর্তন করা যায়। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রকল্পন তৈরী ও বিকাশে সহায়তা করে।

গ) এই পদ্ধতিতে গবেষক প্রধানত: নিজেই উপাত্ত সংগ্রহ করেন বলে তিনি যা কিছু সংগ্রহ করেন তা সঠিক এবং পক্ষপাতদুষ্টতাহীনভাবে ব্যাখ্যা করলে সেগুলি যথেষ্ট মাত্রায় নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

প্রথম পর্যায়ের তথ্যসংগ্রহের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে প্রচুর অর্থ, সময় ও পরিশ্রম ব্যয় এবং তথ্য সম্বন্ধে বেশী সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। জনমত যাচাই, দৃষ্টিভঙ্গি বিচার, মূল্যবোধ সম্বন্ধে জানা, আচার-আচরণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ প্রভৃতি বিষয়ের জন্য প্রাথমিক তথ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই পদ্ধতি ব্যতীত গবেষকের সাধারণত: তথ্যসংগ্রহ পূর্ণ হয় না।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানিক পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও যথেষ্ট নয়। এ জন্য গবেষককে সাধারণত: সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত তথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এজন্য ভূবিদগণ তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্যসংগ্রহের কলাকৌশলগুলির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন, দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস থেকে তথ্যসংগ্রহ করেন এবং প্রাপ্ত তথ্যমানচিত্রে উপস্থাপনসহ রীতিবদ্ধ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করেন।

খ) ত্বরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়ন (Rapid Geographical Appraisal)

ত্বরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়ন গত শতকের প্রথমার্ধে ভূগোলবিদ এবং সমরবিদদের বহুল প্রচলিত ভূ-লিপি (Geo-stenography) পদ্ধতির বিবর্তন মাত্র। ষাট দশকের শেষের দিকে এবং সত্তর দশকের প্রথমে ভূগোলে পরিমানাত্মক ও মডেল ব্যবহারের ব্যাপক ধারা প্রবর্তনের ফলে ভূ-লিপি পদ্ধতির ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তিতে কম্পিউটারের ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন ভৌগোলিক উদ্ভাবন, বিশেষ করে জি.আই.এস.(ভৌগোলিক তথ্য সিস্টেম)-এর ব্যবহার ভূ-লিপি

পদ্ধতিকে আরও অকার্যকর করে ফেলে। ভূগোলে এই পদ্ধতিগত পরিবর্তন সত্ত্বেও ভূ-লিপি পদ্ধতিকে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্যসংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস বিবেচনা করা হয়। এই কারণে ভূবিদদের উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিটি পরিবর্তিত আকারে সম্প্রতি কৃষিবিদগন ভূমি ব্যবহার ও মূল্যায়ন থেকে শুরু সমাজবিজ্ঞানীগন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তরিৎ গ্রামীন মূল্যায়ন (Rapid Rural Appraisal) হিসেবে ব্যবহার করছেন।

ভূগোল ও পরিবেশগত সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে স্বল্প সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের উপায় হিসেবে এই পদ্ধতিকে 'তরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়ন' (Rapid Geographical Appraisal) বা সংক্ষেপে ত্ব.ভৌ.মূ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর আলোকে এই পদ্ধতিকে আমরা প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভূবিদ অথবা একাধিক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন সমীক্ষক কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তুতকৃত কাঠামোর আওতায় যে কোন ভৌগোলিক, পরিবেশগত বা সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক বিষয়ে স্বল্প সময়ে সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ বলে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। পদ্ধতিটি বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে অথবা ক্ষুদ্র পরিসরে মানব পরিবেশ বা মানব বাস্তব্য (Human Ecology) বিষয়ক সমীক্ষার জন্য বিশেষ উপযোগী।

পদ্ধতিগত পর্যায়সমূহ ঃ

ত্বরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়ন করার সময় ছয়টি মৌলিক ভিত্তি প্রশ্ন বিবেচনায় রাখতে হয় এগুলো হচ্ছেঃ

- কি ?
- কখন ?
- কেন ?
- কোথায় ?
- কে ?
- কিভাবে ?

এবং তদানুযায়ী তথ্যসংগ্রহ করতে হয়।
তবে সামগ্রিকভাবে ত্ব.ভৌ.মূ পদ্ধতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহ অনুসরণ করতে হবে।

বষয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ নির্দেশক (Check List) ঃ নির্দিষ্ট ছকবদ্ধ প্রশ্নমালার পরিবর্তে ত্ব.ভৌ.মূ'র জন্য বিষয়ভিত্তিক তথ্যসংগ্রহ নির্দেশক তৈরী করতে হয়। এই নির্দেশক তথ্য সংগ্রহের গতিধারা পরিকল্পনায় সহায়ক এবং সংগৃহীত তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে।

খসড়া মানচিত্র / নকসা (Sketch Map) ঃ পূর্বাহ্নে গবেষণা এলাকার মানচিত্র পাওয়া না গেলে একটি খসড়া মানচিত্র বা নক্সা তথ্যসংগ্রহের সম্পূরক উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। এইরূপ মানচিত্রে গবেষণা এলাকার সাধারণ ভূমিরূপ, অবকাঠামোগত তথ্য ইত্যাদি সন্নিবেশ করা যায়। অপরদিকে, এতে জনবসতি, প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (Growth Centre) সমস্যাকবলিত স্থান ইত্যাদিও দেখানো যায়। অনেক সময় এই পদ্ধতিতে একটি পুরাতন মানচিত্রে সাম্প্রতিক তথ্য সন্নিবেশ ও পরিবর্তন নির্দেশ করে মানচিত্রের নতুনত্ব বৃদ্ধি করা যায়।

পরিদর্শন (Transect) ঃ ত্বরিৎ ভেওগোলিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহের পূর্বে সমীক্ষা এলাকা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের সহায়তায় মূলতঃ পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করা প্রয়োজন। এই পরিদর্শনের ফলে স্থানীয় ভূ-অবকাঠামোগত সুবিধা-অসুবিধা, প্রধান শষ্য উৎপাদন, পশুপালন, বসতির ধরণ ও গৃহনির্মাণ উপকরণ ও ব্যবস্থাপনা, বন্যা প্রবণতা ও এর প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

শষ্যপঞ্জী (Crop Calendar) ঃ শষ্যপঞ্জী একটি এলাকার কালীক পর্যায়ে নির্দিষ্ট শষ্যের বপণ-কর্তন চক্র নির্দেশ করে। স্থান বিশেষে এই চক্রের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে গ্রামীণ বা ভূমি ব্যবহার সমীক্ষায় এই তথ্য স্থানীয় অধিবাসীদের দলগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায় ।

ঋতুপঞ্জী (Seasonal Calender) ঃ এটি শষ্যপঞ্জীরই বর্ধিত রূপ। এলাকা পরিদর্শনজাত তথ্য, নির্বাচিত তথ্য, সরবরাহকারীদের সহায়তা ইত্যাদির সাহায্যে এই পঞ্জী তৈরী করা হয়। এর দ্বারা এলাকা বা গ্রামে অধিবাসীদের কর্মধারা, স্থানীয় হাট-বাজারের জন্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ধরণ ইত্যাদির সময়ভিত্তিক তথ্যসংগ্রহ করা যায়। এমনকি স্থানীয় বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা পরিবর্তন থেকে শুরু করে শ্রম ব্যবহার ও সরবরাহের ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন তথ্যসংগ্রহ করে এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

চিত্র (Diagram) ঃ সংগৃহীতব্য বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন চিত্র, যেমন, স্তম্ভ বা লেখচিত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করা যায়। একইভাবে সামাজিক কাঠামো এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের আন্ত:সম্পর্ক ধারা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় ।

সিদ্ধান্ত চিত্র (Decision Diagram/Tree) ঃ স্থানীয় পরিদর্শন, দলগত সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং কাঠামোগত সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে দেখা যায় যে, কতিপয় বিষয়ের মধ্যে ‘কারণ-ফলাফল' (Cause and Effect) সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে। এইরূপ কার্য-কারণ তথ্য একটি পর্যায়ক্রমিক প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে মূল ক্রিয়াশীল উপাদানগুলি চিহ্নিত করে দেখানো যায়।

কর্মকাণ্ড চিত্র (Activity Diagram) ঃ একটি কর্মকাণ্ড চিত্র বা পত্রে সহজেই একটি এলাকার অধিবাসীদের দৈনন্দিন বা ঋতুভিত্তিক পেশা বা কর্মকাণ্ডের ধরণের পরিসংখ্যানগত তথ্য স্তম্ভচিত্র বা চার্টের সাহায্যে সমীক্ষাকালে সংগ্রহ করা যায়। এইরূপ চিত্রে আয়-ব্যয় ধারা অথবা অন্যান্য পেশার সাথে সংযুক্ত করে তুলনা করে তথ্য প্রকাশ করা যায়।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ (Local Organizations) ঃ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহকালে সমীক্ষা এলাকায় নির্বাচিত দলগত সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় স্থানীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের তথ্যসংগ্রহ করে এদের কর্মপরিধি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক মানচিত্র অথবা ভেন চিত্রের সাহায্যে তথ্য সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা যায়।

ত্বরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়ন-এর প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা

কোন এলাকার ত.ভৌ.মূ পরিচালনার পূর্বে অবশ্যই নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ

ক. সমীক্ষা এলাকা ও বিষয় সম্পর্কে প্রকাশনা জরিপ;

খ. সমীক্ষা এলাকা চিহ্নিতকরণ;

গ. জরিপ এলাকা নির্ধারণ (নমুনায়ন সম্পর্কে পাঠ দ্রষ্টব্য);

ঘ. মানচিত্র ও বিমানধৃত চিত্রের সাহায্য গ্রহণ (পাঠ-১'র(ক);

ঙ. মানচিত্র তথ্য সমসাময়িকীকরণ বা সংশোধন (উপরে দ্রষ্টব্য); এবং

চ. গৃহীতব্য তথ্য সম্পর্কে কাঠামোগত নির্দেশনা তৈরী।

এরপর সমীক্ষা এলাকায় ত্ব.ভৌ.মূ পদ্ধতিতে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য নিম্নোক্ত পন্থা অনুসরণ করে সংগ্রহ করা যাবে ঃ

ক. তথ্যসংগ্রহের জন্য কাঠামোগত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচিত উত্তরদাতা এবং দলীয় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ ; এবং

খ. তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিশ্লেষণ (ইউনিট-২ দ্রষ্টব্য) পর্যায়ে তথ্যসমূহ প্রধানত: পরিসংখ্যানগত হয়ে থাকে। তবে, বেশ কিছু গুণগত তথ্য, যেমন, কোন বিষয় সম্পর্কে অনুভূতি ও প্রত্যক্ষণ (Perception) মান আরোপের (Scoring) মাধ্যমে পরিসংখ্যানগত রূপ দেওয়া সম্ভব।

পরিশেষে এই সমস্ত তথ্য মূল্যায়ন করা হয় প্রধানত: পরিসংখ্যানগত ব্যাখ্যা ও বিবরণমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই কাজে মানচিত্রায়ন, বিভিন্ন কম্পিউটার পদ্ধতি, যেমন, জি. আই. এস. পদ্ধতির ব্যবহারও সম্ভব (পরবর্তি ইউনিটসমূহ দ্রষ্টব্য)।

পাঠসংক্ষেপঃ

ব্যবহারগতভাবে পরিসংখ্যান বলতে সংখ্যাগত তথ্য বুঝিয়ে থাকে। আর তথ্য (Data) বলতে সংখ্যাগত উপাত্ত বা তথ্যমালাকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞানের শাখাগুলিতে তথ্য বলতে সামগ্রিকভাবে যে কোন উপাত্তকে - সংখ্যাগত হোক বা না হোক বুঝিয়ে থাকে। তথ্যের উৎস দুইটি; ১। প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য এবং ২। মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য। প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সমীক্ষা এলাকা থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্য সংগ্রহের তিন ধরনের পদ্ধতি হচ্ছেঃ (ক) বহিরাঙ্গন কৌশল, (খ) ত্বরিৎ ভৌগোলিক তথ্য আহরণ; এবং (গ) নমুনায়ন ও জরিপ। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গবেষককে বহিরাঙ্গনে বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করতে হয়। ভূবিদ্যা বা এলাকা সমীক্ষায় বহিরাঙ্গন বা মাঠ কৌশলগুলিকে মূলত ঃ পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয় এগুলো হচ্ছে:- ১। প্রাথমিক প্রক্রিয়া, ২। ভিত্তি মানচিত্র বা আলোক চিত্রের উপর মানচিত্রাংকন করা, ৩। ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণ, ৪। তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং ৫। সাক্ষাৎকার গ্রহণ। ভূগোল ও পরিবেশগত সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে স্বল্প সময়ে প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের উপায় হিসেবে 'তরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়ন' (Rapid Geographical Appraisal) বা সংক্ষেপে ত্ব.ভৌ.মূ (RGA) পদ্ধতিটি বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. ব্যবহারগতভাবে পরিসংখ্যান বলতে .... তথ্য বুঝিয়ে থাকে।

১.২. তথ্য (Data) বলতে সংখ্যাগত .... বা .... বুঝায়।

১.৩. প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহের .... ধরণের পদ্ধতি রয়েছে ।

১.৪. বহিরাঙ্গণ কৌশলগুলিকে .... ভাগে ভাগ করা হয় ।

১.৫. ধারাবাহিকভাবে ভূবিদ্যা বিষয়ক ভৌগোলিক অবলোকনকে .... নামে অভিহিত করা হয়।

১.৬. পর্যবেক্ষণকালে যে সব তথ্য পাওয়া যাবে তা তখনই .... রাখা অত্যাবশকীয়।

১.৭. .... দশকের শেষের দিকে এবং সত্তর দশকের প্রথমে ভূগোলে পরিমানাত্বক ও মডেল ব্যবহারের ব্যাপক ধারা প্রবর্তনের ফলে ভূ-লিপি পদ্ধতির ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. তথ্যের উৎস প্রধানত চারটি।

২.২. প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যকে প্রাথমিক তথ্য বলে।

২.৩. বহিরাঙ্গণ কৌশল একটি প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি।

২.৪. গবেষণা এলাকার মানচিত্র তৈরী করার সময় ভূবিদগণ (Geographers) পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

২.৫. কোন জনসমষ্টির সমীক্ষার জন্য বহিরাঙ্গনণ কৌশল সবচেয়ে সরল ও সহজ পদ্ধতি।

২.৬. ত্বরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়ন করার সময় চারটি মৌলিক ভিত্তি প্রশ্ন বিবেচনায় রাখতে হয়।

২.৭. ত.ভৌ.মূ পরিচালনার পূর্বে সমীক্ষা এলাকা ও বিষয় সম্পর্কে প্রকাশনা জরিপ প্রয়োজনীয় নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. ভূগোলে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২. প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য কাকে বলে ?

৩. প্রাথমিক তথ্য উৎস বর্ণনা করুন।

৪. প্রশ্নমালা ভিত্তিক সাক্ষাৎকার কি ?

৫. বহিরাঙ্গন কৌশলের অসুবিধাগুলি আলোচনা করুন।

৬. ত্বরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়ন কাকে বলে?

৭. ত্বরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়ন এর প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা পর্ব লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ভৌগোলিক উপাত্তের উৎসসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে বহিরাঙ্গণ কৌশলের বিস্তারিত বর্ণনা দিন।

৩. ত্বরিৎ ভৌগোলিক মূল্যায়নের পর্যায়সমূহ আলোচনা করুন।

পাঠ-১.২

প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য-২

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- নমুনায়ন এবং জরিপ;
- অক্রম নমুনায়ন;
- নিয়মানুগ নমুনায়ন; এবং
- স্তর বিন্যস্ত নমুনায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

নমুনায়ন এবং জরিপ (Sampling and Survey)

নমুনায়ন (Sampling) হলো প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমগ্রকের (Aggregate Population Universe) একটি অংশ পরীক্ষা করে সমগ্রক সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচিত এই অংশকে নমুনা বলে। নমুনা চয়নের মাধ্যমে সমগ্রক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিকে আরোহ অনুমান বা তথ্যমূলক উপপত্তি (Induction) বলে। নমুনাচয়নের গৃহিত পদ্ধতিকে জরিপ (Survey) বলে।

সাধারণত: আমরা যে কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যে তথ্য নিয়ে কাজ করে থাকি তা হলো সমগ্রকের একটি অংশ বা নমুনা। কেননা একটি সমগ্রক থেকে সরাসরি পূর্ণ গণনা পদ্ধতিতে সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য, ব্যয়সাধ্য এবং অনেক সময় প্রায় অসম্ভব। নমুনা সমীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি প্রয়োগ করে এর নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব বলে সমগ্রক-সমীক্ষা প্রায়শ: গ্রহণ না করে নমুনায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে মোট ব্যষ্টি (Individual) সংখ্যা অনির্দিষ্ট বা অসীম হলে সেই সমগ্রকের ক্ষেত্রে নমুনায়ন ব্যতিরেকে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ প্রয়োগ সম্ভবই নয়। উদাহরণ স্বরূপ, কোন দেশের জনসংখ্যার গড় বিবাহ বয়স (যেখানে সমগ্রকটি অনির্দিষ্ট না হলেও খুবই ব্যাপক) অথবা কোন সমুদ্রতীরের সঞ্চিত বালির গঠন নির্ণয় (যেখানে বালির সংখ্যা অসীম বা অনির্দিষ্ট) ক্ষেত্রে সমগ্রক থেকে নমুনা বের করে সমীক্ষা গ্রহণ একমাত্র সুবিধাজনক পদ্ধতি। নমুনায়ন পদ্ধতিতে পরিসংখ্যানগতভাবে এ ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব।

নমুনায়ন পদ্ধতিসমূহ ঃ

সমগ্রকের প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা জরিপে সকল নমুনায়ন পদ্ধতি সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য নয়। আলোচ্য উদাহরণের ফলাফল তুলনা করলে বিষয়টি বুঝা যাবে। যেমন, বর্গাকৃতি জালি প্রয়োগে নমুনা খানা চয়ন করলে এমন দেখা যেতে পারে যে কিছু বর্গে কোন খানা পড়ল না বা অন্য বর্গসমূহে বহুসংখ্যক খানার সমাবেশ ঘটতে পারে। অথবা সামগ্রিকভাবে ঘন খানাযুক্ত অংশ থেকে কম খানা নমুনা হিসেবে পাওয়া যেতে পারে। অথবা কম ঘনত্ব অংশ থেকে অধিক সংখ্যক নমুনা খানা আসতে পারে। এর ফলে জরিপের ফলাফলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

নমুনায়ন পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিৎ যাতে এই ধরনের সমস্যা এড়ানো যায়। এই অংশে বিভিন্ন ধরনের নমুনায়ন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা হবে। প্রথমত: উল্লেখ্য যে, নমুনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। আলোচ্য অংশে ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা এবং স্থানিক বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট প্রধান ব্যবহার্য পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হবে। বিশেষ পদ্ধতিটির ব্যবহার নির্ভর করবে নির্দিষ্ট সমীক্ষা অবস্থা এবং কি উদ্দেশ্যে নমুনায়নের ব্যবহার হচ্ছে তার উপর। নমুনায়ন পদ্ধতি বিভিন্ন

অনুমিতিক পরিসংখ্যান (Inferential Statistics) পদ্ধতির পূর্বশর্ত। তবে মূলতঃ বর্ণনাসূচক পরিসংখ্যান (Descriptive Statistics) এর ক্ষেত্রে অন্যান্য নমুনা পদ্ধতি বেশ উপযোগী হতে পারে।

ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যায় আমরা প্রধানতঃ তিন ধরনের নমুনায়ন ব্যবহার করতে পারি। এগুলি এখন আলোচনা করা হবে।

১। অক্রম নমুনায়ন (Random Samping) ঃ

যে নমুনায়ন পদ্ধতিতে সমগ্রকের প্রতিটি এককের নির্বাচিত হওয়ায় সম্ভাবনা সমান এবং কোন কোন একক নমুনার অন্তর্ভূক্ত হবে তা দৈবের উপর নির্ভর করে তাকে অক্রম নমুনায়ন (Random Sampling) বলে। মূলতঃ সম্ভাব্যতা তত্ত্বের (Probability) ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচন করা হয় এবং নমুনা নির্বাচন শুধুমাত্র দৈবতার উপর নির্ভর করে ।
অক্রম নমুনার দুইটি শর্ত পূরণের প্রয়োজন হয়।

(ক) পদ্ধতিটিতে প্রতিটি এককের নমুনায়ন অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান; এবং
(খ) কোন নির্দিষ্ট একক নমুনায় অন্তর্ভূক্ত হলেও অন্যান্য এককগুলির নমুনায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত বা নস্যাৎ করে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন গ্রামে ২০০ টি খানার সমগ্রকের মধ্যে ৫০টি খানা অক্রম সমুনায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ৫০/২০০ বা ০.২৫%।

অক্রম নমুনায়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তদ্বয় পরিপূরণ সহজ নয়। ২০০ খানার ঠিকানা সূচক সংখ্যা কাগজখন্ডে লিখে ৫০টি কাগজ খন্ড একটি ঝুড়ি থেকে একে একে টেনে নিলে দেখা যাবে যে, প্রথম অবস্থায় প্রতিটি কাগজ খন্ড উঠানোর ১/২০০ বা ০.০০৫% সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু একটি খন্ড উঠানোর পর বাকী ১৯৯টি খন্ডের পরবর্তি টানে সম্ভাব্যতা হবে ১/১৯৯। এই প্রক্রিয়ায় যতক্ষণ নমুনা টানা চলতে থাকবে এবং যখন ৫০টি কাগজ খন্ড টানা শেষ হবে তখন বাকীগুলির ১/১৫১ উঠানোর সম্ভাব্যতা রয়ে যাবে। কাজেই এই অবস্থা অক্রম নমুনায়নকে প্রথম শর্ত পূরণ করে না। কেননা কাগজ খন্ড টানার ফলে যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো ঝুড়ির মধ্যে প্রতিস্থাপন (Replaced) হচ্ছে না।

যদি উঠানো কাগজ খন্ডগুলির প্রতিস্থাপন করা যায় অর্থাৎ খন্ডগুলির ঠিকানা সূচক সংখ্যা আবার সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িতে রাখা হয় তখন নমুনা ক্রমাগত গ্রহণ করার পরও ক্রমিক খানার নমুনা গ্রহণের সম্ভাবনা ১/২০০ অক্ষুন্ন থাকবে। ৫০টি খানা নমুনা হিসাবে পাওয়া গেলে তখন প্রতিটি নমুনায়নের মধ্যে গৃহিত হওয়ার সম্ভাব্যতা (৫০*১/২০০ বা ০.২৫%) সমান থাকবে এই প্রক্রিয়ায় অক্রম নমুনায়নের শর্তদ্বয় পূরণ করা সম্ভব।

প্রাথমিকভাবে এই পদ্ধতিকে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। কেননা একটি ঠিকানাযুক্ত সংখ্যা একাধিকবার নমুনা হিসাবে গৃহিত হতে পারে। এক্ষেত্রে নমুনাটি ব্যহতঃ একাধিকবার গ্রহণ করাই সঙ্গত। কিন্তু কার্যতঃ নমুনা ও তৎপরবর্তি বিশ্লেষণ পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে বলে বিকল্প নমুনা গ্রহণের রীতি আছে। তবে অনেক সময় এই পন্থা অবলম্বন করলেও নমুনা পক্ষপাতমুক্ত নাও হতে পারে।

অক্রম সংখ্যা (Random Numbers) ঃ একটি ঝুড়িতে রক্ষিত সংখ্যা বা ঠিকানামালা থেকে অক্রম নমুনা সংগ্রহ মোটামুটি সন্তোষজনক ও সহজ পদ্ধতি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্র বিশেষে এটি একটি বিশাল সমগ্রকের ক্ষেত্রে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে। এক্ষেত্রে অক্রম নমুনায়নে একটি অক্রম সংখ্যামালা (Random Number) সারণীর সাহায্য গ্রহণ করা সুবিধাজনক। পরিশিষ্ট-ক' এ ১০০০ জোড়া অক্রম সংখ্যা সারণী দেওয়া হয়েছে। এর সাহায্যে ৫০ থেকে ৯৯টি সংখ্যাযুক্ত সমগ্রক থেকে নমুনায়ন সম্ভব। এই সংখ্যাগুলি কম্পিউটার পদ্ধতির সাহায্যে এমন ভাবে গৃহিত হয়েছে যে, প্রতিজোড়া সংখ্যার নমুনাভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাব্যতা রয়েছে। সারণীটি অক্রম বৈশিষ্ট্যযুক্ত হওয়ায় পাশাপাশি সারি অনুযায়ী বা উপর থেকে নীচে স্তম্ভ ধরে ব্যবহার করা যাবে।

সমগ্রকের মোট সংখ্যা ১০ হলে সারণী সংখ্যাগুলি এককভাবে (০ থেকে ৯) ১০০ হলে যৌথ সংখ্যা ধরে (০ থেকে ৯৯) ১০০০ হলে ত্রিসংখ্যাযুক্ত (০ থেকে ৯৯৯) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক সময় এই ধরনের সম্পূর্ণ সংখ্যাযুক্ত সমগ্রক নাও হতে পারে। যেমন, কোন এলাকার মোট জনসংখ্যা ১৩৩০ এক্ষেত্রে চার সংখ্যাযুক্ত অক্রম ব্যবহার করা উচিৎ হবে এবং ১ এর নীচে ও ১৩৩০-এর উপরে অক্রম সংখ্যাগুলি গৃহিত হবে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অক্রম সংখ্যাগুলি কোনভাবেই গুণিতব্য বা বিভাজ্য আকারে অথবা বর্গ বা ঘনমূলে পরিবর্তন করে ব্যবহার্য নয়।

২। নিয়মানুগ নমুনায়ন (Systemetic Sampling) ঃ

নিয়মানুগ নমুনায়ন (Systemetic Sampling) পদ্ধতিতে ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত সমগ্রক থেকে নির্দিষ্ট ব্যাপ্তিতে নমুনা এককসমূহ নির্ধারণ করা হয়। সমগ্রককে ক্রমানুযায়ী সাজানোর জন্য ভূমিতিক (Geographic), আক্ষরিক, সংখ্যাগত বা অন্য কোন ভিত্তি গ্রহণ করা যেতে পারে। মনে করি, একটি গ্রামে ১০০টি খানার মধ্যে ১০% নিয়মানুগ নমুনা চয়ন করতে হবে। এই খানাগুলির মালিকের নাম অনুযায়ী আক্ষরিক বা সংখ্যাযুক্ত ঠিকানা থাকলে ক্রমানুযায়ী অথবা গ্রামে সরাসরি গিয়ে ১ম খানাটি নির্ধারিত করে প্রতি ১০টি অন্তর খানা নিয়ে, অর্থাৎ ১১তম, ২১তম, ৩১তম ---- ইত্যাদি খানাগুলি নিয়মানুগ পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা যাবে। আপাত:দৃষ্টান্তে এপদ্ধতিতে নমুনায়ন সমগ্রকের মধ্যে পুরোপুরিভাবে পরিব্যাপ্ত হতে পারে। কেননা নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যাপ্তিতে নমুনাসমূহ চয়ন করা হয়ে থাকে। কাজেই অক্রম নমুনায়নে যেমন কোন নির্দিষ্ট অংশ থেকে নমুনা চলে আসার সম্ভাবনা থাকে তা এ ক্ষেত্রে ঘটে না। তা ছাড়া এই নমুনায়নে কোন এককের একাধিকভাবে নির্ধারিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। যে ক্ষেত্রে নমুনার আয়তন খুব বড় এবং সমীক্ষার কর্মস্থান থেকে নমুনা নির্ধারণ করতে হয় সেখানে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সুবিধাজনক। তবে সমগ্রকের বিন্যাসের মধ্যে যদি কোন সুনির্দিষ্ট ধাঁচ বা ধারা (Pettern/Trend) বা পর্যাবৃত্তি থাকে তা এই পদ্ধতির নমুনায়নে প্রতিফলিত হতে পারে। এক্ষেতে নিয়মানুগ নমুনায়ন পক্ষপাতদুষ্ট হতে বাধ্য।

আঞ্চলিক পরিকল্পনা সমীক্ষায় বা ভূমিতিক ব্যবহারের জন্য নিয়মানুগ নমুনায়নের স্থানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব। একে নিয়মানুগ স্থানিক নমুনায়ন (Systematic Spatial Sampling) বলে। এ ক্ষেত্রে তিনভাবে নিয়মানুগ স্থানিক নমুনায়ন চয়ন করা যাবে;

(ক) বিন্দু ভিত্তিক,

(খ) সারি ভিত্তিক, এবং

(গ) বর্গ ভিত্তিক।

মনে করি, কোন এলাকার ভূমি ব্যবহার জরিপের জন্য ২৫টি নমুনাক্ষেত্র প্রয়োজন। একটি সহজ পদ্ধতি হবে, এলাকার মানচিত্রটিকে সুবিধাজনক বর্গজালিতে বিভক্ত করা যাতে বর্গে ২৫ টি পরস্পর ছেদকারি বিন্দু (Points) পাওয়া যায় (চিত্র ১.২.১ ক)। এই ছেদকের স্থানগুলিকে নমুনা ক্ষেত্র ধরে জরিপ চালানো যাবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে, মানচিত্রটিকে ২৫টি সমদূরত্বযুক্ত সমান্তরাল রেখায় ভাগ করে সারিতে (Lines) অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের ভূমি ব্যবহারের আপেক্ষিক হার নমুনাভূক্ত করা যেতে পারে (চিত্র ১.২.১ খ)। এই সারিগুলি বিভিন্নভাবে টানা যেতে পারে। কোন বিশেষ ভূমিরূপ একাধিক সারিতে বিন্যস্ত হলেও এই পদ্ধতিটির

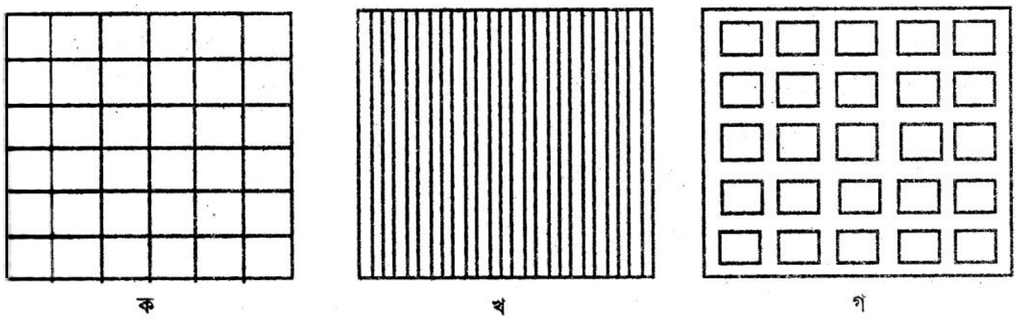

চিত্র ১.২.১: নমুনায়নের প্রধান তিনটি পদ্ধতি ঃ (ক) ২৫টি বিন্দু চয়ন; (খ) ২৫টি সারির অংশ, এবং (গ) ২৫টি বর্গ।

মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সঠিক নমুনায়ন সম্ভব। তৃতীয় পদ্ধতিতে, মানচিত্রটিকে ২৫টি সমান বর্গে বিভক্ত করে বর্গস্থ (Quadrats) ভূমি ব্যবহারকে নমুনাভূক্ত করে সমীক্ষা পরিকল্পনা করা যায় (চিত্র ১.২.১ গ)।

এই তিনটি পদ্ধতি আপাত:দৃষ্টিতে সহজ মনে হলেও প্রথমটিতে বিশেষ ধরনের ভূমি ব্যবহার, যেমন, বসত এলাকা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। এতে নমুনায়নটি পক্ষপাতমুক্ত থাকবে না। সারি পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত নির্ভুল হলেও কার্যত: এতেও অনুরূপ পক্ষপাত দেখা দেওয়া সম্ভব। অপরদিকে বর্গ পদ্ধতিতে বিশেষ ভূমি ব্যবহার নমুনাভূক্ত হতে পারে এবং নমুনায়ন পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। এই সমস্ত কারণে নিয়মানুগ স্থানিক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

৩। স্তর বিন্যস্ত নমুনায়ন (Stratified Sampling) ঃ

স্তর বিন্যস্ত বা স্তরিত নমুনায়নে (Stratified Sampling) প্রাথমিকভাবে সমগ্রকের মধ্যে বিদ্যমান উপাদান সমূহকে সমরূপ শ্রেণীর ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রতি স্তর/ভাগ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যা/অনুপাতে নমুনা চয়ন করা হয়। অন্যান্য নমুনায়নের ক্ষেত্রে সমগ্রকের অন্তর্নিহিত ভিন্নতার উপর কোন গুরুত্ব প্রদান করা হয় না, কেননা সমগ্রককে সাধারণত: সমসত্তা বিশিষ্ট মনে করা হয়। স্তর বিন্যস্ত নমুনায়নে সমগ্রককে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করার জন্য সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রয়োজন হয় এবং তদানুযায়ী স্তর বিন্যাসের যুক্তি বা ভিত্তি গ্রহণ করতে হয়।

সাধারণত: যে সমস্যার উপর অনুসন্ধান পরিচালনা করা হয় সেই সমস্যার মধ্যেই স্তর বিন্যাসের সংকেত পাওয়া যায় এবং সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাগুলিতে সমীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ভূমিতিক অবস্থানসমূহ স্তর বিন্যাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এই নমুনায়নের আওতায় সমগ্রকের স্তর বিন্যাসের পর যে সমস্ত বিভাগ পাওয়া যায় সেখান থেকে নির্দিষ্ট হারে বা সংখ্যায় অক্রম বা নিয়মানুগ পদ্ধতিতে নমুনাসমূহ চয়ন করা যাবে।

স্থানিক নমুনায়নের ক্ষেত্রেও পদ্ধতিটি প্রয়োগযোগ্য। এক্ষেত্রে পদ্ধতিটি আঞ্চলিক পরিকল্পনাবিদ বা ভূবিদদের জন্য বিশেষ উপযোগী। মনেকরি, ৯০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ভূমি ব্যবহার জরিপ করতে হবে যেখানে নিুরূপ তিন ধরনের মৃত্তিকা বিদ্যমান।

ক-অঞ্চল ঃ	বেলে মাটি	১০ বর্গ কিঃমিঃ,
খ-অঞ্চল ঃ	দোয়াঁশ মাটি	৫০ বর্গ কিঃ মিঃ,
গ-অঞ্চল ঃ	কাঁদা মাটি	৩০ বর্গ কিঃ মিঃ।

স্তর বিন্যস্ত নমুনায়নের মাধ্যমে যদি পুরো এলাকার ৪,৫০০টি কেন্দ্রের নমুনা সংগ্রহ করতে হয় তবে নিুরূপ সমানুপাতিক হারে নমুনা চয়ন করতে পারি ঃ

ক. ১০/৯০ * ৪৫০০ = ৫০০ জরিপ কেন্দ্র,

খ. ৫০/৯০ * ৪৫০০ = ২৫০০ জরিপ কেন্দ্র, এবং

গ. ৩০/৯০ * ৪৫০০ = ১৫০০ জরিপ কেন্দ্র।

এই পদ্ধতিতে নমুনায়নের ফলে প্রতিটি এলাকার অন্তর্নিহিত ভিন্নতা নমুনায়নের আওতায় পড়ে এবং সমীক্ষাভূক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। সমানুপাতিকহারে নমুনায়ন গ্রহণ করা হয় বলে স্থানের বা স্তরের গুরুত্ব অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্যের গুরুত্বও বজায় থাকে।

পাঠ সংক্ষেপঃ

*নমুনায়ন (Sampling) হলো প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমগ্রকের (Aggregate Population Universe) একটি অংশ পরীক্ষা করে সমগ্রক সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। নমুনাচয়নের গৃহিত পদ্ধতিকে জরিপ (Survey) বলে। ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যায় সাধারণত তিন ধরনের নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যে নমুনায়ন পদ্ধতিতে সমগ্রকের প্রতিটি এককের নির্বাচিত হওয়ায় সম্ভাবনা সমান এবং কোন কোন একক নমুনার অন্তর্ভূক্ত হবে তা দৈবের উপর নির্ভর করে তাকে **অক্রম নমুনায়ন** (Random Sampling) বলে। **নিয়মানুগ নমুনায়ন** (Systemetic Sampling) পদ্ধতিতে ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত সমগ্রক থেকে নির্দিষ্ট ব্যাপ্তিতে নমুনা এককসমূহ নির্ধারণ করা হয়। স্তর বিন্যস্ত বা **স্তরিত নমুনায়নে** (Stratified Sampling) প্রাথমিকভাবে সমগ্রকের মধ্যে বিদ্যমান উপাদান সমূহকে সমরূপ শ্রেণীর ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে প্রতি স্তর/ভাগ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যা/অনুপাতে নমুনা চয়ন করা হয়।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচিত অংশকে .... বলে।

১.২. অক্রম নমুনায়ন পদ্ধতিতে .... তত্ত্বের ভিত্তিতে নমুনা নির্বাচণ করা হয়।

১.৩. অক্রম নমুনায়নে একটি .... সারণীর সাহায্যে গ্রহণ করা হয়।

১.৪. নিয়মানুগ স্থানিক নমুনায়ন .... প্রকারে চয়ন করা যাবে।

১.৫. স্তর বিন্যস্ত নমুনায়নে .... বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. নমুনায়নের মাধ্যমে সমগ্রকের সকল উপাদান হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২.২. অক্রম নুনায়নে প্রতিটি এককের নমুনায়নে অন্তর্ভূক্ত হবার সম্ভাবনা সমান।

২.৩. অক্রম সংখ্যাকে বর্গ আকারে ব্যবহার করা যায় না।

২.৪. ভূমি ব্যবহার জরিপের জন্য অক্রম নমুনায়ন বিশেষ উপযোগী।

২.৫. স্তর বিন্যস্ত নমুনায়নে সমগোত্রীয় এককের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. অক্রম সংখ্যা ও তার ব্যবহার লিখুন।

২. নিয়মানুগ স্থানিক নমুনায়নের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

৩. একটি গ্রামে ৭৫০ টি নিম্নবিত্ত পরিবার, ২৪০ টি মধ্যবিত্ত পরিবার এবং ১০ টি উচ্চবিত্ত পরিবার আছে ১০০ পরিবারের নমুনা কোন পদ্ধতিতে এবং কিভাবে সংগ্রহ করবেন?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত নমুনায়ন পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. নিয়মানুগ নমুনায়ন পদ্ধতির ভৌগোলিক ব্যবহার সুবিধা ও অসুবিধাসহ আলোচনা করুন।

পাঠ-১.৩

মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য (Secondary Sources of Data)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য;
- নথিভূক্ত তথ্য উৎস;
- অপ্রকাশিত তথ্য উৎস;
- মানচিত্র, বিমানচিত্র ও উপগ্রহ চিত্র;
- সময়পঞ্জী ও ডাইরেকটরি; এবং
- ঐতিহাসিক তথ্য উৎস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

কোন গবেষণার কাজ করার সময় যে সব ঘটনা বা স্থান সম্বন্ধে সমীক্ষা করা হচ্ছে সেগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত ইতিপূর্বে আহরিত যে তথ্য পাওয়া যায় সেগুলিকে মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য (Secndary Sources of Data) বলে। অর্থাৎ অন্য কোন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যকে যখন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাজশাহীর রেশম শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা কাজ করার সময় যখন রাজশাহী থেকে পূর্ব প্রকাশিত কোন সাময়িকী বা বার্ষিকীর কোন প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তখন তাকে মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য বলা হবে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ নগরায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করার সময় অতীতে বিভিন্ন সময়ে এদেশের শহর-নগরগুলিরক্রম ব্যাপ্তি ও অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য যখন আদমশুমারী রিপোর্ট অথবা কোন সাময়িকী থেকে সংগ্রহ করা হয় তখন তাকে মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য বলা হবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যের উৎস

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা, বুলেটিন, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকা, সাময়িকী বা বার্ষিকী, প্রচারপত্র, প্রতিবেদন, অফিসের রেকর্ড, নথিপত্র, অফিসের কাজের জন্য সংগৃহীত তথ্য, শুমারী প্রভৃতি মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যের উৎস। সাধারণত: এই সমস্ত তথ্য মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায় এবং প্রকাশক এরূপ তথ্যসংগ্রহের প্রক্রিয়া, তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্য, সংগ্রহের ক্ষেত্র এবং উদ্দেশ্য তথ্যের সাথে প্রকাশ করেন। এরূপ উৎসগুলিকে প্রধানত: সর্বমোট ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়:

(ক) ১। নথিভূক্ত তথ্য উৎস;
২। অপ্রকাশিত তথ্য উৎস; এবং
৩। মানচিত্র।

(খ) ১। বিমানচিত্র ও উপগ্রহ চিত্র;
২। সময়পঞ্জি ও ডাইরেকটরি; এবং
৩। ঐতিহাসিক তথ্য উৎস।

নীচে এগুলো আলোচনা করা হলো-

ক.১.) নথিভূক্ত তথ্য উৎস (Sources of Recorded Data) ঃ

স্বতন্ত্র গবেষণায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বণিক সমিতি প্রভৃতি নিজ নিজ পরিসংখ্যান তথ্য প্রকাশ করেন। অপরদিকে, বিভিন্ন সরকারী অফিস বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা, জেলা কাউন্সিল, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিবেদন, বুলেটিন, পাক্ষিক, মাসিক বা বার্ষিকী প্রকাশ করে। এছাড়া পেশাগত সংস্থাসমূহ নিয়মিত জার্ণাল/সাময়িকী প্রকাশ করে থাকে। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য উৎসসমূহ হলো, আদমশুমারী সংস্থা, কৃষি শুমারী সংস্থা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা ও বিভিন্ন সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থাসমূহ প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে আদমশুমারীর একশত বৎসরেরও অধিক নথিভূক্ত তথ্য রয়েছে। পৃথিবীর খুব কম দেশেই এ ধরণের সন্নিবেশিত (Systematic) তথ্য পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে বিদ্যমান মাধ্যমিক তথ্যের উৎসসমূহ ঃ

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ১৮৬৮ সালে বৃটিশ শাসনামলে "A Statistical Abstract Relating to British India"-নামক প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে মাধ্যমিক উপাত্ত গ্রহণ করা হতো। পাকিস্তান আমলে গঠিত তৎকালীন "East Pakistan Bureau of Statistics" এর রূপান্তর ঘটে ১৯৭৪ সালে "Bangladesh Bureau of Statistics" বা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বি.বি.এস.) নামে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়। ১৯৭৭ সালে 'জাতীয় পরিসংখ্যান কাউন্সিল' গঠিত হয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের পরিসংখ্যান ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ও নীতি নির্ধারণের জন্য। তবে বি.বি.এস ছাড়াও বাংলাদেশের অনেক মন্ত্রণালয় ও দপ্তর থেকে পরিসংখ্যান বুলেটিন, বর্ষপঞ্জি ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান দপ্তরসমূহের নাম নিম্নে বর্ণিত হলো-

(ক) **শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন 'বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান বুরো ঃ** এই দপ্তর থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।

(খ) **বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান ঃ** ব্যাংকিং, মুদ্রা, আমদানী-রপ্তানী, আয়-ব্যয়, লেনদেনের ভারসাম্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উপাত্ত প্রাপ্তির উৎস।

(গ) **স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিসংখ্যানঃ** জন্ম, মৃত্যু, বিভিন্ন প্রকারের রোগ ও রোগী, মহামারী প্রভৃতি বিষয়ে প্রধানত বার্ষিক পরিসংখ্যান (মাসিক ভিত্তিতে নির্মিত) পাওয়া যায়।

(ঘ) **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও নিপোর্ট (NIPORT) সংস্থার পরিসংখ্যানঃ** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য, পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং মা ও শিশু সেবা বিষয়ক উপাত্তের উৎস।

(ঙ) **বাংলাদেশ সরকারী কর্ম-কমিশন ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ঃ** সরকারী চাকরিতে নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা হয়।

বি.বি.এস-সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তর যে সমস্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করে, সেগুলিই এদেশে প্রধানত মাধ্যমিক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব পরিসংখ্যান মূলত: নিন্মরূপ ঃ

(১) কৃষি পরিসংখ্যান;
(২) জনসংখ্যা এবং মানব বাস্তব্য পরিসংখ্যান;
(৩) শিক্ষা এবং সামাজিক পরিসংখ্যান;
(৪) শিল্প ও শ্রম পরিসংখ্যান;
(৫) আর্থিক পরিসংখ্যান;
(৬) বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান;
(৭) বাজার মূল্য পরিসংখ্যান;
(৮) জনস্বাস্থ্য এবং রোগ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান;
(৯) স্পার্সো এবং এল.জি.ই.ডি কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্র, বিমান এবং উপগ্রহ চিত্রজাত পরিসংখ্যান;
(১০) আবহাওয়া দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত জলবায়ু ও আবহাওয়া সংক্রান্ত পরিসংখ্যান; এবং
(১১) বাংলাদেশ সড়ক যোগাযোগ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান।

জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা, যেমন, ILO, UNESCO, UNICEF, ESCAP, FAO, WHO, WTO, IMF প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে বুলেটিন এবং পরিসংখ্যান তথ্য প্রকাশ করে।

প্রত্যেক দেশের বড় বড় নগর-শহরে একাধিক লাইব্রেরী থাকে। বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও যশোর ও অন্যান্য শহরে স্থানীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা বেসরকারী লাইব্রেরী রয়েছে। অনেক স্থানে, বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে বিদেশী সংস্থাগুলির লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে। এছাড়া প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী কলেজ ও বিদ্যালয়ের নিজস্ব লাইব্রেরী রয়েছে। অনেক বিত্তবান সৌখিন ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থাকে। এইসব লাইব্রেরীতে দেশী-বিদেশী বহু মূল্যবান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংরক্ষণ করা হয়। একজন গবেষক বিভিন্ন লাইব্রেরীতে সংগৃহীত পুস্তক থেকে প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যসংগ্রহ করতে পারেন।

আন্তর্জাতিক / বৈদেশিক সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যের উৎসসমূহ ঃ

নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক সংস্থাসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন উপাত্তের পরিসংখ্যান সাময়িক ও বার্ষিক ভিত্তিতে পরিবেশন করে, যা মাধ্যমিক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঃ

ক) ESCAP (এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন),

খ) FAO (খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)

গ) WB (বিশ্ব ব্যাংক)

ঘ) ILO (আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন)

ঙ) IMF (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল)

চ) UNCTAD (জাতিসংঘ বাণিজ্য সংস্থা)

ছ) UNDP (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি)

জ) UNESCO (জাতিসংঘ শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সহায়তা সংস্থা)

ঝ) UNEP (জাতিসংঘ পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচী)

ঞ) UNICEF (জাতিসংঘ শিশু তহবিল)

ট) WHO (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)

ঠ) UNFPA (জাতিসংঘ জনসংখ্যা কার্যক্রম)

ড) USAID (যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সাহায্যদাতা সংস্থা)

ঢ) DANIDA (ডেনমার্কিয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা)

ণ) NORAD (নরওয়েজিয়ান সাহায্য সংস্থা)।

ক.২) অপ্রকাশিত তথ্য উৎস (Unpublished Data Sources) ঃ

বেশ কিছু তথ্য রয়েছে যা নথিবদ্ধভাবে কখনও প্রকাশিত বা মুদ্রিত হয় না। বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণার জন্য এ ধরণের তথ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশসহ বহুদেশে গ্রাম পর্যায়ে খাজনা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য, ভূমি ক্রয়-বিক্রয় দলিল সম্পর্কীয় তথ্য, স্থানীয় ভূমি জরিপ বিশেষ করে চরাঞ্চলে ভূমি জরিপের ফলাফল, অথবা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আগত রোগী ও রোগ সম্পর্কে তথ্য ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে অথবা বিষয়ভিত্তিক ক্ষুদ্র পরিসর কিন্তু নিবিড় গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য এ ধরণের ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত তথ্য অতীব মূল্যবান মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যউৎস।

ক.৩) মানচিত্র (Maps) ঃ

যে কোন স্কেলে প্রকাশিত মানচিত্র মূল্যবান মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে এ ধরণের প্রকাশিত মানচিত্রের মধ্যে ভূ-সংস্থান মানচিত্র থেকে ভৌত ও সংস্থানিক, মানব বাস্তব্য এবং ভূমি ব্যবহার তথ্য আহরণ করা সম্ভব। এমন কি এ ধরণের মানচিত্র কেন্দ্রিক তথ্য প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহীত তথ্যের পূর্বশর্ত হিসেবেও ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র ১" = ১ মাইল অথবা ১" = ৪ মাইল স্কেলে ভূমি জরিপ বিভাগ থেকে পাওয়া যায়। আবার স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে থানা পর্যায়ের ১" = ১৬ মাইল স্কেলে মানচিত্রে মানবসৃষ্ট অবকাঠামো, ভূমিরূপ, এমন কি সাধারণ ভূমি ব্যবহার তথ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ের অফিস হতে মৌজা মানচিত্রে, বিশেষ করে কৃষি ভূমির বিন্যাস ও বসত বিস্তরণ তথ্য পাওয়া যায়।

বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত মানচিত্র, যেমন, জরিপ মানচিত্র, নৌ পরিবহণের জন্য প্রস্তুত মানচিত্র, আবহ মানচিত্র ইত্যাদি ভৌগোলিক সমীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণের নির্ভরযোগ্য উৎস বলা যায়।

খ.১) বিমান ও উপগ্রহধৃত চিত্র (Aerial and Satellite Images) ঃ

মানচিত্রের মতই বিমানধৃত চিত্র ভূসংস্থানিক বিশ্লেষণের জন্য ভূগোলে একটি বিশেষ উপযোগী মাধ্যমিক তথ্যউৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। প্রাপ্ত মানচিত্র ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও বিমানধৃত চিত্র মূল্যবান তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কেননা এই সমস্ত চিত্র প্রধানত: বৃহৎ স্কেলে হয়ে থাকে যা অনেক সময় ভূসংস্থানিক (Topographic) মানচিত্রের স্কেলের সাথে তুলনাযোগ্য। বিমান ও উপগ্রহধৃত চিত্রকে অনেক সময় আকাশধৃত চিত্র বা দূর অনুধাবন তথ্য বলা হয়ে থাকে।

পর্যবেক্ষণের সময়ে দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যাওয়া জিনিস, জটিল সীমারেখা সনাক্ত করা, এবং নির্ভুলভাবে ও দ্রুত নমুনা নির্বাচণের জন্য বিমানচিত্র বিশেষ উপযোগী। বিভিন্ন বস্তু পৃথক করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক এলাকার জন্য প্রস্তুতকৃত মোজাইক চিত্রগুলি অধিক পরিমানে ব্যবহৃত হয়। একটি স্থানের বিমানধৃত চিত্র দুইভাবে গৃহীত হয়: তির্যক এবং উলম্ব; এবং স্টেরিওস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে উভয় চিত্রের সমন্বয় ঘটিয়ে চিত্রস্থ ত্রি-মাত্রিক তথ্য লাভ করা যায়। সাম্প্রতিককালে কম্পিউটার মানচিত্রায়ন এবং জি.আই.এস. পদ্ধতি ব্যবহার করে সরাসরি আকাশধৃত চিত্র থেকে বিষয়ভিত্তিক তথ্যযুক্ত মানচিত্র তৈরী করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়।

অপরদিকে, উপগ্রহধৃত চিত্রের ব্যবহার বিমানধৃত চিত্রের অনুরূপ। তবে যেহেতু উপগ্রহধৃত চিত্র ক্ষুদ্র স্কেলযুক্ত অর্থাৎ একটি ব্যাপক এলাকা প্রদর্শন করে সেহেতু এই ধরণের চিত্র ভূমি দৃশ্য (Land Cover), ভূমি ব্যবহার, ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী মালার বিন্যাস থেকে শুরু করে ভূ-তাত্ত্বিক, মৃত্তিকা ইত্যাদি সম্পর্কীয় তথ্যউৎস হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের তথ্যের উপযোগীতা ও নির্ভুলতা নিশ্চয়তার জন্য প্রকৃত এলাকার স্থান বিশেষের সাথে তুলনামূলক নিরীক্ষণ (Ground Truthing) প্রয়োজন। নচেৎ বিশ্লেষণ ভ্রান্তিপূর্ণ হতে পারে। বিমানধৃত চিত্রের মতই উপগ্রহধৃত চিত্র কম্পিউটার প্রযুক্তি ও জি.আই.এস. পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন মানচিত্র তৈরী করা যায়। এই ধরণের তথ্য থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকার তথ্যসংগ্রহ সম্ভব। বাংলাদেশে মহাশূণ্য গবেষণা এবং দূর অনুধাবন সংস্থা (SPARRSO), ফ্রান্স (SPOT), যুক্তরাষ্ট্র (NASA) এবং ভারত (IRS) থেকেও উপগ্রহধৃত চিত্র সংগ্রহ করা যায়।

খ.২) সময়পঞ্জী এবং ডাইরেক্টরী (Time-Tables Schedules and Directories) ঃ

বিভিন্ন ধরণের যানবাহন-সময়পঞ্জী পরিবহণ সংক্রান্ত তথ্যের মূল্যবান উৎস। এ ধরণের উৎস যানবাহনের গমনাগমন পথ জনপরিবহণ এবং বিভিন্ন পণ্য-দ্রব্য পরিবহণ তথ্য লাভ করা যায়। এই সমস্ত তথ্য জাতীয় পর্যায়ে অথবা আঞ্চলিক পরিবহণ ব্যবস্থাপনা নির্ণয় এবং পরিকল্পনার জন্য মূল্যবান উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধরণের

ডাইরেক্টরী মূল্যবান বিষয়ভিত্তিক তথ্যউৎস হিসেবে পরিগণিত হতে পরে। এই ধরণের তথ্য সাধারণ নগর গাইড পুস্তক হতে শুরু করে টেলিফোন বা গৃহকর্মসংস্থান সংক্রান্ত হতে পারে। কোন কোন দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ হাট-বাজার ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত ডাইরেক্টরী প্রতি বছর অথবা নির্দিষ্ট সময় বিরতিতে প্রকাশ হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার জন্য এই ধরনের তথ্য স্থানিক ও কালীন উভয় পর্যায়ের মূল্যবান মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

খ.৩। ঐতিহাসিক উৎস (Historical Events) ঃ

যে কোন গবেষণা কর্ম বা সমীক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমিকা বর্তমান পরিস্থিতি প্রকাশ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ জন্য ঐতিহাসিক তথ্য ভূবিদদের জন্য প্রাক্-সমীক্ষাকালে ও সমীক্ষা পরিচালনাকালে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্যউৎস।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত পুরাতন বা অতীত সময়কালের নথিভূক্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তথ্য উৎসসমূহ ঐতিহাসিক মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই সমস্ত তথ্য একটি দেশের গণ গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার এবং জাতীয় তথ্য সংরক্ষণাগারে (National Archive) পাওয়া যায়। বাংলাদেশে আদমশুমারীর প্রায় ১০০ বৎসরের অধিক সময়কার ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। অনুরূপভাবে, জেলাপর্যায়ে সরকারী মহাফেজখানায় ভূমি সংক্রান্ত মূল্যবান দলিলপত্র রয়েছে যার সমীক্ষা ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

একইভাবে প্রাচীন মানচিত্র থেকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক এবং ভূ-সংস্থানিক, ভূমি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ক ভূ-ঐতিহাসিক তথ্য লাভ সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের জন্য ভ্যানডেন ব্রুক (১৭৬০) এবং রেনেল (১৭৮৪)-এর মানচিত্র নদীমালা বিন্যাসের কালীক পরিবর্তন নির্দেশনায় বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। একইভাবে ফরাসী পানিতত্ত্ববিদ বেলিন-এর ১৭৬৪ সালে প্রণীত মানচিত্র বাংলাদেশের প্রধান জনবসত এবং মানব বাস্তব্য সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছে। নদী পরিবাহ ব্যবস্থা বা জনবসত পরিবর্তন ধারা অনুধাবনে এই সমস্ত ঐতিহাসিক মানচিত্র গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকামূলক তথ্য প্রদানে সক্ষম।

উপরের আলোচনায় এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, প্রাথমিক উৎস থেকে গবেষককে উপাত্ত সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু মাধ্যমিক উৎস থেকে গবেষক উপাত্ত সংগ্রহ করেন না, বরঞ্চ উপাত্ত চয়ন বা সংকলন করে ব্যবহার করেন। তাই বলা যায় যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য মূলতঃ ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যের কারণে। একই উপাত্ত অন্য কেউ ধার করে ব্যবহার করলে তা মাধ্যমিক উপাত্তে রূপলাভ করে।

পাঠ সংক্ষেপ ঃ

অন্য কোন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যকে যখন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য বলে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা, বুলেটিন, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পত্রিকা, সাময়িকী বা বার্ষিকী, প্রচারপত্র, প্রতিবেদন, অফিসের রেকর্ড, নথিপত্র, অফিসের কাজের জন্য সংগৃহীত তথ্য, শুমারী প্রভৃতি মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যের উৎস। এই ধরণের তথ্যকে সর্বমোট ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে: ১। নথিভূক্ত তথ্যউৎস ২। অপ্রকাশিত তথ্যউৎস ৩। মানচিত্র ৪। বিমানচিত্র ও উপগ্রহ চিত্র ৫। সময়পঞ্জি ও ডাইরেকটরি এবং ৬। ঐতিহাসিক তথ্য উৎস। বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যকে সাধারণত মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ-১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. গবেষণার সাথে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু অন্য কোন উদ্দেশ্যে পূর্বে সংগৃহীত তথ্যকে .... তথ্য বলে।

১.২. মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যকে সর্বমোট .... ভাগে বিভক্ত করা হয়।

১.৩. পেশাগত সংস্থাসমূহ নিয়মিত .... প্রকাশ করে থাকে।

১.৪. বাংলাদেশের ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র .... অথবা .... স্কেলে ভূমি জরিপ বিভাগ থেকে পাওয়া যায়।

১.৫. বিমান ও উপগ্রহধৃত চিত্রকে অনেক সময় .... বা .... তথ্য বলা হয়ে থাকে।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য।

২.২. বাংলাদেশে আদমশুমারীর পঞ্চাশ বৎসরের নথিভূক্ত তথ্য আছে।

২.৩. জমি ক্রয়ের দলিল একটি অপ্রকাশিত তথ্য উৎস।

২.৪. স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর থানা পর্যায়ের ১" = ২০ মাইল স্কেলে মানচিত্র প্রকাশ করে।

২.৫. গ্রন্থাগার ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৫ টি মাধ্যমিক তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন।

২. অপ্রকাশিত তথ্য উৎস কি?

৩. মানচিত্রকে কিভাবে তথ্যউৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়?

৪. ঐতিহাসিক তথ্য উৎসের বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য বলতে কি বোঝায়? বিভিন্ন প্রকারের মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য উৎসের বিবরণ দিন।

২. বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যের প্রধান উৎসসমূহ কি ?

৩. বিমানচিত্র এবং উপগ্রহধৃত চিত্রের বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা ঃ ইউনিট-১

পাঠ-১. ১.১. সংখ্যাগত তথ্য, ১.২. উপাত্ত, তথ্যমালা, ১.৩. তিন, ১.৪. পাঁচ, ১.৫. পর্যবেক্ষণ, ১.৬. লিখে, ১.৭. ষাট।

২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. মি, ২.৫. স, ২.৬. মি, ২.৭. মি।

পাঠ-১.২

১.১. নমুনা, ১.২. সম্ভাবনা, ১.৩. অক্রম সংখ্যামালা, ১.৪. তিন, ১.৫. সমগ্রককে।

২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. মি, ২.৫. স।

পাঠ-১.৩

১.১. মাধ্যমিক পর্যায়ের, ১.২. ছয়, ১.৩. জার্ণাল/সাময়িকী, ১.৪. ১δ = ১ মাইল, ১δ = ১৬ মাইল, ১.৫. আকাশধৃত, দূর অনুধাবন।

২.১. স, ২.২. মি, ২.৩. স, ২.৪. মি, ২.৫. স।

ইউনিট-২

তথ্যের প্রকারণ (Types of Data)

ইউনিট-১ এ আপনি তথ্যের সংজ্ঞা এবং বিশেষ করে তথ্যের উৎসসমূহ সম্পর্কে বিশদ ধারণা লাভ করেছেন। এই ইউনিটে তথ্যের শ্রেণীবিভাগ ও ধরণ এবং তথ্য সংক্ষিপ্তকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। ইউনিট-১এর আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, তথ্য পরিমানবাচক অথবা গুণবাচক হতে পারে। পরিমানবাচক তথ্য সংখ্যা (Number)দ্বারা প্রকাশ করা যায় কিন্তু গুণবাচক তথ্য প্রধানত: বিবরণমূলক হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু গুণবাচক তথ্যকে মান আরোপের (Scoring) মাধ্যমে পরিমানবাচক তথ্যে রূপান্তরিত করে ব্যবহার করা যায়। তথ্য সহজবোধ্য করার জন্য সংক্ষিপ্তকরণের (Summarization) প্রয়োজন হয়। এর মাধ্যমে তথ্য শ্রেণীকরণ, বাছাই ও ব্যাখ্যা সহজতর হয়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হচ্ছে-

পাঠ-২.১ *তথ্যের একক ও শ্রেণীবিভাগ*

পাঠ-২.২ *তথ্য শ্রেণীকরণ*

পাঠ-২.৩ *গণসংখ্যা নিবেশন*

পাঠ-২.৪ *তথ্য শ্রেণীকরণ পদ্ধতি*

পাঠ-২.১

তথ্যের একক ও শ্রেণীবিভাগ (Units and Classification of Data)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- তথ্যের একক;
- ব্যষ্টি, চলক এবং সংখ্যা;
- বিচ্ছিন্ন্য এবং অবিচ্ছিন্ন্য চলক; এবং
- তথ্যের পরিমিতি মাপক সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

তথ্যের একক

তথ্যের সমগ্রকের (Population/Universe/Aggregate) প্রতিটি এককের (Unit) একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে। এরূপ বৈশিষ্ট্য দুই ধরনের:

(ক) পরিমাণবাচক (Quantitative); এবং

(খ) গুণবাচক (Qualitative)।

(ক) পরিমাণবাচক বৈশিষ্ট্য ঃ তথ্যের এককসমূহের সকল বৈশিষ্ট্য সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। শুধু যে বৈশিষ্ট্যসমূহকে সংখ্যা বা সংখ্যারাশিদ্বারা প্রকাশ করা যায় তাকে পরিমাণবাচক বৈশিষ্ট্য বলে। অপর কথায়, যে সকল বৈশিষ্ট্যের সংখ্যাত্বক প্রকাশ সম্ভব তাকে পরিমানবাচক তথ্য বলে। পরিসংখ্যানশাস্ত্রে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্যকে চলক (Variable) বলে। যেমন, কোন স্থানের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, ফসলের উৎপাদন, একটি দেশের আয়তন ও জনসংখ্যা ইত্যাদি।

(খ) গুণবাচক বৈশিষ্ট্য ঃ এককের যে বৈশিষ্ট্যসমূহকে সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, সেগুলোকে গুণবাচক বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন, কোন স্থান সম্পর্কে কোন ব্যাক্তির অনুধাবন বা প্রত্যক্ষণ, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি। এ ধরনের তথ্য সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তবে কিছু গুণবাচক তথ্যকে মান আরোপের মাধ্যমে (Scoring) পরিমানবাচক তথ্যে রূপান্তর করা যায়।

রিমাণবাচক বৈশিষ্ট্য	গুণবাচক বৈশিষ্ট্য
- আদমশুমারী তথ্য - কৃষি শুমারী তথ্য - আবহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান - জন্ম-মৃতু সংক্রান্ত পরিসংখ্যান - অভিগমন সংক্রান্ত তথ্য - ভূমির উচ্চতা - ভূমি ব্যবহারের পরিমাণ - রোগের প্রকৌপতা ইত্যাদি	- ব্যক্তি বা পারিবারিক সদস্যদের কোন বিষয়ে অনুভূতি - কোন স্থানের আবহাওয়া সম্পর্কে মতামত - কোন স্থানে বাসযোগ্যতা সম্পর্কে অভিমত - ভূমির উর্বরতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষণ - কোন স্থানকে স্বাস্থ্যকর বলে চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি। - কোন বিষয় সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক অভিমত ইত্যাদি।

ব্যষ্টি, চলক এবং সংখ্যা ঃ

ব্যষ্টিঃ পরিসংখ্যানে তথ্য সংগ্রহের একককে ব্যষ্টি (Individual) বলে। প্রাথমিকভাবে তথ্য সারিকে যেভাবে সারণীকরণ করা হয় তাতে তথ্যমালায় প্রতিটি ব্যষ্টির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় বজায় থাকে। উদাহারণস্বরূপ, বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যার একটি সারণীতে তথ্য সারির প্রতিটি নগর হবে একেকটি ব্যষ্টি।

চলক ঃ অপরদিকে ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য বা পরিচয়জ্ঞাপক মানকে চলক (Variable) বলে। যেমন, উপরের উদাহরণে প্রতিটি নগরের জনসংখ্যা বা অন্যান্য যে কোন পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যকে চলক বলা হবে।

চলক দুই ধরনের হতে পারে:

(ক) বিচ্ছিন্ন চলক (Discrete বা Non-continuous) এবং

(খ) অবিচ্ছিন্ন চলক (Non-discrete বা Continuous)

(ক) বিচ্ছিন্ন চলক ঃ যে চলকসমূহ শুধু পূর্ণ সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ সম্ভব তাকে বিচ্ছিন্ন চলক বলে। অন্য কথায়, যে চলকের মান ভগ্নাংশে প্রকাশ সম্ভব নয়, তাকে বিচ্ছিন্ন চলক বলে। যেমন, আপনি যে শ্রেণীতে অধ্যায়ন করছেন অর্থাৎ স্নাতক-১ম পর্বের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬৫ জন। তেমনি,স্নাতক ২য় ও ৩য় পর্বে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬০ এবং ৫৮ জন। এই সংখ্যাগুলি বিচ্ছিন্ন চলক, কেননা এ ধরনের তথ্য ভগ্নাংশে - অর্থাৎ $৬৫\frac{১}{৪}$ বা ৬০.২৫ - এ ভাবে দেখানো যায় না।

(খ) অবিচ্ছিন্ন চলক ঃ কোন সমগ্রকের এককের যে বৈশিষ্ট্যসমূহকে পূর্ণসংখ্যায় বা ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় তাকে অবিচ্ছিন্ন চলক বলে। যেমন, কোন স্থানের তাপমাত্রা - ৩০.৭° ফাঃ ; বৃষ্টিপাত ১২০০.৯০ সে.মি. অথবা কোন পাহাড়ের উচ্চতা $২২০\frac{১}{২}$ মিটার ইত্যাদি।

একটি তথ্য সারির চলকসমূহকে, বিশেষ করে লৈখিকচিত্র অথবা স্তম্ভ চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর সময়, এমন কি অন্যান্য বিশেষ পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহারের সময় (যেমন, চলক সমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়), দুই ভাবে বিশেষিত করে নির্দিষ্ট করা হয় ঃ

ক) স্বাধীন চলক (Independent Variable); এবং

খ) অধীন চলক (Dependent Variable)।

একটি কালীন তথ্য সারিতে কাল বা সময় সবসময় স্বাধীন চলক হিসেবে পরিগণিত হয়। এই সময় বা কালের সাথে যদি শষ্য উৎপাদন তথ্য থাকে, তখন এই তথ্যকে অধীন চলক বলা হবে। একই ভাবে বাংলাদেশের ১৯০১ থেকে ২০০১ সালের আদমশুমারী তথ্য সারিতে শুমারী বৎসরসমূহ স্বাধীন চলক এবং নির্দিষ্ট শুমারী বৎসরসমূহের জনসংখ্যা হবে অধীন চলক।

একটি লেখচিত্রে স্বাধীন চলক আনুভূমিক বা ০-X রেখা বরাবর পরিমাপ করা বা দেখানো হয়, এবং অধীন চলক উলম্ব বা ০-Y রেখা বরাবর পরিমাপ করা বা দেখানো হয় (চিত্রঃ ২.১.১)। মনে রাখতে হবে যে, উভয় বাহুর পরিমাপ ০ (শূন্য) থেকে গণনা করতে হবে। ০-X বাহুর মান আরোপ করার পর তদানুযায়ী ০-Y এর মান প্রদর্শন করা যাবে। ০-X (আনুভূমিক) বাহুকে এ্যাবসিসা (Abscissa) এবং ০-Y (উলম্ব) বাহুকে অর্ডিনেট (Ordinate) বলা হয়।

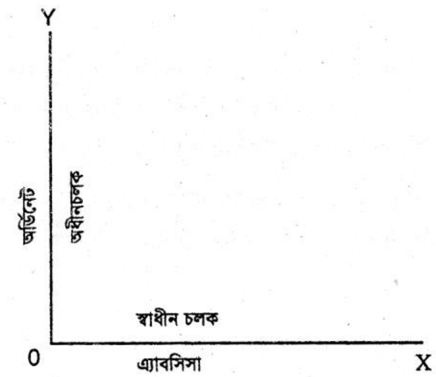

চিত্র ঃ ২.২.১- স্বাধীন ও অধীন চলকের লৈখিক উপস্থাপন

সংখ্যা ঃ আলোচ্য পুস্তকের পরিধিতে দুই ধরনের সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে। পূর্ণ সংখ্যা (Integer) এবং প্রকৃত সংখ্যা (Real Number)। পূর্ণ সংখ্যা সাধারণভাবে ভগ্নাংশ বা দশমিকবিহীন অখন্ড বা সম্পূর্ণ সংখ্যা। পূর্ণ সংখ্যা ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূণ্য হতে পারে, যেমন ৮, ২২২, -৯, -২৬১, ০ ইত্যাদি। প্রকৃত সংখ্যা অকৃত্রিম বা অপরিবর্তনশীল আসল সংখ্যা। এক্ষেত্রে অকৃত্রিমতা সংরক্ষিত হয় সংখ্যাটিতে প্রকৃত ভংগ্নাংশ বা দশমিক মান অক্ষুন্ন রেখে। প্রকৃত সংখ্যা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে, যেমন, ১১.১২, -৩৬০.০০, ৬$\frac{৩}{৪}$ ইত্যাদি।

তথ্যের পরিমিতি মাপক ঃ

তথ্যের বিভিন্ন ধরনের পরিমিতি মাপক (Scale of Measurement) অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা নির্দিষ্ট ধরনের পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষ ধরনের মাপকের উপর নির্ভর করে থাকে। প্রধানত: চার ধরনের পরিমিতি মাপক পরিসংখ্যানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঃ

ক) নামীয় (Nominal), খ) ক্রমসূচক (Ordinal), গ) ব্যাপ্তিসূচক (Interval), এবং ঘ) অনুপাত (Ratio)।

নীচের ছকে মাপক গুলির সাধারণ ভিত্তিগত বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে ঃ

মাপক	সম্পর্কীয় মূল প্রশ্ন	ভূমিতিক ও অন্যান্য উদাহরণ
নামীয়	বস্তুগুলি কি কতকগুলি শ্রেণীর একটির অন্তর্গত?	- পরিমাপের মূল পার্থক্যকরণ; - প্রশ্নমালাভূক্ত উত্তরের গুরুত্ববোধক।
ক্রমসূচক	বস্তুগুলি কি একে অপরের বেশী বা কম, উর্দ্ধে বা নিম্নে?	- নগর বা স্থান বিশেষকে গুরুত্ব অনুযায়ী সারিবদ্ধকরণ; - পরিবহন বিকাশের মানদন্ড।
ব্যাপ্তিসূচক	দুইটি ব্যাপ্তিসূচক মান কি সমপর্যায়ের/সমান?	- সময় কালীন ব্যাপ্তির অন্তর; - মানচিত্রের সমমান রেখার অন্তর।
অনুপাত	দুইটি অনুপাত কি সমান/ সমপর্যায়ের?	- প্রতিভূ আয়তনে উপাদান; - মাথাপিছু আয়; - প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা।

নামীয় মাপক ঃ

নামীয় মাপকের আওতায় কোন একককে কোন চলকের মান অনুযায়ী দুইটি শ্রেণীভাগের একটির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মনে করি, বাংলাদেশের যে সমস্ত জেলায় সেনাছাউনী রয়েছে সেগুলিকে '১' মানেরদ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং যে সমস্ত জেলায় সেনাছাউনী নেই সেগুলিকে '০'দ্বারা চিহ্নিত করা যাবে। এই মানদ্বয় ব্যবহার হয়েছে কেবল কোন বস্তুর অবস্থান আছে কি নাই হিসেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, হ্যাঁ বাচক '১' সংখ্যাটি বস্তুটির অবস্থানের সংখ্যা নির্দেশ করে না - বস্তুটির একাধিক উপস্থিতি হলেও নামীয় মাপকের আওতায় মানসূচক সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে। একইভাবে, নামীয় মাপকের আওতায় চিকিৎসা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা কলেজ, নির্দিষ্ট কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির অবস্থান মাত্র প্রকাশ করা যাবে।

ক্রমসূচক মাপক ঃ

ক্রমসূচক মাপকের ক্ষেত্রে এককসমূহকে নির্দিষ্ট কোন মান অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়। কোন কোন উপাত্ত বা তথ্যসারির ক্রম সূচক মাপকে প্রকাশ করা হয়। প্রত্যক্ষণ ভূবিদ্যায় (Perception Geography) কোন স্থান সম্পর্কে পছন্দ বা মূল্যায়ন সম্পর্কীয় তথ্যাদি ক্রমসূচক মাপকের ধারায় প্রকাশ করা হয়। ফলে, উপাত্তসমূহের ক্রমাগত অবস্থান নির্ণয় করা সহজ হয়। একইভাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার আকার ভিত্তিক নগরসমূহের মান অনুযায়ী ক্রমসূচক মাপকের আওতায় বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম অংশ সন্নিবেশ করা যাবে। এই মাপকে চলকসমূহের মানগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত পার্থক্যের মাত্রা সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায়।

ব্যাপ্তিসূচক মাপকঃ

এই মাপকেরদ্বারা পরিমান একক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু মূলবিন্দু সম্বন্ধে তথ্য থাকে না। যেমন, কোন স্থানের সেলসিয়াস বা ফারেনহাইটে প্রকাশিত তাপমাত্রার পরিমান। ব্যাপ্তিমাপকে কোন একক মূলবিন্দু থাকে না এবং পরিমাপসমূহ যদৃচ্ছ প্রকারের হয় - অর্থাৎ যে কোন পর্যায় পর্যন্ত দশমিক মাত্রায় প্রকাশ করা যায়। এই ধরনের তথ্যে কোন অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের কোন উপাত্ত ভিত্তিক (যেমন, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা ইত্যাদি) ভিন্নতার প্রকৃত প্রকাশ সম্ভব।

অনুপাতসূচক মাপকঃ

সাধারণত: অনুপাতসূচক মাপকে ব্যাপ্তিসূচক মাপকের সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান এবং এই সূচকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে দু'টি চলকের মধ্যে যখন অনুপাত নির্ণয় করা হয় তখন মানটি চলক দু'টি থেকে ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে। এ ক্ষেত্রে মাপকে ব্যাপ্তি মাপকের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে এবং এর সাথে একটি অদ্বিতীয় সূচক অক্ষুণ্ন থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, এই মাপকে তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস) পরিমাপ করলে ১০ সে. তাপ মাত্রা অবশ্যই ৫ সে. তাপের দ্বিগুণই হবে। সাধারণত: এই মাপকে প্রকৃত সংখ্যামান ব্যবহৃত হয় এবং অবিছিন্ন পরিমাপ হিসেবে পরিগণিত হয়। অপর উদাহরণ হলো, যেমন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি:মি: তে ৮৪০ জন। এখানে চলকের মান অক্ষুণ্ন থেকে ভিন্নতর রূপ গ্রহণ করেছে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, অনুপাতসূচক মাপক একটি ব্যাপ্তিসূচক মাপকও বটে, তবে একটি ব্যাপ্তিসূচক মাপক সচরাচর অনুপাতসূচক মাপক কখনই নয়।

পাঠ সংক্ষেপ ঃ

তথ্যের সমগ্রকের প্রতিটি এককের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকবে। যে বৈশিষ্ট্যসমূহকে সংখ্যা বা সংখ্যারাশিদ্বারা প্রকাশ করা যায় তাকে পরিমাণবাচক বৈশিষ্ট্য বলে। এককের যে বৈশিষ্ট্যসমূহকে সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, সেগুলোকে গুণবাচক বৈশিষ্ট্য বলে। পরিসংখ্যানে তথ্য সংগ্রহের একককে ব্যষ্টি বলে। ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য বা পরিচয়জ্ঞাপক মানকে চলক বলে। চলক দুই ধরনের হতে পারে: (ক) বিচ্ছিন্ন চলক এবং (খ) অবিচ্ছিন্ন চলক। চার ধরনের পরিমিতি মাপক পরিসংখ্যানে ব্যবহৃত হয়ে থাকেঃ (ক) নামীয়, (খ) ক্রমসূচক, (গ) ব্যাপ্তিসূচক, এবং (ঘ) অনুপাত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. যে সকল বৈশিষ্ট্যের সংখ্যাত্বক প্রকাশ সম্ভব তাকে .... তথ্য বলে।

১.২. যে চলকের মান ভগ্নাংশে প্রকাশ সম্ভব নয়, তাকে .... চলক বলে।

১.৩. লেখচিত্রের ০-X (আনুভূমিক) বাহুকে .... এবং ০-Y (উলম্ব) বাহুকে .... বলা হয়।

১.৪. প্রকৃত সংখ্যা .... বা .... হতে পারে।

১.৫. অনুপাতসূচক মাপক একটি .... মাপকও বটে, তবে একটি .... মাপক সচরাচর অনুপাতসূচক মাপক কখনই নয়।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. এককের যে বৈশিষ্ট্যসমূহকে পূর্ণসংখ্যায় বা ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় তাকে বিচ্ছিন্ন চলক বলে।

২.২. পূর্ণ সংখ্যা সাধারণভাবে ভগ্নাংশ বা দশমিকবিহীন অখন্ড বা সম্পূর্ণ সংখ্যা।

২.৩. প্রকৃত সংখ্যা কৃত্রিম বা পরিবর্তনশীল সংখ্যা।

২.৪. ব্যাপ্তিমাপকে কোন একক মূল বিন্দু থাকে না এবং পরিমাপসমূহ যদৃচ্ছ প্রকারের হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. তথ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

২. বিচ্ছিন্য ও অবিচ্ছিন্য চলকের পার্থক্য উদাহরণ সহ লিখুন।

৩. পূর্ণসংখ্যা ও প্রকৃত সংখ্যা বলতে কি বোঝায়।

৪. ব্যাপ্তি, চলক এবং সংখ্যার মধ্যে পার্থক্যকরণ করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. উদাহরণসহ চলকের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

২. পরিমিতি মাপক বলতে কি বুঝায়। বিভিন্ন প্রকারের পরিমিতি মাপক আলোচনা করুন।

পাঠ-২.২

তথ্য শ্রেণীকরণ (Classificatin of Data)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস; এবং
- শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

তথ্যের বিভিন্ন শ্রেণীতে রীতিবদ্ধভাবে বিন্যাস বা সাজানোকে তথ্য শ্রেণীকরণ বা তথ্য শ্রেণীবিন্যাস বলে। কিন্তু তথ্যকে শ্রেণীকরণের সময় নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

ক. **শ্রেণীর মধ্যে প্রকাশ্য পার্থক্য :** একটি তথ্য সারিকে শ্রেণীকরণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একটি চলক যেন একাধিক শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত না হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের জেলাসমূহের স্বাক্ষরতা হার (শতকরা) যদি এভাবে শ্রেণীকরণ হয়: ৫-১০%; ৭-১৪%; ১২-২০% ইত্যাদি তাহলে দেখা যাবে যে বেশ কিছু জেলা একাধিক শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত হবে। এতে কোন অর্থপূর্ণ বিন্যাস বা চিত্র ধরা পড়বে না। কিন্তু যদি এরকম শ্রেণীকরণ হয়: <১০; ১১-২০;২০%> তা'হলে উপরোক্ত সমস্যা পরিহার করে একটি যুক্তিপূর্ণ তথ্যবিন্যাস অর্জন সম্ভব। এই শ্রেণীভূক্ত তথ্য ব্যাখ্যাও ভাল হবে।

খ. **রীতিবদ্ধ ভিত্তি :** তথ্য সারি শ্রেণীকরণের জন্য অবশ্যই একটা গ্রহণযোগ্য ভিত্তি থাকতে হবে। যেমন, উপরের দ্বিতীয় উদাহরণে স্বাক্ষরতা হার শ্রেণীকরণে ১০% বিরতিমাত্রা অনুসরণ করা হয়েছে। এরূপ ভিত্তি গ্রহণযোগ্য হলেও কিন্তু একই তথ্য সারি শ্রেণীকরণে একেকজন একেক ধরণের বিরতিমাত্রা ব্যবহার করতে পারেন। এই সমস্যা দূর করার জন্য শ্রেণীকরণের জন্য বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি রয়েছে । এরূপ পদ্ধতি ব্যবহার করলে শ্রেণীবিন্যাসের একটি যুক্তিগত (Logical) ভিত্তি বজায় থাকে।

গ. **এককের শ্রেণীভূক্তি ঃ** সমগ্রকের প্রতিটি একক যেন কোন একটির শ্রেণীভূক্ত হয় তা অপরিহার্য। নচেৎ শ্রেণীকরণ পদ্ধতিটি সঠিক হবে না।

ঘ. **উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা:** একটি যুক্তিযুক্ত শ্রেণীকরণদ্বারা তথ্য সহজে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করা যায়। উপরের উদাহরণ ধরেই বলা যায় যে, বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার স্বাক্ষরতা হার যদি শ্রেণীকরণ করা না হত তবে প্রতিটি জেলা আলাদা-আলাদাভাবে ব্যাখ্যা-বিশেণ্ঢষণের প্রয়োজন হত। কিন্তু নির্দিষ্ট ভিত্তিতে শ্রেণীকরণের ফলে বিন্যাসকৃত তথ্য, ধরা যাক, ৪টি বা ৬টি শ্রেণীতে ৬৪টি জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করলে এতে বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত সমবৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাক্ষরতা সংক্ষিপ্তভাবে যেমন উপস্থাপন সম্ভব, তেমনি ব্যাখ্যাও সহজতর হবে।

শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি ঃ

তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস বা শ্রেণীকরণের মূলভিত্তি হচ্ছে তথ্যের এককের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীবিন্যাস হতে পারে। এর মধ্যে বহুল প্রচলিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভিত্তি এখানে উল্লেখ করা হলো:

ক. **কালীক শ্রেণীবিন্যাস ঃ** পরিমাণবাচক তথ্য, যেমন বিভিন্ন আদমশুমারী অনুযায়ী কোন দেশের জনসংখ্যা বা বিভিন্ন বছরের কোন ফসলের উৎপাদন, এই পদ্ধতিতে সময়ের ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। এইরূপ বিন্যাস সারিকে

কালীক সারি (Time Series) বলে। এইরূপ শ্রেণীবিন্যাসদ্বারা নির্দিষ্ট সময় পরিধিতে কোন তথ্যের পরিবর্তন অনুসরণ করা যায়।

খ. **স্থানিক শ্রেণীবিন্যাস ঃ** এই ধরণের বিন্যাস তথ্যসমূহকে স্থান বিশেষের ভিত্তিতে সাজানো হয়। এই বিন্যাসের মূল ভিত্তি হলো ভৌগোলিক একক, যেমন- দেশ, জেলা, নগর, অঞ্চল, ইত্যাদি। এই সমস্ত এককের ভিত্তিতে জনসংখ্যা, উৎপাদন, আবহ তথ্য প্রভৃতি শ্রেণীবিন্যাস করা যায়।

গ. **গুণগত শ্রেণীবিন্যাস ঃ** এই ধরণের বিন্যাস সমগ্রকের গুণ বা প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীকরণ করা হয়। যেমন, বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে ধর্ম বা পেশা অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস। ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য এই ধরণের তথ্যের আরও অতিরিক্ত শ্রেণীতে (Sub-groups) ভাগ করা যেতে পারে।

ঘ. **সংখ্যাগত শ্রেণীবিন্যাস ঃ** কোন চলকের মানের পার্থক্য অনুসারে তথ্য সারিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন, বাংলাদেশের নগরসমূহকে জনসংখ্যা অনুযায়ী উচ্চমান থেকে নিম্নমান অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। এরূপ শ্রেণীবিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো উচ্চমান সম্পন্ন চলক বা ব্যাষ্টির গুরুত্ব সহজে ধরা পড়ে। এই শ্রেণীকরণে প্রধানতঃ ব্যাপ্তিসূচক মাপক ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাপ্তিসূচক শ্রেণীবিন্যাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো গণসংখ্যা নিবেশন। এরূপ নিবেশণ আবার বিভিন্ন লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

পাঠ সংক্ষেপ ঃ

তথ্যের বিভিন্ন শ্রেণীতে রীতিবদ্ধভাবে বিন্যাস বা সাজানোকে তথ্য শ্রেণীকরণ বা তথ্য শ্রেণীবিন্যাস বলে। তথ্যকে শ্রেণীকরণের সময় যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে- (ক) শ্রেণীর মধ্যে প্রকাশ্য পার্থক্য (খ) রীতিবদ্ধ ভিত্তি (গ) এককের শ্রেণীভূক্তি এবং (ঘ) উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা। তথ্য শ্রেণীবিন্যাসের বহুল প্রচলিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভিত্তিসমূহ হচ্ছে- (ক) কালীক শ্রেণীবিন্যাস, (খ) স্থানিক শ্রেণীবিন্যাস (গ) গুণগত শ্রেণীবিন্যাস এবং (ঘ) সংখ্যাগত শ্রেণীবিন্যাস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. তথ্য সারিকে শ্রেণীকরণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একটি .... যেন একাধিক শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত না হয়।

১.২. তথ্য সারি শ্রেণীকরণের জন্য অবশ্যই একটা গ্রহণযোগ্য .... থাকতে হবে।

১.৩. স্থানিক শ্রেণীবিন্যাসের মূলভিত্তি হলো .... ।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. একটি যুক্তিযুক্ত শ্রেণীকরণ দ্বারা তথ্য সহজে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করা যায় না।

২.২. কালিক শ্রেণীবিন্যাস দ্বারা নির্দিষ্ট সময় পরিধিতে কোন তথ্যের পরিবর্তন অনুসরণ করা যায়।

২.৩. তথ্যের শ্রেণীকরণে ব্যাপ্তিসূচক মাপক ব্যবহার করা হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. তথ্যের শ্রেণীকরণ কাকে বলে? এর ভিত্তিসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. শ্রেণীকরণের উদ্দেশ্য কি? একটি বিন্যাসকৃত তথ্যের কিরূপ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে?

পাঠ-২.৩

গণসংখ্যা নিবেশন

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- গণসংখ্যা নিবেশনের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য;
- গণসংখ্যা নিবেশনের নির্মান পদ্ধতি;
- গণসংখ্যা নিবেশনের প্রকারভেদ; এবং
- গণসংখ্যা নিবেশনের উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী ইউনিট এবং পাঠে তথ্যের ধরণ ও শ্রেণী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ভূগোল ও সম্পর্কীয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের পর তথ্যকে ব্যবহারযোগ্য করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তথ্যকে যুক্তিগতভাবে উপস্থাপনের জন্য তথ্যের এরূপ রূপান্তর বা প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রক্রিয়াকরণ সারণীর মাধ্যমে অথবা চিত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব।

গণসংখ্যা নিবেশন পদ্ধতি

একটি পরিমাণবাচক তথ্য সারিকে বিশেণ্ডষণের সুবিধার্থে কয়েকটি সুবিধাজনক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ভাগের মান বা চলককে এই সমস্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে যে সংঘবদ্ধ বিন্যাস প্রস্তুত করা হয় তাকে গণসংখ্যা নিবেশন বলে। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে সংগৃহীত একটি তথ্য সারি থেকে সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া যায় না এবং অনেক সময় তথ্যগুলি ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে, ব্যাখ্যার সুবিধার্থে প্রথমে তথ্য সারির নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করা যাবে:

পরিসর: তথ্য সারির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যার পার্থক্যকে (তথ্য সারিকে মানানুক্রমে সাজালে সংখ্যাদ্বয় সহজে ধরা পড়ে) পরিসর (Range) বলে। সারনী ২.৩.১-এর তথ্য সারির পরিসর হবে উচ্চমান ৭৭-নিম্নমান ৩৪=৪৩।

সারনী-২.৩.১ গাজীপুর থানার ৫০টি মৌজায় উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধান চাষের হার (শতকরা)

মৌজা নং	% উফশী ধান চাষ	মৌজা নং	% উফশী ধান চাষ
১	৩৪	২৬	৬৪
২	৪৮	২৭	৭৫
৩	৫০	২৮	৪৮
৪	৬৬	২৯	৫৯
৫	৭০	৩০	৬০
৬	৭০	৩১	৭৭
৭	৬২	৩২	৪২

মৌজা নং	% উফশী ধান চাষ	মৌজা নং	% উফশী ধান চাষ
৮	৫৬	৩৩	৫০
৯	৬১	৩৪	৫৮
১০	৪৫	৩৫	৫৩
১১	৩৭	৩৬	৫৮
১২	৪৮	৩৭	৫২
১৩	৩৫	৩৮	৬১
১৪	৪৮	৩৯	৬৩
১৫	৩৫	৪০	৫৯
১৬	৫২	৪১	৫২
১৭	৫৪	৪২	৬১
১৮	৬১	৪৩	৫৬
১৯	৫৪	৪৪	৫৬
২০	৫৪	৪৫	৫০
২১	৬৫	৪৬	৬১
২২	৫৮	৪৭	৬৮
২৩	৫৮	৪৮	৬৯
২৪	৪৫	৪৯	৬২
২৫	৫৭	৫০	৬১

শ্রেণীব্যাপ্তি ও শ্রেণীসংখ্যা : পরিসরের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যার পার্থক্য অনুযায়ী সাধারণত: শ্রেণীব্যাপ্তি নির্ধারণ করা যায়, তবে পরিসংখ্যানগত ভিত্তি প্রদাণের জন্য একটি সূত্রও ব্যবহার করা যায়। ১০০টি চলক সম্পন্ন একটি তথ্যসারিতে কত শ্রেণী হবে তা এই সূত্র ব্যবহার করে পওয়া যাবে:

যদি ৫টি শ্রেণীসংখ্যার মধ্যে নিবেশনটি করতে চাই, তবে ৫xলগ. ১০০ = ৫x২.০০০০ =১০।

এখন গণসংখ্যা নিবেশটির জন্য ১০ শ্রেনীব্যাপ্তি ধরে ৫টি শ্রেণীসংখ্যা গ্রহণ করতে হবে। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, শ্রেণীসংখ্যা কয়টি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। তথ্যসারির বিস্তৃতি বা আকার অনুযায়ী এই সংখ্যা বেশী বা কম হতে পারে। তবে অনেক সময় ষ্টুর্জ পদ্ধতিতে এই শ্রেণীসংখ্যা নির্ণয় করা যেতে পারে:

K = ১+৩.২২২. Log N

যখন, K = শ্রেণীসংখ্যা; N= সমগ্রকের একক সংখ্যা;

Log=১০ ভিত্তিক সাধারণ Log (অন্যান্য সংখ্যা স্থির-Constant)

শ্রেণীসীমা: শ্রেণীব্যাপ্তি নির্ধারণের পর শ্রেণীসীমা স্থির করা হয়। শ্রেণীসীমা গণসংখ্যা নিবেশনের শুরু ও শেষ সংখ্যামান নির্দেশ করে। শ্রেণীসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্যসারির সর্বনিম্ন মান হতে শুরু করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। একইভাবে সর্বোচ্চমান দিয়ে শেষ করতে হবে তাও নয়। এ ক্ষেত্রে উভয় প্রান্তে শ্রেণীব্যাপ্তির মান অনুযায়ী উপযোগী সংখ্যাদ্বারা গণসংখ্যা নিবেশন শুরু ও শেষ করা যাবে।

গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত করার সময় শ্রেণী সীমা নির্ধারণে সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ঃ

ক. বহিস্থ পদ্ধতিঃ যখন কোন শ্রেণীসীমার উর্দ্ধ শ্রেণীসীমা পরবর্তী শ্রেণীর নিম্নসীমা হিসেবে ব্যবহার হয়। এতে প্রথম শ্রেণীর উর্দ্ধসীমাকে ঐ শ্রেণীর বর্হিভূত ধরে গণনা হয়।

সারনী ২.৩.২। গাজীপুরের ৫০টি মৌজার উফশী ধান চাষের (%) গণসংখ্যা নিবেশন।

	বহিস্থ	অন্তস্থ	টালি চিহ্ন	গণসংখ্যা
মুক্ত শ্রেণী	<৪০	<৩৯		
বদ্ধ শ্রেণী	৩০-৪০	৩০-৩৯	///	৩
	৪০-৫০	৪০-৪৯	//// /	৬
	৫০-৬০	৫০-৫৯	//// //// //// //// /	২১
	৬০-৭০	৬০-৬৯	//// //// ////	১৫
মুক্ত শ্রেণী	৭০>	৭০>	////	৫
		অথবা		
বদ্ধ শ্রেণী	৭০-৮০	৭০-৭৯		
	মোট (N)			৫০

* যে কোন একটি শ্রেণী বিবেচ্য।

উৎস : সারণী ২.৩.১।

খ. অন্তস্থ পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতিতে শ্রেণীবিন্যাস দেখানোর জন্য উর্দ্ধ ও নিম্ন দুই প্রান্তসীমা সংশি- ষ্ট শ্রেণীব্যাপ্তির মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত করা হয় (সারণী ২.৩.২)।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একটি গণসংখ্যা নিবেশনে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ শ্রেণীর শেষ প্রান্তের সংখ্যা অনেক সময় যথাক্রমে, <,এবং >, চিহ্নদ্বারা দেখানো হয়। এক্ষেত্রে এরূপ ব্যবহারকে মুক্ত শ্রেণীসীমা বলা হয়। আর যদি শ্রেণীব্যাপ্তি এরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যাদ্বারা দেখানো হয়, তখন এদের বদ্ধ শ্রেণীসীমা বলা হবে (সারণী ২.৩.২)।

টালি চিহ্নঃ শ্রেণী ব্যাপ্তি ও শ্রেণীসংখ্যা পাওয়ার পর প্রতিটি শ্রেণীব্যাপ্তিতে চলক বা তথ্য সারির প্রতিটি মান একটি টালি চিহ্ন (/)দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। চারটি (////) মান কোন শ্রেণী সংখ্যায় অন্তর্ভূক্ত হলে পঞ্চম মানের জন্য চারটি টালির মাঝামাঝি কেটে দিতে হবে (////)। এতে প্রতিটি শ্রেণী ব্যাপ্তিতে কতটি টালি চিহ্ন আছে গণনা করতে সুবিধা হয় (সারণী ২.৩.২)।

গণসংখ্যাঃ উপরোক্ত উপায়ে টালিদ্বারা শ্রেণী ব্যাপ্তি অনুযায়ী প্রতিটি শ্রেণী সংখ্যা পরিপূরণ হলে শ্রেণী ব্যাপ্তিসমূহের প্রতিটি শ্রেণীর মোট সংখ্যা যোগ করে দেখানো হয়। এই সংখ্যাগুলিকে গণসংখ্যা বলে (সারণী ২.৩.২)।
এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, তথ্য সারি সংক্ষিপ্তকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী ব্যবহার একটি অতি সহজ উপায়। কিন্তু এক্ষেত্রে টালি চিহ্ন কলামটি বাদ দিয়ে সারণীটি উপস্থাপন করা হয়। এই উপস্থাপনায় সারণীটির নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অবশ্যই সংযোজন করতে হবেঃ

ক. সারণী ক্রমিকঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে ২.৩.২- সারণী। অথবা সাধারণ ক্ষেত্রে সারণী ১,২,৩ ... ইত্যাদি ক্রম অনুযায়ী প্রকাশ করা যায়।

খ. সারণী শিরোনামঃ সারণীর বিষয় বস্তু পরিচায়ক নামকরণ (আলোচ্য ক্ষেত্রে গাজীপুরের ৫০টি মৌজার উফশী ধান চাষের (%) গণসংখ্যা নিবেশন।

গ. কলামের শিরোনাম: সারণী অন্তর্ভুক্ত কলামসমূহের পরিচয় (আলোচ্য ক্ষেত্রে টালি চিহ্ন বাদ দিয়ে) দুইটি পরিচয় জ্ঞাপক কলাম শিরোনাম রয়েছে, যেমন, শ্রেণী ব্যাপ্তি বা উফশী ধান চাষের হার(%), এবং গণসংখ্যা বা মৌজা সংখ্যা।

ঘ. বিষয়বস্তু : কলাম অনুযায়ী তথ্য বিন্যাস বা বিবৃত পরিসংখ্যান বা তথ্যরাশি।

ঙ. পাদটীকা: উপস্থাপিত সারণী সম্পর্কীয় যে কোন টীকা সারণীর নিচে (তারকা) বা একাধিক টীকার ক্ষেত্রে ক্রমানুযায়ী (১,২,৩ .... ইত্যাদি) লিপিবদ্ধ করণ (আলোচ্য ক্ষেত্রে এরূপ তথ্য * চিহ্নদ্বারা দেখানো হয়েছে)।

চ. তথ্যউৎস: সারণীতে বর্ণিত মূল তথ্যের উৎস। মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যউৎস হিসেবে বই পুস্তকের নাম, প্রকাশক/গ্রন্থকার ইত্যাদি লিখতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উৎস হিসেবে সারণী ২.৩.১ বলা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য (যা নিজে সংগ্রহ করা হয়) উৎস হিসেবে প্রকাশ না করলেও চলে অথবা নিজস্ব জরিপ, অথবা নিজ গবেষণা কর্মের সূত্র উল্লেখ করা যেতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপঃ

একটি পরিমাণবাচক তথ্যসারিকে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে কয়েকটি সুবিধাজনক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে যে সংঘবদ্ধ বিন্যাস প্রস্তুত করা হয় তাকে গণসংখ্যা নিবেশন বলে। তথ্যসারির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যার পার্থক্যকে পরিসর বলে। পরিসরের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যার পার্থক্য অনুযায়ী শ্রেণীব্যাপ্তি নির্ধারণ করা যায়। শ্রেণীব্যাপ্তি নির্ধারণের পর শ্রেণীসীমা স্থির করা হয়। শ্রেণীব্যাপ্তি ও শ্রেণীসংখ্যা পাওয়ার পর প্রতিটি শ্রেণী ব্যাপ্তিতে চলক বা তথ্যসারির প্রতিটি মান একটি টালি চিহ্ন (/)দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। টালিদ্বারা শ্রেণীব্যাপ্তি অনুযায়ী প্রতিটি শ্রেণীসংখ্যা পরিপূরণ হলে শ্রেণী ব্যাপ্তিসমূহের প্রতিটি শ্রেণীর মোট সংখ্যা যোগ করে দেখানো হয়। এই সংখ্যাগুলিকে গণসংখ্যা বলে । গণসংখ্যা নিবেশন সারণীতে অপরিহার্য বিষয়গুলো হচ্ছে- (ক) সারণী ক্রমিক, (খ) সারণী শিরোনাম, (গ) কলামের শিরোনাম, (ঘ) বিষয়বস্তু, (ঙ) পাদটিকা এবং (চ) তথ্যউৎস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. শ্রেণীসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য সারির .... মান হতে শুরু করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই।

১.২. গণসংখ্যা নিবেশন প্রস্তুত করার সময় শ্রেণী সীমা নির্ধারণে সাধারণ .... পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

১.৩. শ্রেণীর শেষপ্রান্তের সংখ্যা অনেক সময় যথাক্রমে ...... এবং .... চিহ্নদ্বারা দেখানো হয়।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. তথ্যসারির পরিসর হবে উচ্চমান + নিম্নমান ।

২.২. ষ্টুর্জ পদ্ধতিতে শ্রেণীসংখ্যা নির্ণয়য়ের সূত্র হচ্ছে- K = ১+৩.২২২. Log N।

২.৩. মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য উৎস হিসেবে বই পুস্তকের নাম, প্রকাশক/গ্রন্থকার ইত্যাদি লিখতে হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. বাংলাদেশের ৬৪ জেলাতে শিক্ষিতের হার সর্বোচ্চ ৫৩.৯% ও সর্বনিম্ন হার ১৯.৫% হলে পরিসর, শ্রেণীসংখ্যা এবং শ্রেণী ব্যাপ্তী কত হবে?

২. সংজ্ঞা দিনঃ শ্রেণীব্যাপ্তী, শ্রেণীসংখ্যা, টালি চিহ্ন, শ্রেণীসীমা।

৩. একটি গণসংখ্যা নিবেশনের উপাদানসমূহ নির্দেশ করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. নীচের সংখ্যাগুলোকে একটি গণসংখ্যা নিবেশনে সাজান।

১১, ২২, ১৭, ৬২, ২৩, ১৭, ২৪, ৩২, ৫৪, ৫১, ৪৬, ২০, ২৫, ৩৪, ৪১, ৩৭, ৪২, ৫০, ৫৩, ৬০, ২৭, ৩২, ১৮, ২৪, ২৭, ৪৪, ৪৭, ৪৯, ৩৫, ৪৩, ২৯, ১৮, ৪০, ৪৯, ৪২, ৩৮, ৩৫, ২১, ২৯।

পাঠ-২.৪

তথ্য শ্রেণীকরণ পদ্ধতি

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- তথ্য শ্রেণীকরণ পদ্ধতি;
- আয়তলেখ;
- বহুভূজ; এবং
- অজিভ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পাঠ-২.৩ এ গণসংখ্যা নিবেশন সম্পর্কে আমরা বিশদ জানতে পেরেছি। এই গণসংখ্যা নিবেশন তথ্য শ্রেণীকরণের একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। এর থেকে আমরা তিনটি খুবই সহজ তথ্য শ্রেণীকরণের পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারি। এগুলি হলো: আয়তলেখ, বহুভূজ এবং অজিভ।

ক. **আয়তলেখ (Histogram):** গণসংখ্যা নিবেশনের প্রতিটি শ্রেণীতথ্যের শ্রেণীভাগ হিসাব আয়তলেখদ্বারা প্রকাশ করা যায়। উলম্ব রেখার উপর অংকিত আয়তক্ষেত্রের উচ্চতার মাধ্যমে এক একটি শ্রেণীভাগের গণসংখ্যা বা মান দেখানো হয়। চিত্র ২.৪.১-এ সারণী ২.৩.১ অনুসরণে একটি আয়তলেখ অঙ্কন করা হয়েছে।

আয়তলেখে O-X অক্ষে শ্রেণীব্যাপ্তি এবং O-Y অক্ষে গণসংখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ. **বহুভূজ (Polygon):** গণসংখ্যা শ্রেণীকরণ বহুভুজদ্বারাও প্রকাশ করা যায়। তত্ত্বীয়ভাবে বহুভূজদ্বারা গণসংখ্যা নিবেশনের সমস্তমান প্রকাশ করা যায় এবং একই সাথে শ্রেণীভাগও বুঝা যায়। আয়তলেখের মত O-X ও O-Y তে বাহুরমান প্রদর্শিত হয়। চিত্র ২.৪.২-এ সারণী ২.৩.১ অনুযায়ী একটি বহুভূজ অংকিত হয়েছে। তবে আয়তলেখ থেকেও বহুভূজ অংকন করা যায়। এক্ষেত্রে আয়তলেখের শীর্ষ বাহুসমূহের মধ্যবিন্দুগুলি চিহ্নিত করে একটি রেখাদ্বারা যোগ করে প্রথম ও শেষ বাহুদ্বয় O-X বাহু পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। আয়তলেখের মতই এক্ষেত্রে O-X অক্ষে শ্রেণীব্যাপ্তি এবং O-Y অক্ষে গণসংখ্যা উপস্থাপন করা হয়।

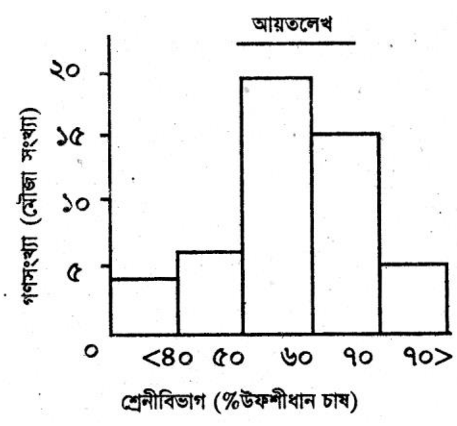

চিত্র : ২.৪.১ ঃ আয়তলেখ

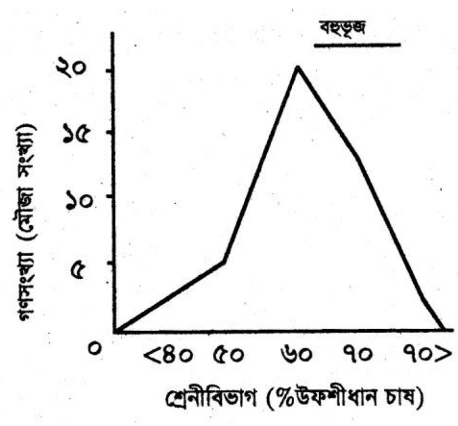

চিত্র ঃ ২.৪.২ ঃ বহুভূজ

গ. **অজিভ (Ogive):** অজিভ একটি গণসংখ্যা নিবেশন ভিত্তিক চিত্রলেখ। কিন্তু এক্ষেত্রে গণসংখ্যা মানগুলিকে ক্রম যৌগিকভাবে প্রকাশ করে চিত্রটি অংকন করতে হয়। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর গণসংখ্যা মানের সাথে ক্রমাগতভাবে

পরবর্তী শ্রেণীরমান যোগ করে প্রকাশ করা হয়। এই বিন্যাস উচ্চক্রম বা নিম্নক্রম অনুসারে করা যায়। বিষয়টি সারণী ২.৪.১দ্বারা প্রকাশ করা হলো। সারনী অনুযায়ী

সারনী ২.৪.১। গাজীপুরের ৫০টি মৌজার উফসী ধানচাষের ক্রমযোজিত গণসংখ্যা নিবেশন।

শ্রেণীব্যাপ্তি (%)	গণসংখ্যা (মৌজা)	উচ্চক্রম অনুসারে যোজন	নিম্নক্রম অনুসারে যোজন
<৪০	৩	৩(৩)	৫০
৪০-৫০	৬	৯(৩+৬)	৪৫(৫০-৫)
৫০-৬০	২১	৩০(৯+২১)	৩০(৪৫-১৫)
৬০-৭০	১৫	৪৫(৩০+১৫)	৯(৩০-২১)
৭০>	৫	৫০(৪৫+৫)	৩(৯-৬)

চিত্র ২.৪.৩-এ অজিভটি অঙ্কিত হলো। উচ্চক্রম অনুসারে যোজিত গণসংখ্যাদ্বারা যে রেখা পাওয়া যায় তাকে ঊন অজিভ বলে। অপরদিকে, নিম্নক্রম অনুযায়ী যোজিত গণসংখ্যাদ্বারা অঙ্কিত রেখাকে অধি-অজিভ বলে।

তথ্য শ্রেণীকরণের প্রক্রিয়া হিসেবে, গণসংখ্যা নিবেশনভিত্তিক চিত্রলেখগুলি দুই বা ততোধিক গণসংখ্যা নিবেশনের সাথে তুলনা করা যায়। বিশেষ করে অজিভ দুইটি সম্পর্কিত তথ্যসারি নিবেশনের তুলনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

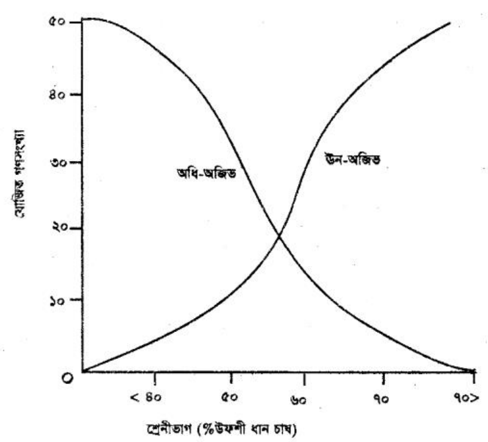

চিত্র ২.৪.৩ ঃ অজিভ

পাঠ সংক্ষেপঃ

গণসংখ্যা নিবেশনের প্রতিটি শ্রেণীতথ্যের শ্রেণীভাগ হিসাব আয়তলেখদ্বারা প্রকাশ করা হয়। উলম্ব রেখার উপর অঙ্কিত আয়তক্ষেত্রের উচ্চতার মাধ্যমে আয়তলেখ অঙ্কন করা হয়। বহুভূজদ্বারা গণসংখ্যা নিবেশনের সমস্ত মান প্রকাশ করা যায় এবং একই সাথে শ্রেণীভাগও বুঝা যায়। আয়তলেখ থেকেও বহুভুজ অঙ্কন করা যায়। অজিভ একটি গণসংখ্যা নিবেশন ভিত্তিক চিত্রলেখ। শ্রেণীব্যাপ্তির বিপরীতে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার মান বসিয়ে অজিভ অঙ্কন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. বহুভূজদ্বারা গণসংখ্যা নিবেশনের .... প্রকাশ করা যায় এবং একই সাথে .... বুঝা যায়।

১.২. .... থেকেও বহুভূজ অঙ্কন করা যায়।

১.৩. উচ্চক্রম অনুসারে যোজিত গণসংখ্যাদ্বারা যে রেখা পাওয়া যায় তাকে .... বলে।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. উলম্ব রেখার উপর অঙ্কিত আয়তক্ষেত্রের উচ্চতার মাধ্যমে আয়তলেখ অঙ্কন করা হয়।

২.২. নিম্নক্রম অনুযায়ী যোজিত গণসংখ্যাদ্বারা অঙ্কিত রেখাকে ঊন অজিভ বলে।

২.৩. অজিভ দুইটি সম্পর্কিত তথ্যসারি নিবেশনের তুলনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. তথ্য শ্রেণীকরণে প্রধান লেখচিত্রগুলি কি কি?

২. আয়তলেখ, বহুভূজ ও অজিভ অঙ্কনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

৩. আয়তলেখ, বহুভূজ এবং অজিভের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নির্দেশ করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. নীচের গনসংখ্যা সারনী ব্যবহার করে আয়তলেখ, বহুভূজ ও অজিভ অঙ্কন করুন।

শ্রেণীব্যাপ্তী	৩০-৪০	৪০-৫০	৫০-৬০	৬০-৭০	৭০-৮০
গণসংখ্যা	৫	১২	১৮	৮	৭

উত্তরমালা ঃ ইউনিট-২

পাঠ-২.১

১.১. পরিমাণ বাচক ১.২. বিচ্ছিন্ন, ১.৩. এ্যাবসিসা, অর্ডিনেট ১.৪. ধনাত্মক, ঋণাত্মক, ১.৫. ব্যাপ্তিসূচক, ব্যাপ্তিসূচক।

২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. মি, ২.৪. স।

পাঠ-২.২

১.১. চলক ১.২. ভিত্তি, ১.৩. ভৌগোলিক একক।

২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. মি।

পাঠ-২.৩

১.১. সর্বনিম্ন, ১.২. দুইটি, ১.৩. <,>।

২.১. মি ২.২. স, ২.৩. মি।

পাঠ-২.৪

১.১. সমস্ত মান, শ্রেণীভাগ ও, ১.২. আয়তলেখ, ১.৩. উন অজিভ।

ইউনিট-৩

মধ্যগামিতা পরিমাপ (Measuring Central Tendency)

পরিসংখ্যান পদ্ধতির একটি প্রধান ভুমিকা হচ্ছে তথ্য বা তথ্যসারিকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা, যা থেকে তথ্যেরমূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা যায়। তথ্যসারিকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশের বিধিবদ্ধ পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে যে কোন তথ্যসারির মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা যায়। এই ইউনিটে তথ্যসারির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হবে:

১. মধ্যগামিতা (Central Tendency) - তথ্যসারির গড় অবস্থা;

২. বিস্তৃতি (Dispersion) - তথ্যসারির বিস্তৃতি; এবং

৩. বিস্তার আকার (Spread) - গণসংখ্যা নিবেশনের প্রকৃতি ও আকৃতি।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হচ্ছে-

পাঠ-৩.১ *চল ও মধ্যমা*

পাঠ-৩.২ *গড় (যোজিত গড়)*

পাঠ-৩.১

চল ও মধ্যমা

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- চল ও চল নির্ণয় পদ্ধতি;
- মধ্যমার সংজ্ঞা;
- মধ্যমার প্রকারভেদ; এবং
- মধ্যমা নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

চল (Mode) ঃ

চল হচ্ছে গড় পরিমাপের সহজতম পন্থা। একে চলন মানও (Modal Value) বলা হয়ে থাকে। তথ্যসারির সর্বাপেক্ষা প্রচলিত মানকে চল বলে। এই মানকে $\hat{x}$ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। অবিন্যস্ত তথ্যসারি থেকে চল নির্ণয় করতে হলে, প্রথমে তথ্যসারিকে বিন্যাসকৃত অবস্থায় সাজাতে হয় (যেমন, নিম্ন থেকে উচ্চ মানের তথ্যে)। এরপর কোন মান সবচাইতে বেশী সংখ্যায় আছে তা লক্ষ্য করতে হবে; এই সংখ্যাটিই চল। ধরি, আমাদের তথ্যগুলিঃ ৫, ৭, ৯, ১০, ১৫, ৯, ৭, ৯, ১১, ৬। প্রথমে এই তথ্যসারিকে নিম্নরূপে বিন্যস্ত করতে হবেঃ

৫, ৬, ৭, ৭, ৯, ৯, ৯, ১০, ১১, ১৫।

দেখা যাবে যে, ৯ সংখ্যাটি অধিকবার তথ্য সারিতে রয়েছে; এ ক্ষেত্রে ৯ হচ্ছে চল ($\hat{x}$)।

ব্যাপ্তিসূচক তথ্যসারি থেকে চল নির্ণয় করা সুবিধাজনক নয়। কেননা, একটি নির্দিষ্ট মান একাধিকবার নাও পাওয়া যেতে পারে। একইভাবে ক্রম সূচক তথ্যসারির যুক্তক্রম (Tied Rank) থেকেও চল নির্ণয় সুবিধাজনক নয়। নামীয় তথ্য সারি থেকে চল নির্ণয় করা যায়। এ ক্ষেত্রে যে শ্রেণীতে চল অবস্থান করে তাকে চলন শ্রেণী (Modal Class) বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য সারিতে একাধিক চল দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ দুইটি সংখ্যামান চল হিসাবে অবস্থান করলে এই নিবেশনকে দ্বি-চলন (Bi-modal) এবং দুইয়ের অধিক চল পাওয়া গেলে বহু চলন (Multi-modal) বলে। এসমস্ত ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে একটি প্রধান চল পাওয়া যায় না এবং তথ্যসারির মধ্যগামিতা সাধারণ পন্থায় নির্ণয় করা যায় না। এইরূপ অবস্থায় চল দ্বারা তথ্যসারির মধ্যগামিতা নির্ণয় না করে অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়।

মধ্যমা (Median) ঃ

মধ্যমা হচ্ছে তথ্যসারির গড় অবস্থা নির্ণয়ের সহজতর উপায়। চলকসমূহ মানানুক্রমে (উচ্চ বা নিম্নমান অনুসারে) সাজানোর পর যে সংখ্যামানটি তথ্য সারিকে সমান দুইভাগে ভাগ করে তাকে মধ্যমা বলে। নিম্ন থেকে উচ্চমানক্রমে তথ্যসারি সাজালে মধ্যমার একদিকে কম মানসম্পন্ন সংখ্যাগুলি এবং অপর দিকে বেশী মানসম্পন্ন সংখ্যাগুলি অবস্থান করবে। প্রকৃতপক্ষে মধ্যমা হলো মানানুক্রমিক তথ্যসারির মধ্যঅবস্থানগত মান। মনে করি, নিচের সংখ্যাগুলির মধ্যমা বের করতে হবেঃ

৪. ১, ৫. ২, ৭. ৩, ২. ৬, ১. ৭, ৯. ৪, ৮. ৪।

এই তথ্যসারিকে নিম্ন থেকে উচ্চমান ক্রমে সাজানো হলোঃ ১.৭, ২.৬, ৪.১, ৫.২, ৭.৩, ৮.৪, ৯.৪। দেখা যাচ্ছে যে, ৫.২ তথ্যসারিকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে কেন্দ্রে অবস্থান করছে। সংখ্যাটি এই তথ্যসারির মধ্যমা। তথ্যসারির মোটসংখ্যা

বেজোড় (Uneven) হলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। মোটসংখ্যা জোড় (Even) হলে একটি নির্দিষ্টসংখ্যা তথ্যসারির মধ্যে অবস্থান করবে না। ধরি, নিম্নরূপ জোড় তথ্য সারির মধ্যমা বের করতে হবে:

৭, ২, ৭, ৪, ৮, ৫।

এই তথ্যসারিকে মানানুক্রমে সাজানো হলো:

২, ৪, ৫, ৭, ৭, ৮।

এখানে কোন একটি সংখ্যাকে মধ্য অবস্থান ধরা যাবে না; এক্ষেত্রে মধ্যমা হবে তথ্যসারির কেন্দ্রভাগে অবস্থিত দুইটি সংখ্যামানের যোজিত গড় (Arithmetic Mean)। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ৫ ও ৭ তথ্যসারির কেন্দ্রভাগে অবস্থিত এবং এই দুইটির যোজিত গড় হবে (৫+৭) ÷২=১২÷২= ৬। অতএব, জোড় তথ্যসারিটির মধ্যমা হবে ৬। মধ্যমা সাধারণত $\tilde{x}$ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়।

বিন্যস্ত বা শ্রেণীবদ্ধ তথ্যের (Classed Data) ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কিছু মূলতথ্যের পরিবর্তন ঘটে। শ্রেণীবদ্ধ তথ্যসারির মধ্যমা নির্ণয়ে প্রথমে কিছু ধারণা (Assumption) গ্রহণ করতে হয়। গণসংখ্যাগুলি যোগের মাধ্যমে কোন শ্রেণীতে মধ্যমা অবস্থান করবে তা আগে নিরূপণ করতে হয়। কিন্তু যেহেতু, সেই শ্রেণীর মধ্যে মধ্যমার অবস্থিতি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন সেহেতু মনে করতে হবে যে, শ্রেণীর মধ্যে তথ্যগুলি সমানভাবে নিবেশিত। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে গণসংখ্যা নিবেশন থেকে মধ্যমার অবস্থান সম্পর্কে প্রথমে নীচের সূত্র দ্বারা বিন্যস্ত নিবেশনটির মধ্যমার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন হবে:

মধ্যমার অবস্থান: $\tilde{x} = \frac{N+1}{2}$

যেখানে $\tilde{x}$ = মধ্যমা, N = শ্রেণী সংখ্যা মানসমূহের সমষ্টি;

১ = ধ্রুবক (১ তম তথ্যের গড়)।

যে শ্রেণীর মধ্যে মধ্যমার অবস্থিতি সেই শ্রেণীকে মধ্যমাশ্রেণী বলে। এই শ্রেণীটি মধ্যমা নির্ণয়ের ভিত্তি। মধ্যমা এই শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিস্তৃত আছে এই ধারণার উপর ভিত্তি করে নীচের সূত্রের সাহায্যে বিন্যস্ত তথ্য সারিটির মধ্যমা নির্ণয় করা যাবে:

$$\tilde{x} = L_1 + \frac{\frac{N+1}{2} - fc}{fm} \times (L_2 - L_1)$$

যেখানে, $\tilde{x}$ = মধ্যমা L_1 = মধ্যমা শ্রেণীর নিম্নসীমা (Lower Limit);

L_2 = মধ্যমা শ্রেণীর উচ্চসীমা (Upper Limit) ;

N = মোট গণসংখ্যা;

fm = মধ্যমাশ্রেণীর গণসংখ্যা; এবং

fc= মধ্যমা শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর যোজিত গনসংখ্যা।

উপরের সূত্রানুযায়ী এখন সারণী ৩.১.১- এর তথ্যসারিতে একটি গ্রামের খামারের আয়তন ভিত্তিক কৃষক খানার মধ্যমা নির্ণয় করা যাবে।

সারনী ৩.১.১। একটি গ্রামের খামারের আয়তন ভিত্তিক কৃষক নিবেশন (মধ্যমা অবস্থান নির্ণয়)

খামারের আয়তন (একর)	কৃষক খান সংখ্যা	যোজিত সংখ্যা
০	১৬৯	১৬৯
০.০১-১.০০	৮৮	২৭৫
১.০১-২.০০	১৩৮	৩৯৫(fc)
(L_1) ২.০১-৩.০০ (L_2)	১৮৭ (fm)	৫৮২ মধ্যমা শ্রেণী
৩.০১-৫.০০	২৪৩	৮২৫
৫.০০-১০.০০	১৬৯	৯৯৪
১০.০১ ও ঊর্দ্ধে	২৬	১০২০

মধ্যমার অবস্থান $= \frac{N+1}{2} = \frac{১০২০+১}{২} =$ ৫১০.৫

এখানে, ৫১০.৫ তম সংখ্যাটি মধ্যমার অবস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিবে। উপরের সারণীতে এই অবস্থান নির্দেশিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই মধ্যমা আয়তন (২.০১-৩.০০) শ্রেণীতে রয়েছে। এখন উপরের সূত্র প্রয়োগ করে মধ্যমাটি নির্ণয় করা যাবে:

$$\tilde{x} = ২.০১ + \frac{৫১০.৫-৩৯৫}{১৮৭} \times (৩.০-২.০১)$$

$$= ২.০১ + \frac{৫১০.৫}{১৮৭} \times ০.৯৯$$

$$= ২.০১+০.৬১$$

$$= ২.৬২ \text{ একর।}$$

মধ্যমা নির্ণয়ের আরও প্রক্রিয়া আছে। আলোচ্য অংশে প্রচলিত পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র।

পাঠ সংক্ষেপ

তথ্যসারির সর্বাপেক্ষা প্রচলিত মানকে চল বলে। এই মানকে $\hat{x}$ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যে শ্রেণীতে চল অবস্থান করে তাকে চলনশ্রেণী বলা হয়। চলকসমূহ মানানুক্রমে (উচ্চ বা নিম্ন মান অনুসারে) সাজানোর পর যে সংখ্যামানটি তথ্যসারিকে সমান দুইভাগে ভাগ করে তাকে মধ্যমা বলে। যে শ্রেণীর মধ্যে মধ্যমার অবস্থিতি সেই শ্রেণীকে মধ্যমাশ্রেণী বলে। মধ্যমা নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে।

$$\tilde{x} = L_1 + \frac{\frac{N+1}{2} - fc}{fm} \times (L_2 - L_1) \text{ ।}$$

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. দুইয়ের অধিক চল পাওয়া গেলে .... বলে।

১.২. মধ্যমা হলো মানানুক্রমিক তথ্যসারির .... অবস্থানগত মান।

১.৩. মধ্যমা সাধারণত .... চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. ব্যাপ্তিসূচক তথ্যসারি থেকে চল নির্ণয় করা সুবিধাজনক।

২.২. $fm =$ মধ্যমাশ্রেণীর গণসংখ্যা।

২.৩. যে শ্রেণীর মধ্যে চলের অবস্থিতি সেই শ্রেণীকে মধ্যমাশ্রেণী বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. চল কাকে বলে?

২. মধ্যমা নির্ণয়ের পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. নীচের সারনী ব্যবহার করে মধ্যমা নির্নয় করুন।

ধানের উৎপাদন (মণ)	১৭০-১৯০	১৯০-২১০	২১০-২৩০	২৩০-২৫০	২৫০-২৭০	২৭০-২৯০	২৯০-৩১০
প্লটের সংখ্যা	৩	৬	৭	১৭	১০	৫	২

পাঠ-৩.২

গড় (যোজিত গড়) (Mean)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- যোজিত গড় এবং যোজিত গড় নির্ণয় পদ্ধতি;
- সাধারণ যোজিত গড়; এবং
- ভর আরোপিত যোজিত গড় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

যোজিত গড়কে গাণিতিক গড় অথবা সংক্ষেপে শুধু গড় বলা হয়। প্রধানত: এই পরিমাপটি ব্যাপ্তিসূচক তথ্যসারিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই যোজিত গড় বা গড় তথ্য সারির সংখ্যা মান (x) সমূহ যোগ করে তথ্য সারির মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে বের করা হয় এবং $\bar{x}$ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই গড়ের পরিসংখ্যানগত সূত্র হচ্ছে ঃ $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

যেখানে, $\bar{x}$ = যোজিত গড় বা গড়; ∑(সিগমা) = সমষ্টির প্রতীক; x = তথ্যসারির সংখ্যা মান n = তথ্য সারির মোট সংখ্যা।

সূত্রটি একটি উদাহরণে প্রয়োগ করা যাবেঃ

৬.২, ৯.৩, ৪.৮, ৭.২, ৫.৫।

এই সংখ্যাগুলি যোগ করে মোট তথ্যসারি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে গড় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, $\bar{x} = \frac{৩৩.০}{৬.৬}$ ।

যোজিত গড় দুই প্রকারের হতে পারে: (ক) সাধারণ যোজিত গড়; এবং (খ) ভরযুক্ত যোজিত গড়। সাধারণ যোজিত গড়ে তথ্যসারির প্রতিটি সংখ্যা মানকে শুধুমাত্র একবার যোগের জন্য গণনা করা হয়। কিন্তু ভরযুক্ত (Weighted) যোজিত গড়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি সংখ্যা মানকে মানটির প্রাধান্য বা গণসংখ্যা অনুপাতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হলো।

(ক) সাধারণ যোজিত গড় (Simple Mean): উপরের উদাহরণে ব্যাখ্যাকৃত গড়টি হলো সাধারণ যোজিত গড়। সাধারণ তথ্যসারির জন্য উপরের সূত্রানুযায়ী এই গড় বের করা হয়ে থাকে। কিন্তু শ্রেণীবদ্ধ গণসংখ্যা নিবেশন থেকে ভিন্নতর সূত্রানুযায়ী গড় নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই ধরণের তথ্য সারির শ্রেণীসীমা (Class Boundary) একটি নিদিষ্ট ব্যাপ্তির প্রতীক এবং শ্রেণী সীমার মধ্য বিন্দু শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে; কারণ মনে করা হয় যে, সংখ্যা মানসমূহ শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিস্তৃত।

প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যমানকে (Mid-Point) সেই শ্রেণীর গণসংখ্যা দ্বারা গুণ করে এবং সেই গুণফল যোগ করে সংখ্যা মানের সমষ্টি পাওয়া যাবে। এই সমষ্টিকে মোট তথ্যসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যোজিত গড় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, শ্রেণীবদ্ধ (Classe) তথ্যসারির গড় নির্ণয়ে নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার হবেঃ

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{n}$$

যেখানে, $\bar{x}$ = যোজিত গড়; ∑ = সমষ্টির প্রতীক; f = শ্রেণী গণসংখ্যা; x = তথ্য সারির সংখ্যামান; n = তথ্য সারির মোট সংখ্যা।

সারনী ৩.২.১- এর উদাহরণে এই সূত্রের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। যোজিত গড় বের করার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিও রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা যে কোন পরিসংখ্যান পুস্তকে দেখা যেতে পারে।

সারনী ৩.২.১। নুপুর পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মজুরী বিন্যাস, ২০০২

সাপ্তাহিক মজুরী (টা.)	শ্রমিক সংখ্যা (f)	মধ্যমান (x)	fx
৫১-৬০	৭	৫৫	৩৮৫
৬১-৭০	২৫	৬৫	১৬২৫
৭১-৮০	৭৬	৭৫	৫৭০০
৮১-৯০	৩২	৮৫	২৭২০
৯১-১০০	১৭	৯৫	১৬১৫
১০১-১১০	১২	১০৫	১২৬০
১১-১২০	৩	১১৫	৩৪৫
	(x= ১৭২)		(fX = ১৩৬৫০)

$$\bar{x} = \frac{১৩৬৫০}{১৭২} = ৭৯.৩৬ \text{ টাকা।}$$

(খ) ভারযুক্ত যোজিত গড় (Weighted Mean): ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে যে, সাধারণ যোজিত গড় নির্ণয়ে তথ্যসারির প্রতিটি সংখ্যা মানকে সমান প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটি তথ্যসারির এমন প্রকৃতি হতে পারে যেখানে সমস্ত সংখ্যা মানের প্রাধান্য সমান নাও হতে পারে। যে সমস্ত তথ্যসারির তারতম্যযুক্ত প্রাধান্যসম্পন্ন তথ্য থাকে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক গড় পেতে হলে প্রতিটি সংখ্যামানকে তার প্রাধান্য সংখ্যা দিয়ে গুণ করা প্রয়োজন। এই গুণ ফলগুলির সমষ্টিকে তথ্যসারির মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভরযুক্ত যোজিত গড় পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের সূত্র হলো-

$$\bar{x} = \frac{\sum .x.w}{\sum w}$$

যেখানে, $\bar{x}$ যোজিত গড়; $\sum$=সমষ্টির প্রতীক; x = তথ্যসারির সংখ্যা; এবং w= প্রতিটি তথ্যের গুরুত্ব।

সারনী ৩.২.২। অনুযায়ী বাংলাদেশের ৮টি নির্ধারিত শহরের শিক্ষিতের হারের ভরযুক্ত যোজিত গড় উপরের সূত্রানুসারে বের করা যাবে।

সারনী ৩.২.২ বাংলাদেশের নির্বাচিত শহরসমূহের শিক্ষিতের হার ও জনসংখ্যা, ১৯৮১।

শহর	শিক্ষিতের হার(%) (x)	জনসংখ্যা (হাজারে)(w)	w.x
ঢাকা	৪৬.৯	৫৫৭	২৬১২৩.৩
ময়মনসিংহ	৫৯.৩	৫৩	৩১৪২.৯
সৈয়দপুর	৪১.৮	৬০	২৫০৮.০
বরিশাল	৪৯.৩	৭০	৩৪৫১.০
কুমিল- া	৪৯.৪	৫৪	২৬৯৪.৬
নারায়ণগঞ্জ	৪১.৫	১৬২	৬৭২৩.০
চট্টগ্রাম	৪৮.০	৩৬৪	১৭৪৭২.০
খুলনা	৪৬.১	১২৮	৫৯০০.৮
		মোট: ১৪৪৮	৬৮০১৫.৬

$$\bar{x} = \frac{৬৮০১৫.৬}{১৪৪৮} = ৪৬.৯৭\%।$$

ভরযুক্ত যোজিত গড় নির্ণয়ের বিকল্প পদ্ধতিও রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা যে কোন পরিসংখ্যান পুস্তকে দেখা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তথ্যসারির মধ্যগামিতা নিরূপণে গড়, মধ্যমা এবং চলের পরিমাপে প্রক্রিয়াগত ভিন্নতা রয়েছে। একই তথ্যসারির জন্য পরিমাপসমূহের ফলাফল এক না-ও হতে পারে; এবং প্রায়শ: এক হয় না। আবার গড় নির্ণয়ে পরিমাপ গুলির যুক্তিগত ভিত্তিরও বিভিন্নতা আছে। তথ্যসারির প্রকৃতি এবং পরিসংখ্যানগত ব্যবহার ভেদে এই পরিমাপগুলি ব্যবহার করা উচিত।

পাঠ সংক্ষেপঃ

তথ্যসারির সংখ্যা মান (x) সমূহ যোগ করে তথ্য সারির মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে যোজিত গড় বা গড় বের করা হয়। একে $\bar{x}$ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যোজিত গড় দুই প্রকারের হতে পারে: (ক) সাধারণ যোজিত গড়; এবং (খ) ভরযুক্ত যোজিত গড়। শ্রেণীবদ্ধ (Classe) তথ্য সারির গড় নির্ণয়ে নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার হবে: $\bar{x} = \frac{\sum fx}{n}$ । ভরযুক্ত যোজিত গড় নির্ণয়ের সূত্র হলো: $\bar{x} = \frac{\sum x.w}{\sum w}$ ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. গড়ের পরিসংখ্যানগত সূত্র হচ্ছে - .... ।

১.২. সাধারণ যোজিত গড়ে তথ্য সারির প্রতিটি সংখ্যা মানকে শুধুমাত্র একবার .... জন্য গণনা করা হয়।

১.৩. প্রতিটি শ্রেণীর .... সেই শ্রেণীর গণসংখ্যা দ্বারা গুণ করে এবং সেই গুণফল যোগ করে সংখ্যামানের সমষ্টি পাওয়া যাবে।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. সাধারণ যোজিত গড় নির্ণয়ে তথ্যসারির প্রতিটি সংখ্যামানকে সমান প্রাধান্য দেওয়া হয় না।

২.২. গড় নির্ণয়ে পরিমাপগুলির যুক্তিগত ভিত্তিরও বিভিন্নতা নেই।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. যোজিত গড় কি? এর নির্ণয়পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

২. ভরযুক্ত যোজিত গড় কোন ক্ষেত্রে নিরূপণ করা হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. নীচের সারনী ব্যবহার করে যোজিত গড় নির্নয় করুন।

শ্রেণী ব্যবধান	২০-২৫	২৫-৩০	৩০-৩৫	৩৫-৪০	৪০-৪৫	৪৫-৫০	৫০-৫৫
গণসংখ্যা	৩	৮	১২	১৮	১৫	১০	৭

২. নীচের সারনী ব্যবহার করে সাতজন জমি মালিকের গড় ধান উৎপাদন নির্ণয় করুন।

জমি মালিক	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ
বিঘা প্রতি ধান উৎপাদন (মণে)	১৭	১৩	১২	২২	১০	১৬	১৮
জমির পরিমান (বিঘা)	৩	২০	১৭	১৩	৮	১৫	১২

উত্তরমালা ঃ ইউনিট-৩

পাঠ-৩.১

১.১. বহু চলন, ১.২. মধ্য, ১.৩. $\tilde{x}$ ।

২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. মি।

পাঠ-৩.২

1.1. $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$, ১.২. যোগের, ১.৩. মধ্যমানকে।

২.১. মি, ২.২. মি।

ইউনিট-৪

বিস্তৃতির পরিমাপ (Measuring Dispersion)

বিস্তৃতি (Dispersion) পরিমাপসমূহ তথ্যসারির ব্যাপ্তি বা বিস্তার (Spread) সম্পর্কীয়। প্রকারান্তরে এই পরিমাপসমূহ তথ্যসারির মধ্যগামিতার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করে থাকে। শুধুমাত্র মধ্যগামিতা সূচক নির্ণয় করে একটি তথ্যসারির চরিত্র বা প্রকৃতি যথেষ্ট অনুধাবনযোগ্য হয় না। বিভিন্ন নিবেশনের গড় মান এক হলেও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। তথ্যসারির সংখ্যাগুলি কিভাবে বিন্যাসিত হয়েছে তার মাত্রা বিস্তৃতি পরিমাপের দ্বারা জানা যায়। তথ্যসারির সংখ্যা মানের কেন্দ্রিকতা বেশি হলে বিস্তৃতি কম হবে ও বিপরীত ক্ষেত্রে বেশি হবে। বিস্তৃতি পরিমাপের একাধিক উপায় আছে। এগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) সাধারণ বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ:

১. পরিসর (Range);

২. চতুর্থক (Quartile);

৩. গড় ব্যবধান (Mean Deviation);

৪. পরিমিত ব্যবধান (Standard Deviation)।

(খ) আপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ :

১. ব্যবধানাঙ্ক (Co-efficient of Variation)

২. গড় ব্যবধানাঙ্ক (Co-efficient of Mean Deviation)

৩. চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক (Co-efficient of Quartile Deviation)।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হচ্ছে-

পাঠ-৪.১ *সাধারণ বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ*

পাঠ-৪.২ *আপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ*

পাঠ-৪.৩ *বিস্তারের আকার*

পাঠ-৪.১

সাধারণ বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ (Measuroment of gneral Dispersion)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- পরিসর ও এর নির্ণয় পদ্ধতি;
- চতুর্থক ব্যবধান ও এর নির্ণয় পদ্ধতি;
- গড় ব্যবধান ও এর নির্ণয় পদ্ধতি; এবং
- পরিমিত ব্যবধান ও এর নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

৪.১.১ পরিসর (Range)

কোন তথ্যসারির সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ছোট সংখ্যা মান দুইটির পার্থক্যকে পরিসর বলে। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতের নির্বাচিত **১১**টি আবহাওয়া কেন্দ্রের গড় বৃষ্টিপাত (ইঞ্চিতে) নিম্নরূপ :

৬১, ৬৪, ৬৮, ৬৬, ৬৯, ৬৭, ৭০, ৬৫, ৭০, ৭২।

এই তথ্যসারির সর্বনিম্ন মান হচ্ছে ৬১ ও সর্বোচ্চমান হচ্ছে ৭২। অতএব, পরিসর মান হবেঃ ৭২-৬১ = **১১** ইঞ্চি। এই স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে তথ্যসারির পরিসর নির্ণয় করা যায়। কিন্তু পরিমাপ হিসেবে পরিসর অত্যন্ত স্থূল পদ্ধতি। এটি কেবল তথ্যসারির দুই প্রান্ত মানের উপর নির্ভর করে এবং অন্যান্য মানসমূহকে এদের বিন্যাসকে বিবেচনার বাইরে রাখে। এই কারণে এই পরিমাপটি সচরাচর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিশেষ কাজে লাগে না।

৪.১.২ চতুর্থক (Quartile)

একটি তথ্যসারির সংখ্যামানগুলিকে মানানুক্রমিক সাজিয়ে যে মানসমূহ তথ্যসারিটিকে সমান ৪ ভাগে ভাগ করে তাদেরকে চতুর্থক বলে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চতুর্থকটির উচ্চ সীমা মধ্যমা মান সম্পন্ন হবে এবং মানের নিচে দুইটি এবং উপরে দুইটি চতুর্থক অবস্থান করে (চিত্র ৪.১.১)। চতুর্থকের প্রতীক ‘Q' দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং প্রথম ও তৃতীয় চতুর্থককে যথাক্রমে $Q_১$ ও $Q_৩$ দ্বারা চিহ্নিত হয়। নীচের সূত্র প্রয়োগ করে চতুর্থক নির্ণয় করা যায়ঃ

$$Q1= \frac{n+১}{8}\times১; \qquad Q3 = \frac{n+১}{8}\times৩ \text{ এবং}$$

$$Q2=\frac{n+১}{8}\times২; \qquad Q4= \frac{n+১}{8}\times8$$

যেখানে, $Q_১$........... Q_8 = ৪টি চতুর্থক পর্যন্ত পরিচিতি; n=ক্রমযোজিত মান (Cumulative Values); এবং **১** = ধ্রুবক।

সাধারণ তথ্যসারিকে মানানুক্রমিক সাজিয়ে উপরের সূত্র প্রয়োগ করে চতুর্থক মানসমূহ নির্ণয় করা যাবে এবং তথ্যসারিটিকে চারভাগ ভাগ করা যাবে। একই সাথে, প্রতি চতুর্থকের প্রকৃত মানও নির্ণয় করা যাবে (সারণী ৪.১.১)। সারনী ৪.১.১ অনুসারে চতুর্থক নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো।

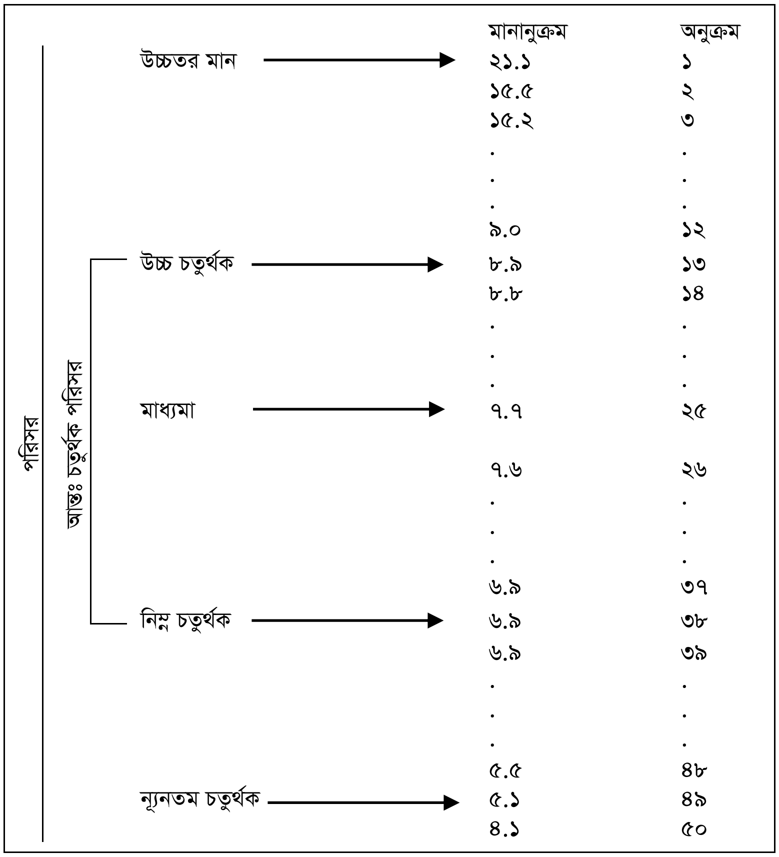

চিত্র ৪.১.১ কয়েকটি সাধারণ বিস্তৃতি পরিমাণ।

এখানে, n =১৬, কাজেই প্রথম চতুর্থক মান হবে $\left(\frac{৬+১}{৪}\right)$ X১ = ৪.২৫ এই মান চতুর্থ ও পঞ্চম মানের মধ্যে অবস্থিত, এই দুই সংখ্যা মানের মধ্যে পৃথকভাবে অবস্থান $Q_১$ শ্রেণী নির্দেশ করবে; এবং এই সংখ্যাদ্বয়ের ব্যবধান যেহেতু (৩১-২৫) = ৬, এর সাথে ২৫ যোগ করলে $Q_১$ পাওয়া যাবে (সারনী ৪.১.১):

$$Q_১ = ২৫+\left(৬\times\frac{১}{৪}\right) = ২৬.৫ \text{ ঘনত্ব}$$

এইভাবে অন্যান্য চতুর্থক মানসমূহ নির্ণয় করা যাবে। যেমন, তৃতীয় চতুর্থকের ক্ষেত্রে:

$$Q_৩ = \frac{১৬+১}{৪} X৩ = \frac{১৭}{৪} X ৩ = \frac{৫১}{৪} = ১২.৭৫ \text{ ঘনত্ব।}$$

অর্থাৎ, ১২.৭৫ তম মানানুক্রমে তৃতীয় চতুর্থক হবে এবং এটি ১২ ও ১৩ তম সংখ্যা মানদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। এই সংখ্যাদ্বয়ের ব্যবধান (৫৩-৪৯) = ৪। এর সাথে $\frac{৩}{৪}$ (তৃতীয় চতুর্থক মান) গুণ করে তৃতীয় চতুর্থক শ্রেণীর উচ্চসীমা মান ৪৯ যোগ করলে $Q_৩$ পাওয়া যাবে (সারনী ৪.১.১)

$$Q_৩ = ৪৯+\left(৪\times\frac{৩}{৪}\right) = ৫২ \text{ ঘনত্ব}$$

সারনী ৪.১.১ ধামসোনা ইউনিয়নে গ্রামসমূহের জনপদ ঘনত্ব (প্রতি বর্গ মাইলে)

গ্রাম কোড	মানানুক্রম	জনবসতির ঘনত্ব
ক	১	১৬
খ	২	১৮
গ	৩	২১
ঘ	৪	২৫
	---------------------------------->	$Q_১$ ২৬.৫
ঙ	৫	৩১
চ	৬	৩৩
ছ	৭	৩৬
জ	৮	৩৭
	---------------------------------->	$Q_২$ মধ্যমা অবস্থান
ঝ	৯	৩৯
ঞ	১০	৪০
ট	১১	৪২
ঠ	১২	৪৯
	---------------------------------->	$Q_৩$ ৫২.০
ড	১৩	৫৩
ঢ	১৪	৫৮
ণ	১৫	৬৫
ত	১৬	৬৭
	---------------------------------->	$Q_৪$

চতুর্থক শ্রেণীভাগকে স্থানিক ব্যবহারে প্রয়োগ সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সমীক্ষা এলাকার একটি মানচিত্রে চারিটি শ্রেণীভাগকে ঘনত্ব অনুযায়ী ছায়াপাত বা রঙের সাহায্যে চিহ্নিত করে জনবসত বিন্যাস নির্দেশ করা যাবে।

শ্রেণীবদ্ধ গণসংখ্যা নিবেশন থেকে চতুর্থক নির্ণয় পদ্ধতি এরূপ নিবেশন থেকে মধ্যমা নির্ণয়ের অনুরূপ। এই রূপ নিবেশন থেকে চতুর্থক সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না, কেবল অনুমান করা যায়। প্রথমে গণসংখ্যাকে যোজিত করে চতুর্থক অবস্থানগুলি নির্ণয় করতে হয়। প্রথমে যে শ্রেণীর যোজিত গণসংখ্যা $\frac{n+১}{৪}\times ১$ মানের সমান বা বেশী হয় সেই শ্রেণীতেই $Q_১$ এর অবস্থান এবং শ্রেণীটি $Q_১$এর অন্তর্ভূক্ত হবে। একই ভাবে $Q_৩$এর অবস্থান হবে সেই শ্রেণীতে যার যোজিত গণসংখ্যা হবে $\frac{n+১}{৪}\times ৩$ মানের সমান বা বেশী এবং এটাই $Q_৩$ শ্রেণী হবে। এইভাবে চতুর্থক শ্রেণীসমূহের অবস্থান নির্ণয়ের পরে উপাত্তগুলি শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিস্তৃত এই কল্পনার ভিত্তিতে চতুর্থক মানসমূহ নিরূপণ করা যাবে।

$Q_১$ মানের নিরূপন সূত্র হলো:

$$Q১ = L১ + \frac{\left(\frac{n+১\times ১}{৪}\right) - fc}{fQ১} \times C$$

যেখানে L১ = প্রথম চতুর্থক শ্রেণীর নিম্নসীমা; fc = প্রথম চতুর্থক শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর যোজিত গণসংখ্যা; fQ১ = প্রথম চতুর্থক শ্রেণীর গণসংখ্যা; C = প্রথম চতুর্থক শ্রেণীর ব্যাপ্তি; এবং n =মোট সংখ্যা; ১ = ধ্রুবক।

$$Q৩ = L৩ + \frac{\left(\frac{n+১\times৩}{৪}\right) - fc}{fQ৩} \times C$$

যেখানে, L৩, fc.C.n, এবং ১ পূর্ববর্তী সূচকের অনুরূপ এবং fQ৩ = তৃতীয় চতুর্থক শ্রেণীর গণসংখ্যা।

এভাবে সূত্রটিতে fQ২ ও fQ৩ প্রয়োগ করে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ চতুর্থক নির্ণয় করা যাবে।

সারনী ৪.১.২-এ একটি প্লাস্টিক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মাসিক বেতনের গণসংখ্যা নিবেশন থেকে বিভিন্ন চতুর্থক মান নির্ণয় করা যাবে। আপাততঃ Q১ ও Q৩ নির্ণয় পদ্ধতি দেখানো হলোঃ Q১ এর অবস্থান হবেঃ

$$Q১ = \left(\frac{n+১}{৪}\right) \times ১ = \left(\frac{২০০+১}{৪}\right) \times ১ = ৫০.২৫$$ শ্রেণী পর্যায়ে।

অতএব, প্রথম চতুর্থক ১০০১-১৫০০ শ্রেণীতে অবস্থিত রয়েছে। এখন, Q১সূত্র প্রয়োগ করে এর মান পাওয়া যাবেঃ

$$Q১ = ১০০১ + \frac{৫০.২৫ - ৪৬}{৪৫} X ৫০০$$

$$= ১০০১ + \frac{৪.২৫}{৪৫} X ৫০০$$

= ১০০১+৪৭.২২ = ১০৪৮.২২ টাকা।

এইভাবে, এর অবস্থান হবেঃ $\left(\frac{n+১}{৪}\right) \times ৩ = \left(\frac{২০০+১}{৪}\right) \times ৩ = ৫০.৭৫$ শ্রেণী পর্যায়ে। অর্থাৎ, তৃতীয় চতুর্থক ৩৫০১-৪০০০ শ্রেণীতে অবস্থান করছে।

সারনী ৪.১.২। নাসরিন প্লাস্টিক কারখানার শ্রমিকদের মাসিক বেতনের (টাকায়) গণসংখ্যা নিবেশন, নবীনগর, ১৯৯০।

বেতন (টাকা)	শ্রমিক সংখ্যা	যোজিত সংখ্যা
৫০০ পর্যন্ত	১৫	১৫
৫০১-১০০০	৩১	৪৬
১০০১-১৫০০	৪৫	৩১-----> Q১ শ্রেণী।
১৫০১-২০০০	১৫	১০৬
২০০১-২৫০০	২২	১২৮
২৫০১-৩০০০	১৩	১৪১---- > মধ্যমা শ্রেণী।
৩০০১-৩৫০০	৩	১৪৪
৩৫০১-৪০০০	৭	১৫১---- > Q৩ শ্রেণী।
৪০০১-৪৫০০	২	১৫৩
৪৫০১-৫০০০	৭	১৬০
৫০০০ এর উর্দ্ধে	৪০	২০০

এখন, $Q_৩$ সূত্র প্রয়োগ করে এর মান পাওয়া যাবেঃ

$$Q_৩ = ৩৫০১ + \frac{১৫০.৭৫ - ১৪৪}{৭} \times ৫০০$$

$$= ৩৫০১ + \frac{৬.৭৫}{৭} \times ৫০০$$

$$= ৩৫০১+৪৮২.১৪$$

$$= ৩৯৮৩.১৪ \text{ টাকা।}$$

উপরের আলোচনায় ব্যবহৃত সারণীদ্বয়ে (৪.১.১ ও ৪.১.২) দেখা যাবে যে, তথ্য সারিটি কতকগুলি চতুর্থক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছেঃ

নিম্ন চতুর্থক (Lower quartile), মধ্যমা শ্রেণী এবং উচ্চ চতুর্থক (Upper quartile)। নিম্ন ও উচ্চ চতুর্থক শ্রেণীদ্বয় তথ্যসারির চতুর্থকের মধ্যে ব্যবধানকে আন্তঃচতুর্থক পরিসর (Inter-quartile range) বলে। এই পরিমাপটি নিবেশনের বিণ্যাস ব্যাখ্যায় সাধারণ পরিসরের পরিবর্তে ব্যবহার করা সুবিধাজনক। চতুর্থক পদ্ধতির মত একইভাবে চারের অধিক শ্রেণীতে একটি তথ্যসারিকে বিভক্ত করা সম্ভব। তথ্যের পরিসর অনুযায়ী তথ্যসারিকে দশমাংশক (Decile) অষ্টমাংশক (Octile), ষষ্ঠমাংশক (Sextile), শতমাংশক (Percentile) ইত্যাদিতে ভাগ করা যায়। তবে এই সমস্ত শ্রেণীভাগের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।

৪.১.৩ গড় ব্যবধান (Mean Deviation) ঃ

তথ্য সারির বিস্তৃতি পরিমাপে পরিসর এবং আন্ত:চতুর্থক পরিসরের একটি অসুবিধা হলো যে, পরিমাপদ্বয় তথ্য সারির কেবল কতিপয় মান বিবেচনা করে থাকে। এগুলি তথ্য সারির প্রতিটি সংখ্যা মান বিবেচনার আওতায় নেয় না। প্রকৃত পক্ষে আন্তঃ চতুর্থক পরিসর তথ্য সারির মানের বিস্তার সম্পর্কে আলোকপাতই করে না (Ebdon, ১৯৮৫)। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য কিছু বিস্তৃতি পরিমাপক রয়েছে যেগুলি তথ্য সারির প্রতিটি মানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এর মধ্যে গড় ব্যবধান গড় মানের পরিপ্রেক্ষিতে মানগুলির পরিসর নির্ণয় করে থাকে। পরিসংখ্যানগতভাবে, গড় ব্যবধান হলো একটি তথ্য সারির গড় মান থেকে সংখ্যা মানগুলির ব্যবধানের গড় পরিগণনা। পরিমাপটি $\bar{x}d$ দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে।

সাধারণ বা অবিন্যস্ত (Unclassified) তথ্য সারির গড় ব্যবধান পরিমাপের জন্য নিগোক্ত সূত্র ব্যবহার হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে : $\bar{x}d = \frac{\sum|x - \bar{x}|}{n}$

যেখানে, $\bar{x}d$ = গড় ব্যবধান; $\bar{x}$ গড়; X = সংখ্যামান; N = তথ্যসংখ্যা এবং $|x - \bar{x}|$ = গড় থেকে প্রতিটি সংখ্যামানের চিহ্ন অনপেক্ষ ব্যবধান। সারনী ৪.১.৩ এর উদাহরণে এই সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে।

মধ্যমা বা চল ব্যবহার করেও এই ব্যবধক নির্ণয় করা যায়। তবে সাধারণতঃ গড়ের সাহায্যে এই ব্যবধক নির্ণিত হয়ে থাকে।

সাধারণ তথ্য সারি থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় ঃ

এক্ষেত্রে, প্রথমে কামাল ও জামাল পরিবার সদস্যদের বয়স নিবেশনদ্বয়ের গড় নির্ণয় করা হয়েছে এবং তারপর গড় থেকে সংখ্যামানগুলির চিহ্নমুক্ত বিচ্যুতি নির্ণিত হয়েছে। পরে বিচ্যূতিমানগুলি ($X-\bar{x}$) যোগ করে যোগফলটিকে মোট তথ্যসংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করে গড় ব্যবধান ($\bar{x}d$) পাওয়া গেছে। এভাবে পরিবারদ্বয়ের সদস্য বয়সের $\bar{x}d$ যথাক্রমে ২২ ও ১০.৮ নির্ণয় করা হয়েছে।

এই উদাহরণে লক্ষ্যণীয় যে, দুই বা ততোধিক তথ্য সারির x এবং $\bar{x}$ একই হলেও অন্তঃস্থ সংখ্যা মানের পার্থক্যের জন্য গড় ব্যবধানের পার্থক্যকরণ হয়। সাধারণভাবে, গড় ব্যবধান মান যত বেশী হবে অন্তঃস্থ সংখ্যা মানের মধ্যে তত বেশি ভিন্নতা বা অসমতা নির্দেশ করবে।

সারনী ৪.১.৩ কামাল ও জামাল পরিবারের সদস্যদের বয়সের গড় ব্যবধানে (বিস্তৃতি পরিমাণসমূহ নির্ণয়)।

কামাল পরিবারের সদস্য	বয়স	$\lvert x-\bar{x}\rvert$	$\lvert x-\bar{x}\rvert^2$	জামাল পরিবারের সদস্য	বয়স	$\lvert x-\bar{x}\rvert$	$\lvert x-\bar{x}\rvert^2$
ক	৬০	৩৫	১২২৫	চ	৩৯	১৪	১৯৬
খ	৪৫	২০	৪০০	ছ	৩৮	১৩	১৬৯
গ	১০	-১৫	২২৫	জ	১৮	-৭	৪৯
ঘ	৮	-১৭	২৮৯	ঝ	১৬	-৯	৮১
ঙ	২	-২৩	৫২৯	ঞ	১৪	-১১	১২১
মোট	১২৫	১১০	২৬৬৮	মোট	১২৫	৫৪	৬১৬

$\bar{x} = 25$

$N = ৫$

$\bar{x}d = \frac{১২৫}{৫} = ২২$

$v = \frac{\sum \lvert x-\bar{x}\rvert^2}{N} = \frac{২৬৬৮}{৫} = ৫৩৪$

$\bar{x} = ২৫$

$N = ৫$

$\bar{x}d = \frac{৫৪}{৫} = ১০.৮$

$v = \frac{\sum \lvert x-\bar{x}\rvert^2}{N} = \frac{৬১৬}{৫} = ১২৩$

বিন্যস্ত তথ্যসারি থেকে গড় ব্যবধান নির্ণয় ঃ

বিন্যস্ত (Classified) গণসংখ্যা নিবেশন থেকে গড় ব্যবধান নিরূপণ সূত্র কিছুটা ভিন্নতর এবং এক্ষেত্রে যোজিত গড় থেকে ($X-\bar{x}$) বের করে শ্রেণীসমূহের মান (f) দ্বারা গুণ করে এর সমষ্টি $\sum f\lvert x-\bar{x}\rvert$ কে মোট তথ্য সংখ্যা (n) দ্বারা ভাগ করে ব্যবধান দেখানো হয় (সারনী ৪.১.৪ দ্রষ্টব্য)

সারনী ৪.১.৪। ভোটদাতাদের বয়সের শ্রেণীভিত্তিক গণসংখ্যা নিবেশন, আনন্দপুর, ১৯৯০।

বয়স শ্রেণী	গণসংখ্যা (f)	মধ্যমান (m.p)	স্তরব্যবধান $d=\frac{X-A}{c}$	f.d	$\lvert X-\bar{x}\rvert$	$f.\lvert X-\bar{x}\rvert$
৩০ ও নিচে	৩	২৫	-৩	-৯	২৯.৭২	৮৯.১৬
৩১-৪০	৬১	৩৫	-২	-১২২	১৯.৭২	১২০২.৯২
৪১-৫০	১৩২	৪৫	-১	-১৩২	৯.৭২	১২৮৩.০৪
৫১-৬০	১৫২	৫৫(A)	০	০	০.২৮	৪২.৮৪
৬১-৭০	১৪০	৬৫	১	১৪০	১০.২৮	১৪৩৯.২০
৭১-৮০	৫১	৭৫	২	১০২	২০.২৮	১০৩৪.২৮
৮১ উর্দ্ধে	২	৮৫	৩	৬	৩০.২৮	৬০.৫৬
মোট	৫৪২			-১৫		৫১৫২.০০

যোজিত গড় $\bar{x} = A + \frac{\sum fd}{n} \times C$

$= ৫৫ + \frac{-১৫}{৫৪২} \times ১০$

$= ৫৫ - ০.২৮ = ৫৪.৭২$ বৎসর

(A= অনুমিত গড় পর্যায়)

গড় ব্যবধান ($\bar{x}d$) $= \sum \frac{f\lvert X-\bar{x}\rvert}{n}$

$= \frac{৫১৫২.০০}{৫৪২}$

$= ৯.৫১$ বৎসর

এই প্রসঙ্গে গড় ব্যবধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় পরিমাপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উলেণ্টখ প্রাসঙ্গিক হবে। প্রথমত: মোট ব্যবধান (Total Deviation) যা গড় ব্যবধানের অংশ বিশেষ মাত্র, অর্থাৎ মোট ব্যবধান বা $Td = |x - \bar{x}|$ মোট ব্যবধানকে বর্গমানে রূপান্তর করে তথ্যসংখ্যা (n)দ্বারা ভাগ করলে ভেদাঙ্ক (Variance) পাওয়া যাবে। অর্থাৎ,

ভেদাঙ্ক বা $v = \frac{\sum(x - \ddot{x})^2}{n}$

বর্গমানে রূপান্তরের ফলে গাণিতিক চিহ্ন (+, -) গুলি এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়। সারণী ৪.১.৩ এ তথ্যসারিতে V এর মান নিরূপণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে V-এর মান $\bar{x}$d-এর ন্যায় ব্যাখ্যা করতে হয়; অর্থাৎ, v-এর মান যত বেশী হবে তথ্যসারির সংখ্যামানের মধ্যে ভিন্নতা ততবেশী হবে। সারণী ৪.১.৩-এর কামাল ও জামাল পরিবারদ্বয়ের সদস্যদের মধ্যে বয়স ভিন্নতার তারতম্য v মানের পার্থক্যের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

৪.১.৪ পরিমিত ব্যবধান (Standard Deviation)

ভেদাঙ্কের বর্গমূল হলো পরিমিত ব্যবধান। পরিমিত ব্যবধান গড় ব্যবধানের মতই সংখ্যা মানসমূহের গড় থেকে ব্যবধান নিয়ে নির্ণয় করা হয়। পরিমিত ব্যবধানের ক্ষেত্রে সব সময় যোজিত গড় ব্যবহার করা হয়। যোজিত গড়ের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, তথ্য সারির সংখ্যাগুলির যোজিত গড় থেকে বিচ্যুতির বর্গের সমষ্টি হবে সবচেয়ে কম। ফলে এই পরিমাপের ব্যবহারোপযোগিতা বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে, গড় ব্যবধানের ক্ষেত্রে চিহ্নমুক্ত বিচ্যুতি ব্যবহার করা হয়। অথচ পরিমিত ব্যবধানের ক্ষেত্রে বিচ্যুতির বর্গ ব্যবহার করা হয়। এ জন্য পরিমাপটিকে অনেক সময় 'মূল গড় বর্গকৃত ব্যবধান' (Root Mean Standard Deviation) বলে এবং পরিমিত ব্যবধান (δ)চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়-চিহ্নটি গ্রীক অক্ষর 'সীগমা'। পরিমাপটি নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশিত হয়:

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n}}$$

সারণী ৪.১.৩-এর উদাহরণ দ্বারা বর্ণিত ভেদাঙ্ক (v) থেকে সহজে পরিমিত ব্যবধান (δ) নির্ণয় করা যাবে অর্থাৎ কামাল পরিবারের সদস্যদের বয়সের পরিমিত ব্যবধান হবেঃ

$$\delta = \sqrt{\frac{২৬৬৮}{৫}}$$
$$= \sqrt{(৫৩৩} = ২৩.১।$$

জামাল পরিবারের সদস্যদের বয়সের পরিমিত ব্যবধান হবেঃ

$$\delta = \sqrt{\frac{৬১৬}{৫}}$$
$$= \sqrt{১২৩} = ১১.১।$$

বিন্যস্ত তথ্য সারি থেকে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয়

বিন্যস্ত বা শ্রেণীবদ্ধ তথ্য সারি থেকে কিছুটা ভিন্ন পদ্ধতিতে পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় করা হয়। প্রথমে প্রতি শ্রেণীসংখ্যার মধ্যমানকে সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি ধরা হয়। মোট বর্গকৃত বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য তথ্য সারির যোজিত গড় থেকে শ্রেণী

মধ্যমাণের বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হয়। এরপর বিচ্যুতিগুলির বর্গ নির্ণয় করে প্রতি শ্রেণীর বর্গকৃত বিচ্যুতিকে সেই শ্রেণীর গণসংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হয়। গুণফলের সমষ্টিকে মোট গণসংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ভাগফলকে বর্গমূলে পরিণত করলেই পরিমিতি ব্যবধান (δ) পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে (δ)-এর সূত্র নিম্নরূপ হবেঃ

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum \int \left(x - \bar{x}\right)^2}{n}}$$

যেখানে, X= শ্রেণীর মধ্যমান; ∂ = শ্রেণীর গণসংখ্যা; $\bar{x}$= যোজিত গড়; n = মোট গণসংখ্যা এবং $(x-\bar{x})^2$ = $\bar{x}$ থেকে মধ্যমানের বিচ্যুতির বর্গ। সারণী ৪.১.৫-এ এই সূত্রাবলম্বনে গণসংখ্যা নিবেশন থেকে (δ) নির্ণয়ের পর্যায়সমূহ দেখানো হয়েছে।

সারনী ৪.১.৫ ঃ একটি বেদে বহরের জনসংখ্যার বয়স কাঠামো

বয়স শ্রেণী (বৎসর)	জনসংখ্যা (f)	মধ্যমান (X)	f.X	$X-\bar{x}$	$(x-\bar{x})^2$	$f(x-\bar{x})^2$
৪ ও নীচে	৩৭	২০	৭৪.০	-২০.৪৯	৪১৯.৮৪	১৫৫৩৪.০৮
৫-৯	৩৮	৭.০	২৬৬.০	-১৫.৪৯	২৩৯.৯৪	৯১১৭.৭২
১০-১৯	৩৩	১৪.৫	৪৭৮.৫	-৭.৯৯	৬৩.৮৪	২১০৬.৭২
২০-৩৫	৪৩	২৭.৫	১১৮২.৫	৫.০১	২৫.১০	১০৭৯.৩০
৩৬-৪৫	২০	৪০.৫	৮১০.০	১৮.০১	৩২৪.৩৬	৬৪৮৭.২০
৪৬-৫৯	১৮	৫২.৫	৯৪৫.০	৩০.০১	৯০০.৬০	১৬২১০.৮০
৬০ ও উর্দ্ধে	১১	৬৭.৫	৭৪২.৫	৪৫.০১	২০২৫.৯০	২২২৮৪.৯০
মোট =	২০০		৪৪৯৮.৫			৭২৮২০.৭২

$\bar{x} = \frac{৪৪৯৮.৫}{২০০}$ = ২২.৪৯ বৎসর।

$\delta = \sqrt{\frac{৭২৮২০.৭২}{২০০}} = \sqrt{৩৬৪.১০}$ = ১৯.০৮ বৎসর।

পরিসংখ্যানগত তথ্যের বিস্তৃতি পরিমাপে পরিমিত ব্যবধান স্থানিক বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য শাস্ত্রে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। নমুনা সম্পর্কে অনুমান সম্বন্ধীয় বেশ কিছু পরামাত্রিক পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে পরিমিত ব্যবধান একটি যুক্তিগত ভিত্তি প্রদান করে থাকে। পরবর্তী পাঠে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। পরিমিত ব্যবধানের আরও একটি বিশেষ গুণ ও ব্যবহার আছে। যে কোন তথ্যসারির জন্য গড় মানের সাথে পরিমাপটির নিম্নলিখিত সম্পর্ক রয়েছেঃ

১. নিবেশনের ৫৬% একক গড়মাণের উভয়পার্শ্বে ১.৫δ বিস্তারের মধ্যে অবস্থান করে ($\bar{x}$-১.৫δ এবং $\bar{x}$ +১.৫δ বা ±১.৫δ);
২. নিবেশনের অন্ততঃ ৭৫% একক গড়মানের উভয় পার্শ্বে ২δ বিস্তারের মধ্যে অবস্থান করে ($\bar{x}$-২δ এবং $\bar{x}$ +২δ বা $\bar{x}$ ± ২δ);
৩. নিবেশনের অন্ততঃ ৮৯% একক গড়মানের উভয়পার্শ্বে ৩δ বিস্তারের মধ্যে অবস্থান করে ($\bar{x}$-৩δ এবং $\bar{x}$ +৩δ বা ± ৩δ);
৪. নিবেশনের অন্ততঃ ৯৯% একক গড়মানের উভয়পার্শ্বে ৪δ বিস্তারের মধ্যে অবস্থান করে ($\bar{x}$-৪δ এবং $\bar{x}$ +৪δ বা ± ৪δ)।

গণসংখ্যা নিবেশনের আকার যেমনই হোক না কেন সকল বিন্যাসের জন্যই এই সম্পর্কসমূহ প্রযোজ্য। স্থানিক বিশ্লেষণে, এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়মানের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ের নীচে ও উপরে তথ্য সারিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে, প্রতি শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত এলাকা/স্থানগুলির মানের গুরুত্ব অনুযায়ী ছায়াপাত পদ্ধতি বা বিভিন্ন কোন তথ্যসারির ধারা বিন্যাস

স্থানিক মানচিত্রে দেখানো যায়। এরূপ মানচিত্র কোন তথ্যসারির স্থানিক বিন্যাসকে পরিদৃশ্যমান করতে পরিসংখ্যানগত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করে বলে এইভাবে তথ্যের মানচিত্রায়ন অধিকতর যুক্তিযুক্ত (Logical) হয়।

পরিমিত ব্যবধান নির্ণয়ের অপেক্ষাকৃত সহজতম ও প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ এখানে উলেণ্টখ করা হয়েছে। বিকল্প পদ্ধতিসমূহ যে কোন পরিসংখ্যান পুস্তকে দেখা যেতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপঃ

তথ্যসারির সংখ্যাগুলি কিভাবে বিন্যাসিত হয়েছে তার মাত্রা বিস্তৃতি পরিমাপের দ্বারা জানা যায়। কোন তথ্যসারির সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ছোট সংখ্যা মান দুইটির পার্থক্যকে পরিসর বলে। একটি তথ্যসারির সংখ্যামানগুলিকে মানানুক্রমিক সাজিয়ে যে মানসমূহ তথ্য সারিটিকে সমান ৪ ভাগে ভাগ করে তাদেরকে চতুর্থক বলে। গড় ব্যবধান হলো একটি তথ্যসারির গড় মান থেকে সংখ্যা মানগুলির ব্যবধানের গড় পরিগণনা। পরিমাপটি $\bar{x}d$ দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। ভেদাঙ্কের বর্গমূল হলো পরিমিত ব্যবধান। একে (δ) চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. নিম্ন ও উচ্চ চতুর্থক শ্রেণীদ্বয় তথ্য সারির চতুর্থকের মধ্যে ব্যবধানকে .... পরিসর বলে।

১.২. সাধারণত: .... সাহায্যে এই গড় ব্যবধান নির্ণিত হয়ে থাকে।

১.৩. পরিমিত ব্যবধানের ক্ষেত্রে সব সময় .... ব্যবহার করা হয়।

১.৪. গড় ব্যবধানের ক্ষেত্রে চিহ্নমুক্ত .... ব্যবহার করা হয়।

১.৫. মোট বর্গকৃত বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য তথ্য সারির .... গড় থেকে শ্রেণী মধ্যমাণের বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হয়।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. চতুর্থক শ্রেণীভাগকে স্থানিক ব্যবহারে প্রয়োগ সম্ভব নয়।

২.২. গড় ব্যবধান গড় মানের পরিপ্রেক্ষিতে মানগুলির পরিসর নির্ণয় করে থাকে।

২.৩. গড় ব্যবধান মান যত বেশী হবে অন্তঃস্থ সংখ্যা মানের মধ্যে তত বেশি ভিন্নতা বা অসমতা নির্দেশ করবে।

২.৪. পরিমিত ব্যবধানের ক্ষেত্রে বিচ্যুতির বর্গমূল ব্যবহার করা হয়।

২.৫. নিবেশনের অন্তত: ৯৫% একক গড়মানের উভয় পার্শ্বে ২δ বিস্তারের মধ্যে অবস্থান করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. গড় ব্যবধান এবং পরিমিত ব্যবধানের মধ্যে পার্থক্য নির্নয় করুন।

২. ভেদাঙ্ক কি? কিভাবে নির্নয় করতে হয়?

৩. পরিমিত ব্যবধানের সাথে নিবেশনের সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. শফিক ও রফিকের ৬ টি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর থেকে গড় ব্যবধান, পরিমিত ব্যবধান এবং ভেদাঙ্ক নির্ণয় করুন।

	বাংলা	ইংরেজী	ভূগোল	পদার্থ	রসায়ণ	গণিত
শফিক	৯৫	১১০	১৬৫	১২০	১৭০	১৮০
রফিক	১১০	১১৫	১৩০	১৩৫	১২৫	১২০

২. নীচের সারনী ব্যবহার করে চতুর্থক ব্যবধান, গড় ব্যবধান, পরিমিত ব্যবধান এবং ভেদাঙ্ক নির্ণয় করুন।

শ্রেণী ব্যবধান	৫-১০	১০-১৫	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০	৩০-৩৫	৩৫-৪০
গণসংখ্যা	৩	৫	৭	৯	৬	৪	২

পাঠ-৪.২

আপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ (Measurement of Reletive Dispersion)

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- ব্যবধানাঙ্ক ও এর নির্ণয় পদ্ধতি;
- গড় ব্যবধানাঙ্ক ও এর নির্ণয় পদ্ধতি; এবং
- চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক ও এর নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

সাধারণ বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ একক নিবেশন বা তথ্যসারির বিস্তার পরিমাপের জন্য বিশেষ উপযোগী, কিন্তু দুই বা ততোধিক তথ্যসারির মধ্যে বিস্তৃতির তারতম্য তুলনা করার জন্য উপযুক্ত নয়। একটি তথ্যসারির গড় এবং সংখ্যা মানের বিচ্যুতি অন্য সারির তুলনায় স্বাভাবিকভাবে ভিন্নতর হবে। এই পার্থক্যকরণ প্রধাণত: ঘটে গড়ের অন্তর্নিহিত পার্থক্যের জন্য। তুলনার সুবিধার জন্য এক বা ভিন্ন জাতীয় পরিমাপ একক সম্বলিত দুইটি তথ্যসারির মধ্যে ভেদের তুলনার জন্য সাধারণ ব্যবধানগুলিতে আপেক্ষিকভাবে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হয়। এই রূপান্তরণের সহজ উপায় হলো তথ্যসমূহের গড় থেকে ব্যবধান সমূহকে ঐ গড়ের শতকরা হারে প্রকাশ করা। এই পদ্ধতিতে দুইটি ভিন্ন নিবেশন বা তথ্য সারিকে আপেক্ষিক বিভিন্নতার ভিত্তিতে সহজেই তুলনা করা যায়। লক্ষ্যণীয় যে, প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ সাধারণ বিস্তৃতি পরিমাপসমূহের পরিবর্তিত রূপ।

আলোচ্য অংশে কয়েকটি প্রধান আপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপসমূহের প্রয়োগ দেখানো হবে।

৪.২.১ ব্যবধানাঙ্ক (Co-efficient of Variation) ঃ

ব্যবধানাঙ্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত আপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপ পদ্ধতি। পরিমাপ V চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। পরিমিত ব্যবধানকে যোজিত গড়ের শতকরা হারে প্রকাশ করে ব্যবধানাঙ্ক (v) নির্ণয় করা হয় (পরিমিত ব্যবধানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একমাত্র গড় হলো যোজিত গড়)

$$V = \frac{\delta}{\bar{x}} \times ১০০$$

যেখানে, V = ব্যবধাঙ্ক; δ = পরিমিত ব্যবধান; এবং $\bar{x}$ = যোজিত গড়।

সারনী ৪.১.৩- এর কালাম ও জামাল পরিবারে বয়স কাঠামো বিন্যাস ভিন্নতা সম্পর্কে যথাক্রমে পরিমিত ব্যবধান (δ) নিম্নরূপ পাওয়া গেছেঃ

কামাল পরিবারঃ δ = ২৩.১ ; N = ৫। জামাল পরিবারঃ =১১.১; N = ৫।

অতএব, দুইটি ক্ষেত্রে ব্যবধানাঙ্ক হবেঃ

কামাল পরিবারঃ $V = \frac{২৩.১}{৫} \times ১০০ = ৪৬২\%$ জামাল পরিবারঃ $= \frac{১১.১}{৫} \times ১০০ = ২২২\%$।

সাধারণভাবে V-এর মান যত বেশী হবে তথ্যসংখ্যার মধ্যে ভিন্নতা তত অধিক হবে। উপরোক্ত উদাহরণে যদিও দুইটি তথ্য সারির N সমান, কিন্তু তথ্যসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য (বিশেষ করে প্রথমটির ক্ষেত্রে) ভিন্ন δ মান দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। গড়মানের প্রেক্ষিতে δ' দু'টির ভিন্নতা আপেক্ষিকভাবে V মানদ্বয়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

৪.২.২ গড় ব্যবধানাঙ্ক (Co-efficient of mean Deviation) ঃ

গড় ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয়ে গড় ব্যবধান মান এবং বিশেষ ধরণের গড় ব্যবধানের অনুপাতকে শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। এই পরিমাপটি $V\bar{x}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। গড় ব্যবধান যোজিত গড় ($\bar{x}$) এবং মধ্যমা ($\tilde{x}$) এই দুই জাতীয় গড় থেকে নির্ণয় করা যায় সেহেতু গড় ব্যবধানাঙ্ক দুইভাবে প্রকাশ করা যাবে:

ক, $V\bar{x} = \frac{\text{গড় ব্যবধান}}{\text{যোজিত গড়}} \times ১০০$

খ, $V\tilde{x} = \frac{\text{গড় ব্যবধান}}{\text{মধ্যমা}} \times ১০০$

আপাতত: প্রথম সূত্র ব্যবহার করে সারনী ৪.২.১-এর শ্রেণীবদ্ধ তথ্য সারি থেকে গড় ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় করা হয়েছে।

সারনী ৪.২.১। একটি খামারে শ্রমিকদের বেতনের গণসংখ্যা নিবেশন, চাঁদপুর, ১৯৯৮।

মাসিক বেতন (টাকা)	গণসংখ্যা (f)	মধ্যমান (স)	স্তরব্যবধান $d=\frac{X-A}{c}$	f.d	$\lvert X-\bar{x}\rvert$	$f\lvert X-\bar{x}\rvert$
১-৫০০	১৬	২৫০.৫	-৩	-৪৮	১১৫৯.৯১	১৮৫৫৮.৫৬
৫০১-১০০০	৫২	৭৫০.৫	-২	-১০৪	৬৫৯.৯১	৩৪৩১৫.৩২
১০০১-১৫০০	৭৬	১২৫০.৫	-১	-৭৬	১৫৯.৯১	১২১৫৩.১৬
১৫০১-২০০০	৩২	১৭৫০.৫ (ই)	০	০	৩৪০.০৯	১০৮৮২.৮৮
২০০১-২৫০০	২৫	২২৫০.৫	১	২৫	৮৪০.০৯	২১০০২.২৫
২৫০১-৩০০০	১৩	২৭৫০.৫	২	২৬	১৩৪০.০৯	১৭৪২১.১৭
৩০০১-৩৫০০	৬	৩২৫০.৫	৩	১৮	১৮৪০.০৯	১১০৪০.৫৪
৩৫০১-৪০০০	২	৩৭৫৩.৫	৪	৮	২৩৪০.০৯	৪৬৮০.১৮
মোট	২২২			-১৫১		১৩০০৫৪.০৬

A = অনুমিত গড় পর্যায়

এখানে স্তর ব্যবধান, $d = \frac{X-A}{৫০০} = \frac{X-১৭৫০.৫}{৫০০}$

যোজিত গড় : $\bar{X} = ১৭০৫.৫ + \frac{-১৫১}{২২২} \times ৫০০$

$= ১৭৫০.৫ - ৩৪০.০৯$

$= ১৪১০.৪১$ টাকা।

গড় ব্যবধান : $\bar{x}d = \frac{১৩০০৫৪.০৬}{২২২} = ৫৮৫.৮৩$ টাকা।

গড় ব্যবধানাঙ্ক : $V\bar{x} = \frac{৫৮৫.৮৩}{১৪১০.৪১} \times ১০০$

$= ৪১.৫৪\%$।

৪.২.৩ চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক (Co-efficient of Quartile Deviation) ঃ

চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক গড় মান থেকে বের করা হয় না। চতুর্থক (Q) এর ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক, V_Q নির্ণয়ের সূত্র হলো:

$$V_Q = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} \times ১০০$$

সূত্রটি সারনী ৫.২.২ তথ্য সারিতে প্রয়োগ করে V_Q নির্ণয় পর্যায় সমূহ দেখানো হয়েছে।

সারনী ৪.২.২। জাহাঙ্গীরনগর এলাকার পরিবারসমূহের সাপ্তাহিক ব্যয়ের গণসংখ্যা নিবেশন, ২০০৪।

সাপ্তাহিক খরচ (টাকা)	পরিসংখ্যা	যোজিত গণসংখ্যা	
৫০-১০০	৭	৭	
১০০-১৫০	২৯	৩৬	
১৫০-২০০	৬৫	১০২	
	---------	--------(১২৫.৫)-------	-----> $Q_১$
২০০-২৫০	৯১	১৯২	
২৫০-৩০০	১৩৬	৩২৮	
	-----------------	(৩৭৬.৫)------	
৩০০-৩৫০	৮২	৪১০	----> $Q_৩$
৩৫০-৪০০	৬১	৪৭১	
৪০০-৪৫০	২২	৪৯৩	
৪৫০-৫০০	৬	৪৯৯	
৫০০-৫৫০	২	৫০১	

$Q_১$ নির্ণয়:

$Q_১ = \left(\frac{n+১}{৪}\right) \times ১ = \frac{৫০১+১}{৪} = ১২৫.৫$ তম মান হবে প্রথম চতুর্থক। $Q_১$ সংখ্যামান (১২৫.৫)২০০-২৫০ শ্রেণীতে অবস্থান করছে। এখন শ্রেণীবদ্ধ তথ্য থেকে $Q_১$ নির্ণয় করা যাবেঃ

$$Q_১ = L_১ + \left(\frac{n+১}{৪}\right) - f.c \times c$$

$$= ২০০ + \frac{১২৫.৫ - ১০১}{৯১} \times ৫০$$

$$= ২০০ + ১৩.৪৬$$

$= ২১৩.৪৬$ টাকা।

$Q_৩$ নির্ণয়:

$Q_৩ = \left(\frac{n+১}{৪}\right) \times ৩ = \frac{৫০১+১}{৪} \times ৩ = ৩৭৬.৫$ তম মান হবে তৃতীয় চতুর্থক $Q_৩$ সংখ্যামান (৩৭৬.৫)৩০০-৩৫০ শ্রেণীতে রয়েছে। এখন শ্রেণীবদ্ধ নিবেশন থেকে $Q_৩$ নির্ণয়ের সূত্র প্রয়োগ করা যাবে:

$$Q_৩ = ৩০০ + \frac{৩৭৬.৫ - ৩২৮}{৮২} \times ৫০$$

$$= ৩০০ + \frac{৪৮.৫}{৮২} \times ৫০$$

$$= ৩০০ + \frac{২৮২৫}{৮২}$$

$= ৩২৯.৫৭$ টাকা।

$Q_১$ এবং $Q_৩$ মান পাওয়া গেছে। এখন, চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক V_Q নির্ণয় করা সম্ভব হবে এই পরিমাপের সূত্র প্রয়োগ করেঃ

$$V_Q = \frac{৩২৯.৫৭-২১৩.৪৬}{৩২৯.৫৭+২১৩.৪৬} \times ১০০$$

$$= \frac{১১৬.১১}{৫৪৩.০৩} \times ১০০$$

$$= ২১.৩৮\%$$

অর্থাৎ পরিবারের সাপ্তাহিক খরচের চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক ২১.৩৮% হবে চতুর্থক ব্যবধানাঙ্কের মতই ষষ্ঠমাংশক, অষ্টমাংশক ইত্যাদি ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু এদের ব্যবহার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে ব্যাপক নয়।

পাঠ সংক্ষেপঃ

আপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ সাধারণ বিস্তৃতি পরিমাপসমূহের পরিবর্তিত রূপ। ব্যবধানাঙ্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত আপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপ পদ্ধতি। এটি V চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। পরিমিত ব্যবধানকে যোজিত গড়ের শতকরা হারে প্রকাশ করে ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় করা হয়; সূত্র হচ্ছে- $V = \frac{\delta}{\bar{x}} \times ১০০$*। গড় ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয়ে গড় ব্যবধান মান এবং বিশেষ ধরণের গড় ব্যবধানের অনুপাতকে শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। এটি* $V\bar{x}$ *দ্বারা প্রকাশ করা হয়। গড় ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে-* $V\bar{x} = \frac{\text{গড় ব্যবধান}}{\text{যোজিত গড়}} \times ১০০$

অথবা, $V\tilde{x} = \frac{\text{গড় ব্যবধান}}{\text{মধ্যমা}} \times ১০০$ *। চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক চতুর্থক (Q) এর ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্র হলো* $V_Q = \frac{Q_৩ - Q_১}{Q_৩ + Q_১} \times ১০০$ *।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. ভিন্ন জাতীয় পরিমাপ একক সম্বলিত দুইটি তথ্য সারির মধ্যে ভেদের তুলনার জন্য সাধারণ ব্যবধানগুলিতে .... রূপান্তরিত করার প্রয়োজন হয়।

১.২. আপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপসমূহ সাধারণ .... পরিবর্তিত রূপ।

১.৩. পরিমিত ব্যবধানকে যোজিত গড়ের .... প্রকাশ করে ব্যবধানাঙ্ক (v) নির্ণয় করা হয় ।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. একটি তথ্যসারির গড় এবং সংখ্যা মানের বিচ্যূতি অন্য সারির তুলনায় ভিন্নতর হয় না।

২.২. গড় ব্যবধান যোজিত গড় ($\bar{x}$) এবং মধ্যমা ($\tilde{x}$) এই দুই জাতীয় গড় থেকে নির্ণয় করা যায়

২.৩. চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক গড় মান থেকে বের করা হয় ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. আপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপকসমূহ কেন ব্যবহৃত হয়?

২. ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. নীচের সারন ব্যবহার করে ব্যবধানাঙ্ক, গড় ব্যবধানাঙ্ক এবং চতুর্থক ব্যবধানাঙ্ক নির্ণয় করুন।

শ্রেণী ব্যবধান	১৮-২০	২০-২২	২২-২৪	২৪-২৬	২৬-২৮	২৮-৩০	৩০-৩২
গণসংখ্যা	৫	৭	৮	১১	৯	৮	২

২. নীচে ২ জন বাস্কেট বল খেলোয়ারের ৮ টি ম্যাচের স্কোর সংখ্যা দেয়া হল। ব্যবধানাঙ্ক বেড় করে মন্তব্য করুন, কে বেশী ধারাবাহিক?

খেলোয়ার 'ক'	৭	২	১৩	২২	১	৩৪	২০	১৫
খেলোয়ার 'খ'	১২	১৭	১৩	২০	১৫	১৮	১৬	১৪

পাঠ-৪.৩

বিস্তারের আকার

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- বিস্তারের আকার ও তার পরিমাপ;
- বঙ্কিমতা ও তার নির্নয় পদ্ধতি; এবং
- তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

কোন তথ্যের গণসংখ্যা নিবেশনের প্রকৃতি ব্যাখ্যার জন্য যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা প্রয়োজন তার মধ্যে মধ্যগামিতা এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিস্তৃতি (Dispersion) গণসংখ্যা নিবেশনের বিস্তার সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে থাকে। অন্য কথায় এটি কোন বিন্যাসের 'ব্যাপকতা' নির্দেশ করে কিন্তু এই ধরণের পরিমাপ গণসংখ্যা নিবেশনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র সম্পর্কে কোনই আলোকপাত করে না। কোন নিবেশনের চরিত্র ভালভাবে জানার জন্য আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। এই গুলি হলো:

ক. বঙ্কিমতা (Skewness); এবং

খ. তীক্ষ্ণতা (Kurtosis)।

এগুলি দ্বারা গণসংখ্যা নিবেশনের বিস্তার এবং এর আকার সম্পর্কে জানা যায়।

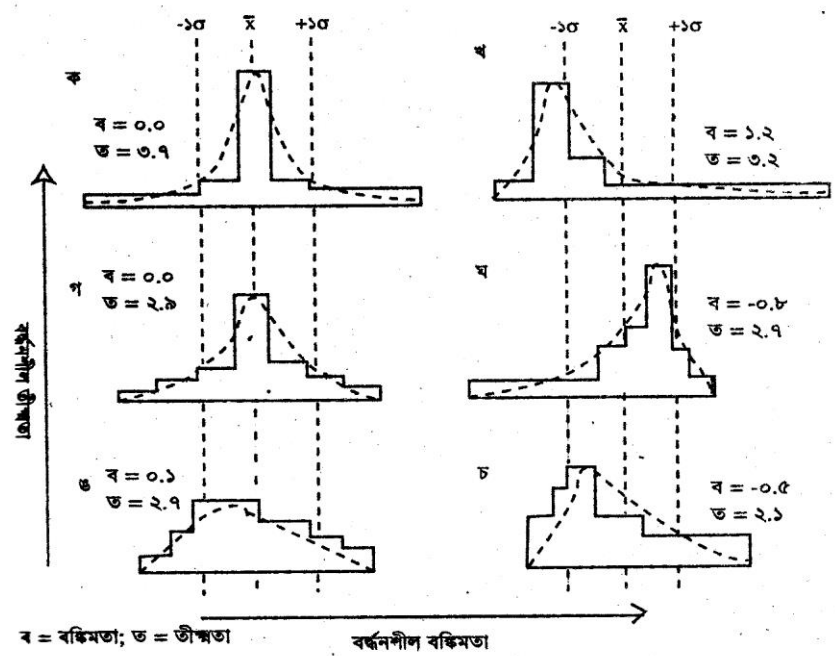

চিত্র ৪.৩.১। বঙ্কিমতা ও তীক্ষ্ণতা।

বঙ্কিমতা (Skewness) ঃ

একটি সুষম নিবেশনের গড় সংখ্যা মানের উভয় পাশে তথ্যগুলি প্রতিসমভাবে (Symmetrically) সজ্জিত থাকে অথবা যোজিত গড় মান একই হয়। একটি পরিমিত ব্যবধানের সূচক লেখচিত্রে এক্ষেত্রে একটি প্রতিসম রেখা পাওয়া যাবে। এটিই সুষম রেখা (Normal Curve)। চিত্র ৪.৩.১ গ-এর এইরূপ রেখাটি বঙ্কিমতা বর্জিত। একটি অপ্রতিসম (Asymmetrical) নিবেশনে যোজিত গড়, মধ্যমা ও চল এক হবে না এবং এই নিবেশনে লেখচিত্রে প্রকাশ করলে গড় রেখার উভয় পাশে অসমতা চোখে পড়ে; অর্থাৎ পরিমিত ব্যবধান মানসমূহ উভয় দিকে সমানভাবে বিস্তৃত হবে না।

চিত্র ৪.৩.১-এ আয়তলেখ ও আরোপিত লেখচিত্রের সাহায্যে ছয়টি বিভিন্ন গণসংখ্যা নিবেশন দেখানো হয়েছে। এগুলিতে সমান সংখ্যক গণসংখ্যা (n) রয়েছে। তুলনার সুবিধার জন্য গড়ের প্রেক্ষিতে $\pm$ ১δ তথ্য বিস্তার চিত্রগুলিতে দেখানো হয়েছে। ছয়টি আয়তলেখের পারস্পারিক পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট। চিত্রটির খ, ঘ ও চ-এর মধ্যে একটি প্রধান সাদৃশ্য হচ্ছে এগুলি অপ্রতিসম। লেখচিত্রগুলির শীর্ষবিন্দুর চল নির্দেশক এবং শীর্ষবিন্দুগুলি লেখ চিত্রসমূহের একদিকে অবস্থান করছে। এইরূপ নিবেশনকে লেখ চিত্রের বঙ্কিমতা বলে। মধ্যমা ও যোজিত গড় মান রেখার বঙ্কিমতা বৈশিষ্ট্য অনুসারে শীর্ষবিন্দু অবস্থান বাম অথবা ডান দিকে দেখা যায়। বঙ্কিম রেখাটি বাম দিকে হলে একে বামায়ত বঙ্কিমতা (Negative Skewness) এবং ডান দিকে হলে দক্ষিণায়ত বঙ্কিমতা (Positive Skewness) বলে । এই ধরনের নিবেশন তথ্য মানগুলির বিশেষ গড় মানের নির্দিষ্ট দিকে বিন্যস্ত হওয়ার প্রবণতা বা অবস্থান নির্দেশ করে। অপর কথায় নিবেশনটির অধিকাংশ তথ্য মান যদি গড় মানের চেয়ে উপরে হয় তবে বিন্যাসটি দক্ষিণায়ত বঙ্কিমতা সম্পন্ন হবে (চিত্র ৪.৩.১)। নিবেশনের অধিকাংশ তথ্যমান যখন গড়মানের চেয়ে নিচে হয় তখন বিন্যাসটি বামায়ত বঙ্কিমতা সম্পন্ন হবে (চিত্র ৪.৩.১ খ)। একটি পরিপূর্ণভাবে প্রতিসম নিবেশনে কোন বঙ্কিমতা হয় না (চিত্র ৪.৩.১ ঘ)। বঙ্কিমতা পরিমাপের বেশ কয়েকটি পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি রয়েছে। সাধারণভাবে প্রচলিত পরিমাপক পদ্ধতি হচ্ছে পরিঘাতিক (Momental) বঙ্কিমতা পরিমাপ (SK)। এই পদ্ধতিতে বঙ্কিমতা নিম্ন সূত্রানুযায়ী নির্ণিত হয়।

$$SK = \frac{\sum\left(X - \bar{x}\right)^{৩}}{n\delta^{৩}}$$

যেখানে, বঙ্কিমতা; $(X - \bar{x})^3$ = গড় থেকে সংখ্যা মানের ব্যবধানের ঘনক (Cube); δ = পরিমিত ব্যবধান; এবং = মোট তথ্য সংখ্যা। এই সূত্রটি সারনী ৪.৩.১ এর উদাহরণে প্রয়োগ করা হয়েছে।

সারনী ৪.৩.১। বঙ্কিমতা ও তীক্ষ্ণতা নির্ণয় পদ্ধতি।

X	$X - \bar{x}$	$(X - \bar{x})^2$	$(X - \bar{x})^3$	$(X - \bar{x})^4$
১	-২.৬	৬.৭৬	-১৭.৫৭৬	৪৫.৬৯৭৬
২	-১.৬	২.৫৬	-৪.০৯৬	৬.৫৫৩৬
২	-১.৬	২.৫৬	-৪.০৯৬	৬.৫৫৩৬
৩	-০.৬	০.৩৬	-০.২১৬	০.১২৯৬
৩	-০.৬	০.৩৬	-০.২১৬	০.১২৯৬
৩	-০.৬	০.৩৬	-০.২১৬	০.১২৯৬
৪	০.৪	০.১৬	০.০৬৪	০.০২৫৬
৫	১.৪	১.৯৬	২.৭৪৪	৩.৮৪১৬
৬	২.৪	৫.৭৬	১৩.৮২৪	৩৩.১৭৭৬
৭	৩.৪	১১.৫৬	৩৯.৩০৪	১৩৩.৬৩৩৬
৩৬		৩২.৪০	২৯.৫২০	২২৯.৮৭২০

সারনী ৪.৩.১ অনুযায়ীঃ

$\bar{x} = \frac{৩৬}{১০}$ =৩.৬।

$\delta \sqrt{\frac{৩২.৪০}{১০}} = \sqrt{৩.২৪} = ১.৮$।

বঙ্কিমতা ঃ

$sk = \frac{২৯.৫২০}{১০ \times ১.৮৩} - \frac{২৯.৫২০}{১০ \times ৫.৮৩২} = \frac{২৯.৫২০}{৫৮.৩২} = ০.৫০৬$ ।

নিবেশটিতে যে বঙ্কিমতা মান পাওয়া গেছে (০.৫০৬) তা' দক্ষিণায়ত প্রবণতা নির্দেশ করে।

সমাজ বিজ্ঞানের শাখাসমূহে ও স্থানিক সমীক্ষায় অনেক তথ্য সারি নিবেশনে বঙ্কিমতা লক্ষ্য করা যায়। এ ধরণের বিন্যাসে পরামাত্রিক পরীক্ষা প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়। নমুনা চয়িত নিবেশনে বঙ্কিমতা থাকলে বিন্যাসটি সুষম নয় মনে করতে হবে। কাজেই ধারণা করা ভুল হবে না যে এই নমুনা এমন এবং সমগ্রক থেকে নেওয়া হয়েছে যার বিন্যাসও সুষম নয়। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের উদ্দেশ্যে নিবেশনের বঙ্কিমতা মান নির্ণয় করে বিন্যাসগুলির তুলনা করা যেতে পারে।

তীক্ষ্ণতা (Kurtosis) ঃ

তীক্ষ্ণতা গণসংখ্যার আকৃতি সম্পর্কীয়। তীক্ষ্ণতা একটি নিবেশনের লেখচিত্রের শীর্ষের তীক্ষ্ণতা বা আনুভূমিক অক্ষের দিকে রেখাটির অবতলতার (Concavity) পরিমাণ বুঝায়। দুইটি নিবেশনে গড়, বিস্তৃতি ও বঙ্কিমতার ক্ষেত্রে অনুরূপ হলেও তাদের শীর্ষের তীক্ষ্ণতা পৃথক হতে পারে। এ জন্য কোন নিবেশনের আকৃতিগত সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে তীক্ষ্ণতার পরিমাপ প্রয়োজন। নিবেশনের কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর গণসংখ্যা সন্নিবেশিত হলে বিন্যাসটির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং সুষম নিবেশনের লেখচিত্রের সাথে এইরূপ লেখচিত্র তুলনা করা চলে। এই ক্ষেত্রে, পরিমিত রেখাকে মাধ্যম তীক্ষ্ণ (Mesokurtic) বলে। অর্থাৎ, এখানে শীর্ষদেশের তীক্ষ্ণতা হলো মাঝামাঝি পর্যায়ের। লেখচিত্রের শীর্ষদেশ অনতি উচু ও বিস্তৃত হলে রেখাটিকে অবতীক্ষ্ণ (Platykurtic) বলা হবে। অপর দিকে লেখচিত্রের শীর্ষদেশ অতি সুঁচালো ও উঁচু হলে একে অতি তীক্ষ্ণ (Leptokutic) বলা হবে। নিবেশনের তীক্ষ্ণতা KS পরিমাপের সাধারণ প্রকাশ নীচের সূত্র দ্বারা সম্ভবঃ

$$KS = \frac{\sum (X - \bar{x})^4}{n\delta^4}$$

যেখানে, KS=তীক্ষ্ণতা; $(X - \bar{x})^4$ = গড় থেকে সংখ্যামানের ব্যবধানের আরোপিত চতুর্থ শক্তি;

δ = পরিমিত ব্যবধান; এবং n = মোট তথ্য সংখ্যা।

$ks = \frac{২২৯.৮৭২০}{১০ \times ১.৮^৪} - \frac{২২৯.৮৭২০}{১০ \times ১০.৪৯৭৬} = \frac{২২৯.৮৭২০}{১০৪.৯৭৬} = ২.১৯০$ ।

এই সূত্রটি সারনী ৪.৩.১ এর উদাহরণে প্রয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তীক্ষ্ণতা মান পাওয়া গেছে ২.১৯০। আলোচ্য সূত্রানুযায়ী একটি সুষম নিবেশনের তীক্ষ্ণতা মান হবে ৩.০ (মধ্যমতীক্ষ্ণ)। অতি তীক্ষ্ণ নিবেশনের ক্ষেত্রে এই মান ৩.০-এর বেশি হবে এবং অপরদিকে অবতীক্ষ্ণ নিবেশনে মানটি ৩.০-এর কম হবে। আলোচ্য উদাহরণে নিবেশনটি অবতীক্ষ্ণ (২.১৯০) আকৃতি সম্পন্ন।

তীক্ষ্ণতা পরিমাপ সাধারণত: স্থানিক বিশ্লেষণে ব্যবহার হয় না। পদ্ধতিটির ব্যবহার অন্যান্য বিজ্ঞানেও বহুল প্রচলিত নয়। কিন্তু বঙ্কিমতা পরিমাপের মতই তীক্ষ্ণতা তথ্যসারির বিন্যাসের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল্যবান ধারণা প্রদান করে থাকে। তবে পরিমাপটির ব্যাখ্যা নির্ণিত গড় ও পরিমিত মানের আলোকে করা সুবিধাজনক।

পাঠ সংক্ষেপঃ

কোন নিবেশনের চরিত্র ভালভাবে জানার জন্য আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন। এই গুলি হলো: (ক) বঙ্কিমতা এবং (খ) তীক্ষ্ণতা। গণসংখ্যা নিবেশন হতে তৈরী সুষম রেখার বিভিন্ন রুপকে বঙ্কিমতা বলে। বঙ্কিমতা নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে- $SK = \frac{\sum\left(X-\bar{x}\right)^{3}}{n\delta^{3}}$ *। তীক্ষ্ণতা একটি নিবেশনের লেখচিত্রের শীর্ষের তীক্ষ্ণতা বা আনুভূমিক অক্ষের দিকে রেখাটির অবতলতার পরিমাণ বুঝায়। নিবেশনের তীক্ষ্ণতা পরিমাপের সাধারণ সূত্র সূত্র হচ্ছে-* $KS = \frac{\sum(X-\bar{x})^{4}}{n\delta^{4}}$ *।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. একটি সুষম নিবেশনের গড় সংখ্যা মানের উভয় পাশে তথ্যগুলি .... সজ্জিত থাকে।

১.২. নিবেশনের অধিকাংশ তথ্যমান যখন গড়মানের চেয়ে নিচে হয় তখন বিন্যাসটি .... সম্পন্ন হবে।

১.৩. দুইটি নিবেশনে গড়, বিস্তৃতি ও বঙ্কিমতা অনুরূপ হলেও তাদের শীর্ষের তীক্ষ্ণতা .... হতে পারে।

১.৪. সূত্রানুযায়ী একটি সুষম নিবেশনের তীক্ষ্ণতা মান হবে ....।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. একটি অপ্রতিসম নিবেশনে যোজিত গড়, মধ্যমা ও চল এক হবে।

২.২. নমুনা চয়িত নিবেশনে বঙ্কিমতা থাকলে বিন্যাসটি সুষম মনে করতে হবে।

২.৩. পরিমিত রেখাকে মাধ্যম তীক্ষ্ণ বলে।

২.৪. তীক্ষ্ণতা পরিমাপ সাধারণত: স্থানিক বিশ্লেণে ব্যবহার হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. বঙ্কিমতা কি? কত প্রকার?

২. প্রকারভেদ সহ গণসংখ্যা নিবেশনের তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. নিচের বিন্যাসটির বঙ্কিমতা ও তীক্ষ্ণতা নির্ণয় করুন:
২, ২, ১, ৩, ৪, ৭, ৩, ২, ৪, ২।

উত্তরমালা ঃ ইউনিট-৪

পাঠ-৪.১

১.১. আন্তঃচতুর্থক, ১.২. গড়ের ১.৩. যোজিত গড়, ১.৪. বিচ্যুতি, ১.৫. যোজিত গড়।

২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. মি, ২.৫. মি।

পাঠ-৪.২

১.১. আপেক্ষিকভাবে ১.২. বিস্তৃতি পরিমাপ সমূহের, ১.৩. শতকরা হারে।

২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. মি।

পাঠ-৪.৩

১.১. প্রতিসমভাবে, ১.২. বামায়ত বঙ্কিম, ১.৩. পৃথক, ১.৪. ৩.০।

১.২. মি, ১.২. মি, ১.৩. স, ১.৪. স।

ইউনিট-৫

সম্পর্ক পরিমাপক

দুইসারি তথ্য অনেক সময় একে অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। ফলে একের মান পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্যের মান পরিবর্তন হয়। যেমন বৃষ্টিপাতের পরিমাণের সাথে নদীর পানির উচ্চতার একটি সম্পর্ক আছে। এই ইউনিটের দুটি পাঠে আপনারা পরস্পর নির্ভরশীল এই ধরনের উপাত্তের পরিমাপ ও প্রদর্শন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। এই পাঠ সমূহ হচ্ছে-

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হচ্ছে-

পাঠ-৫.১ *সহসংম্রবের পরিমাপক*

পাঠ-৫.২ *নির্ভরণ বিশ্লেষণ*

পাঠ-৫.১

সহসংস্রবের পরিমাপক

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- সহসংস্রব ও তার ধরন;
- প্রোডাক্ট মোমেন্ট সহসংস্রব;
- মানানুক্রমিক সহসংস্রব; এবং
- ফাই সহগ যুগ্ম পরিমাপ সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

যে কোন তথ্য অপর তথ্যদ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং এদের মধ্যে একটি সম্পর্ক লক্ষ্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ একটি চলকের পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধিদ্বারা অপর চলক অনুরূপ বা বিপরীতভাবে প্রভাবিত হতে পারে। কাজেই যখন একটি চলকের পরিবর্তন অপর চলকের একমুখী বা বিপরীতমূখী পরিবর্তন ঘটায় তখন চলকদ্বয়ের মধ্যে সহসম্পর্ক বা সহগমন প্রবণতা আছে বলা যায়। অতএব, দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে ধনাত্মক (Positive) বা ঋণাত্মক (Negative) সম্পর্কের প্রবণতাকে সহসংস্রব (Correlation) বলে। ধনাত্মক সহসংস্রবের ক্ষেত্রে দুইটি তথ্যসারির একটি চলকের বৃদ্ধি বা হ্রাসের সাথে অপর চলকটিতে বৃদ্ধি বা হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে যখন কোন চলকের হ্রাস বা বৃদ্ধির সাথে সাথে অপর চলকের বিপরীতভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে তখন সহসংস্রবটিকে ঋণাত্মক বলা হয়। কোন স্থানের দুই ধরনের সংগৃহিত তথ্য সারির মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক নিরূপণ করা যায়।

বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাক। বরেন্দ্র অঞ্চলে গবেষণারত একজন ভূবিদ লক্ষ্য করলেন যে, বৃষ্টিপাতের মাত্রাভেদে ভূমি আর্দ্রতার পার্থক্যকরণ ঘটেছে। অধিক আর্দ্রতাযুক্ত ভূমি, বৃষ্টিপাত মাত্রার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই এক্ষেত্রে ভূমি আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক পরীক্ষণের জন্য বরেন্দ্র অঞ্চলের একটি মানচিত্রের সাহায্যে অক্রম জরিপ অনুযায়ী ১০টি জরিপ বর্গ (Quadrat) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলো। প্রতি জরিপবর্গের অন্তর্গত বৃষ্টিপাত (ইঞ্চি) ও ভূমি আর্দ্রতা (%) পরিমাপ করা হলো।

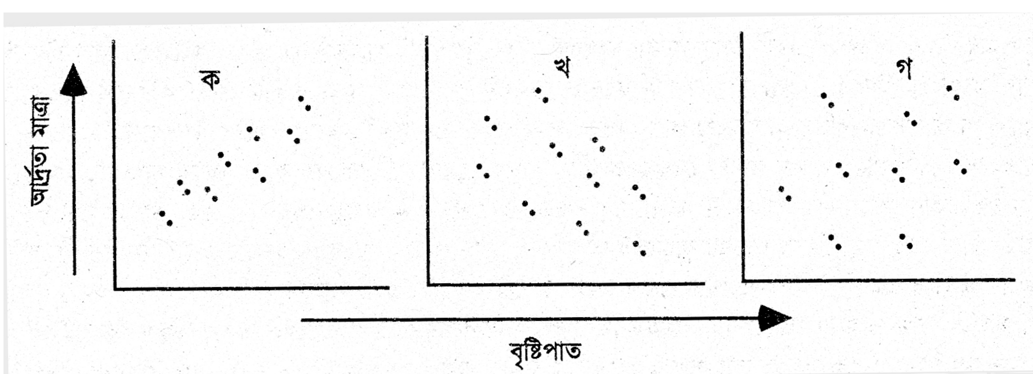

চিত্র : ৫.১.১ : বৃষ্টিপাত এবং ভূমি আর্দ্রতা বিভিন্ন সম্পর্ক

সংগৃহিত তথ্য বিক্ষেপ চিত্রের (Scatter Diagram/Scattergram) সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। তত্ত্বীয়ভাবে এই বিক্ষেপ চিত্র কয়েকটি সম্ভাব্য রূপের একটির অনুরূপ হতে পারে (চিত্র ৫.১.১)। চিত্র ৫.১.১ ক-এ বিক্ষেপ চিত্রের এমন অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে যেখানে বৃষ্টিপাত ও ভূমি আর্দ্রতার মধ্যে একটি সরাসরি এবং ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির সাথে আর্দ্রতা প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিত্র ৫.১.১ খ বিক্ষেপ চিত্রের ক্ষেত্রে উপাত্ত দুটির সরাসরি ঋণাত্মক সম্পর্ক

প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির সাথে সাথে আর্দ্রতা প্রবণতা কমে যাচ্ছে। অপরদিকে, ৫.১.১ গ-এর ক্ষেত্রে এমন অবস্থা প্রকাশ হয়েছে যেখানে উপাত্তদ্বয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

চিত্র ৫.১.১ ক-তে বর্ণিত উপাত্তদ্বয়ের সম্পর্ক বেশ দৃঢ় এবং এরদ্বারা বৃষ্টিপাত মাত্রা অনুযায়ী আর্দ্রতা হার মোটামুটি অনুমান করা যায় এবং একইভাবে বৃষ্টিপাত মাত্রা অনুযায়ী ভূমির আর্দ্রতাও মোটামুটি নির্দেশ করা যাবে। চিত্রটির বিক্ষেপ বিন্দুগুলি সামগ্রিকভাবে একটি সরলরেখা অনুসরণ করেছে। এই ধরণের সম্পর্ক চিত্র ৫.১.১ খ-তে খুবই দুর্বলভাবে প্রকাশমান এবং তা প্রকৃতপক্ষে আবার ঋণাত্মকমুখী। এক্ষেত্রে আর্দ্রতা বা বৃষ্টিপাত অনুযায়ী যথাক্রমে বৃষ্টিপাত বা ভূমি আর্দ্রতা অনুমান করা খুব নির্ভরযোগ্য হবে না।

এই পাঠে প্রধাণত: দুইটি পদ্ধতিদ্বারা দুইটি চলকের মধ্যে সরাসরি সম্পর্কের মাত্রা ও গতির পরিসংখ্যানগত পরিমাপ আলোচনা করা হয়েছে। এই ধরনের সম্পর্ক নির্ণয়ের নাম হচ্ছে সহসংস্রব সহগ (Correlation Coefficient)। এখানে আলোচ্য উভয় সহসংস্রব পরিমাপের এই সহগ 'r' এর মান -১.০ থেকে + ১.০ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। সংক্ষেপে এই সহগ 'r' চিহ্নদ্বারা নির্দেশিত হয়। 'r' এর -১.০ মানদ্বারা উপাত্তদ্বয়ের পরিপূর্ণ বিপরীত বা ঋণাত্মক সম্পর্ক নির্দেশ করে। 'r' -এর +১.০ মান অপর দিকে উপাত্তদ্বয়ের মধ্যে সরাসরি ধনাত্মক সম্পর্ক নির্দেশ করে। কোন উপাত্তদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্কহীনতা ০.০ বা কাছাকাছি 'r'Øviv প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ সহগটির ভিন্নতার গুরুত্ব নিম্নরূপ হতে পারেঃ

+১.০ পূর্ণ ধনাত্মক সহসংস্রব।
+০.৯ গুরুত্বপূর্ণ ধনাত্মক সহসংস্রব।
+০.৫ আংশিক ধনাত্মক সহসংস্রব।
+০.২ নিম্ন ধনাত্মক সহসংস্রব।
০.০ সহসংস্রব শুন্যতা।
-০.২ নিম্ন ঋণাত্মক সহসংস্রব।
-০.৫ আংশিক ঋণাত্মক সহসংস্রব।
-০.৯ গুরুত্বপূর্ণ ঋণাত্মক সহসংস্রব।
-১.০ পূর্ণ ঋণাত্মক সহসংস্রব।

সহসংস্রবের কেবল ব্যাখ্যামূলক ব্যবহার ছাড়াও এই সহগদ্বারা দুইটি চলকের মধ্যে সম্পর্কের যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব। অর্থাৎ তথ্য সারিদ্বয় যদি জরিপনির্ভর হয় তবে এই তথ্যের সাথে প্রকৃত তথ্যের (সমগ্রকের) প্রতিনিধিত্বতার সম্ভাবনা পরিমাপ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, দু'টি তথ্য সারির চলকের মধ্যে সহসংস্রব পরিলক্ষিত হলে এমন মনে করা ঠিক হবে না যে, এদের মধ্যে কার্যকরণ (Causal) সম্পর্ক রয়েছে। কার্যকরণ সম্পর্কদ্বারা একটি চলকের সাথে অপর চলকের বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক পরিবর্তন নির্দেশ করে। কিন্তু সহসংস্রব কেবল দুইটি চলকের মধ্যে সহগমনের (Covary) এবং এদের মধ্যে সম্পর্কের মাত্রা সম্বন্ধে ধারণা দেয় মাত্র এবং এরদ্বারা এই পরিবর্তনের কারণ কোন মতে নির্দেশ করে না। উদাহরণস্বরূপ, কোন জনগোষ্ঠির সহস্যদের মধ্যে যদি উচ্চতা ও ওজনের মধ্যে সহসংস্রব +০.৮০ পাওয়া যায় তবে এমন মনে করার কারণ নেই যে, কেবল উচ্চতা বাড়লেই সদস্যদের ওজনও বৃদ্ধি পাবে। কেননা, ওজন সমন্ধীয় বিষয়টি পুষ্টি, খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস-এমনকি আবহাওয়াগত কারণদ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হতে পারে। অতএব, কেবল সহসংস্রব পরিমাপ কার্যকরণ সম্পর্ক ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়। কার্যকরণ সম্পর্ক নিরূপণের জন্য পরিসংখ্যানগত পরিমাপের বাইরে অন্যান্য তথ্যমালা ও বিষয়বস্তু থেকে কারণ সূত্র সংগ্রহ প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ সহসংস্রব সহগ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনামুক্ত হওয়ার জন্য এর বিশ্লেষণে যথেষ্ট সতর্কতা এবং নৈপূণ্যের দরকার। এক্ষেত্রে একাধিক কারণ অনুসন্ধানও প্রয়োজন। এই প্রতিক্রিয়ায় সহংস্রব বিশ্লেষণে একটি যুক্তিগত ভিত্তি প্রস্তুত হতে পারে।

সহসংস্রব নির্ণয়ের দুইটি প্রধান পরিমাপ হচ্ছে:

ক) পিয়ারসন-এর প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব; এবং

খ) স্পিয়ারম্যান-এর মানানুক্রমিক সহসংস্রব।

ক) পিয়ারসন-এর প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব সহগ ঃ

দুইটি তথ্য সারির চলকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের একটি বহুল ব্যবহৃত পরামাত্রিক পরিমাপ পদ্ধতি। এক্ষেত্রে উপাত্তদ্বয়কে ব্যাপ্তিমাত্রিক হতে হবে এবং পদ্ধতিটির ক্ষেত্রে চলকসমূহ পরিমিত বিস্তারের বৈশিষ্ট্যধারী মনে করা হয়ে থাকে। সচরাচর এ ধরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে। এবং সহসংস্রব বলতে প্রধাণত: এই পদ্ধতিকেই নির্দেশ করে। তবে পরিমিত বিস্তার পূর্ণ চলক না হলে অপরামাত্রিক বিকল্প হিসেবে স্পিয়ারম্যান মানানুক্রমিক (Rank) সহসংস্রব পদ্ধতি ব্যবহার করা অধিক যুক্তিসঙ্গত (খ-দ্রষ্টব্য)।

উদাহরণ: সারনী ৫.১.১ এ পূর্বোল্লিখিত বাংলাদেশের বরেন্দ্র অঞ্চলের ১০টি জরিপ বর্গে গড় বৃষ্টিপাত (x) এবং ভূমি আর্দ্রতা (y) বিন্যাস দেখানো হয়েছে। এই দুইটি চলকের মধ্যে প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব নিম্নে বর্ণিত সূত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যাবে:

$$r = \frac{\frac{\sum xy}{n} - \bar{x}.\bar{y}}{S_x.S_y}$$

যেখানে, r = সহসংস্রব; x এবং y = দু'টি চলকের তথ্য, যথাক্রমে বৃষ্টিপাত এবং ভূমি আদ্রতা, $\bar{x}$ এবং $\bar{y}$ = দু'টি চলকের গড়; S_x এবং S_y = পরিমিত ব্যবধান (জরিপলদ্ধ দু'টি চলকের)। এ ক্ষেত্রে জরিপলব্দ S_x' এর পরিমিত ব্যবধান হবে

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2}$$

একইভাবে এর সংশ্লিষ্ট মানসমূহদ্বারা S_x নির্ণয় করা যাবে।

সারনী ৫.১.১ বরেন্দ্র অঞ্চলে বৃষ্টিপাতে (") ভূমি আর্দ্রতা (%) বিন্যাস।

জরিপ বর্গ	বৃষ্টিপাত(")x	ভূমি আর্দ্রতা (%) y	x^2	y^2	xy
ক	৪৭	২১	২২০৯	৪৪১	৯৮৭
খ	৩৫	১৮	১২২৫	৩২৪	৬৩০
গ	২৮	৯	৭৮৪	৮১	২৫২
ঘ	২৭	২৫	৭২৯	৬২৫	৬৭৫
ঙ	৪৪	২৭	১৯৩৬	৭২৯	১১৮৮
চ	৬৬	৩৮	৪৩৫৬	১৪৪৪	২৫০৮
ছ	৬০	৩৩	৩৬০০	১০৮৯	১৯৮০
জ	৭৫	৪৮	৫৬২৫	২৩০৪	৩৬০০
ঝ	৭৩	৪৯	৫৩২৯	২৪০১	৩৫৭৭
ঞ	৪৫	৩২	২০২৫	১০২৪	১৪৪০
	$\sum x$ = ৫০০	$\sum y$=৩০০	২৭৮১৮	১০৪৬২	১৬৮৩৭
	n = ১০	n =১০			
	$\bar{x}$ = ৫০	$\bar{y}$ =৩০	$\bar{x}^2$ = ২৫০০	$\bar{y}^2$ =৯০০	$\bar{x}.\bar{y}$ = ১৫০০

সারনী-৫.১.১ এর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সারিতে সহসংস্রব মান নির্ণয়ের নির্দিষ্ট অংশসমূহ নির্ণিত হয়েছে। এদের এবং x এবং y 'এর পরিমিত ব্যবধানের সাহায্যে এখন '৩' এর মান বের করা সম্ভবঃ

$$S_x = \sqrt{\frac{২৭৮১৮}{১০} - ২৫০০} = \sqrt{২৮১.৮০} = ১৬.৭৯$$

$$S_y = \sqrt{\frac{১০৪৬২}{১০}} -৯০০ = \sqrt{১৪৬.২০} = ১২.০৯$$

$$\frac{xy}{n} = \sqrt{\frac{১৬৮৩৭}{১০}} = ১৬৮৩.৭০$$

$$\bar{x}.\bar{y} = ১৫০০$$

$$r = \frac{১৬৮৩.৭০ - ১৫০০}{১৬.৭৯ \times ১২.০৯} = \frac{১৮৩.৭০}{২০২.৯৯} = ০.৯০৫ \text{ ।}$$

সহসংস্রবের মান (r) অর্থাৎ ০.৯০৫ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানটি ধণাত্মক এবং গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই মনে করা যেতে পারে যে, তথ্য সারিতে বর্ণিত বরেন্দ্র অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ও ভূমি আর্দ্রতার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব পরিমাপের কয়েকটি বিকল্প সূত্র রয়েছে। প্রচলিত পরিসংখ্যান পুস্তকসমূহের এই ধরনের সূত্রসমূহ দেখা যেতে পারে।

প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব মান দুইটি চলকের মধ্যে রৈখিক সম্পর্ক পরিমাপ করে এবং এই সম্পর্কের দৃঢ়তা এবং গতি নির্দেশ করে কিন্তু কোনভাবে সম্পর্কটির আকারের (Form) ভিন্নতা নির্দেশ করে না। এক্ষেত্রে আকারটি কেবল রৈখিক হয়ে থাকে। এ কারণে সহসংস্রব মান পরিমাপ বা নির্ণয়ের পূর্বে চলকদ্বয়ের বিক্ষেপ চিত্র একে বিস্তরণ বিন্যাস সাবধানতার সাথে লক্ষ্য করা উচিত। যদি বিক্ষেপ বিন্দুর বিস্তরণ বিন্যাস রৈখিক না হয় তখন প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব মান নির্ণয় পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে চলকের সম্পর্ক নির্ণয়ে অরৈখিক পদ্ধতি ব্যবহার করা শ্রেয় ।

খ) স্পিয়ারম্যান-এর মানানুক্রমিক সহসংস্রব ঃ

স্পিয়ারম্যান-এর মানানুক্রমিক সহসংস্রব দু'টি ক্রমবোধক তথ্যসারির অপরামাত্রিক সম্পর্ক পরিমাপ পদ্ধতি। সমাজ বিজ্ঞানীগণ এই পদ্ধতিকে প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব পরিমাপের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন, কেননা এক্ষেত্রে তথ্যসারির সুষম নিবেশন বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্পিয়ারম্যান-এর মানানুক্রমিক সহসংস্রব সহগটি RsØviv চিহ্নিত হয়েছে।

উদাহরণ: উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতকোত্তর স্নাতক ২য় পর্ব ও স্নাতক ১ম পর্বের চারজন ছাত্রকে বাংলাদেশের মধ্যে ১০টি শহরকে চাকুরী গ্রহণের লক্ষ্যস্থল হিসেবে পছন্দের মানানুক্রম অনুযায়ী নির্দেশ করতে বলা হলো। সবচেয়ে পছন্দসই শহরকে ১ এবং সবচেয়ে কম পছন্দনীয় শহরকে ১০ দ্বারা মান আরোপিত করা হয়েছে। সারনী ৫.১.২-এ চারজন ছাত্রের উত্তর সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সারনী ৫.১.২ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শ্রেণীর শিক্ষার্থীর চাকুরী গ্রহণের পছন্দনীয় শহরের ক্রম।

উত্তরের মানানুক্রম					স্নাতকোত্তর	স্নাতক-৩
শহর	স্নাতকোত্তর	স্নাতক-৩	স্নাতক-২	স্নাতক-১	d	d^2
ভোলা	১০	১০	১	৬	০	০
চাঁদপুর	৭	৮	৪	১০	-১	১
ঢাকা	১	২	৮	২.৫	-১	১
যশোর	৫	৫	৭	৪	০	০
চট্টগ্রাম	২	১	৯	১	১	১
ঠাকুরগাঁও	৯	৪	৩	৭	৫	২৫
রাজশাহী	৪	৬	৫	৮	-২	৪
সিলেট	৮	৯	২	৫	-১	১
কুমিল্লা	৬	৭	৬	৯	-১	১
খুলনা	৩	৩	১০	২.৫	০	০

মানানুক্রমিক সহসংস্রব (r_s) দু'টি চলকের মানানুক্রমিকের মধ্যে সহসংস্রব বা মাত্রা নির্ণয় করে। এই মাত্রার সূত্র হলোঃ

$$r_s = \frac{6\sum d^2}{n^3 - n}$$

যেখানে r_s = স্পিয়ারম্যান-এর মানানুক্রমিক সহসংস্রব মান, d প্রতিটি x উপাত্তের মানের মধ্যে উপস্থিত পার্থক্য, ∑d2 = d সমূহের যোগফলকে বর্গ অঙ্কে পরিবর্তন করা হয়েছে, এবং 6 = ধ্রুবক এবং n = মানানুক্রমিক জোড়ার মোট সংখ্যা।

সারণী ৫.১.২. এ প্রথম দুই কলামের তথ্য সারির (স্নাতকোত্তর ও স্নাতক-৩) d, d^2 এবং $\sum d^2$ দেখানো হয়েছে।

এখন এই দুই তথ্য সারির মধ্যে মানানুক্রমিক সহসংস্রব নির্ণয় করা সম্ভব:

$$r_s = ১- \frac{৬৩৪}{১০^৩-১০} = ১- \frac{২০৪}{৯৯০} =১-০.২০৬ = ০.৭৯৪$$

প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব মানের মতই স্পিয়ারম্যান-এর মানানুক্রমিক সহসংস্রব মানের মাত্রা দুইটি চলকের মধ্যে -১.০ বা পূর্ণ ঋণাত্মক সম্পর্ক থেকে +১.০ বা পূর্ণ ধনাত্মক সম্পর্ক নির্দেশ করে থাকে। দুইটি চলকের মধ্যে ০.০ মান সংস্রবহীনতা বা সম্পর্কহীনতা নির্দেশ করে। আলোচ্য উদাহরণে লক্ষ্যণীয় যেস্নাতকোত্তর ওস্নাতক-৩ ছাত্রদ্বয়ের চাকুরী গ্রহণ সংক্রান্ত পছন্দনীয় শহরের নির্ধারিত মানের মধ্যে উচ্চ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

গ) স্থানিক সহসংস্রব পরিমাপের অন্যান্য পদ্ধতি ঃ

স্থানিক বিশ্লেষণে একটি অঞ্চলের একাধিক উপাত্তের সম্পর্কের এলাকা ভিত্তিক পার্থক্যকরণ দেখানোর জন্য বেশ কিছু স্বল্প পরিচিত পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে ϕ (ফাই) সহগ যুগ্ম পরিমাপ এখানে আলোচনা করা হলো।

ϕ (ফাই) সহগ যুগ্ম পরিমাপ ঃ

যুগ্ম পরিমাপের ক্ষেত্রে উপাত্তকে হ্যাঁ/না, উপস্থিত/অনুপস্থিত, ১ বা ০ ধরনে ফেলা হয়। কোন স্থানের প্রশ্নমালা জরিপের ক্ষেত্রে এই ধরনের উত্তর সচরাচর পাওয়া যায়। উত্তরগুলি সাধারণভাবে দ্বি-ভাজিত (Dichotomized) বা দুইভাগে ভাগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন স্থানের জলবায়ুকে আর্দ্র বা শুষ্ক হিসেবে ভাগ করা যাবে। একটি জনমিতিক (Demographic) জরিপে সন্তান সম্ভবা মহিলাদের ১ এবং সন্তান সম্ভবা নয় এমন মহিলাদেরকে ০দ্বারা দুইভাগে ভাগ করা যাবে। এই ধরনের পরিমাপ সবচেয়ে সহজ এবং সঠিক। অনেক জরিপে প্রাপ্ত উত্তরের একমাত্র ধরন এমনই হতে পারে। একাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানের যুগ্ম উত্তরের ক্ষেত্রে একটি সহজতম স্থানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি হচ্ছে ϕ -সহগ যুগ্ম পরিমাপ।

এই পদ্ধতি একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যাবে। মনে করি, সাভারের বংশী নদীর প্লাবন ভূমি সন্নিহিত একটি গ্রামে সাধারণ এবং উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধান চাষের জমি খন্ডগুলি অক্রম জরিপ করে মানচিত্রে চিহ্নিত করা হলো (চিত্র ৫.১.৪)। মানচিত্রায়ণকালে লক্ষ্য করা গেল যে, উফশী ধান চাষের প্রবণতা প্লাবণভূমির সাথে সম্পর্কীয় নাও হতে পারে। এখানে অনুসন্ধান বা সমীক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে 'এই দুই ধরনের ধান চাষ প্লাবনভূমির অবস্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা'। বিষয়টি সমীক্ষার প্রকল্পন হিসেবেও কাজ করতে পারে। এখানে দুই ধরণের দ্বিভাজিক উপাত্ত রয়েছে - দুই ধরনের ধান চাষ এবং দুই ধরনের ভূমিরূপ এবং প্রকল্পটি এদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক এবং সম্পর্কের মাত্রা নির্ণয়ের সাথে জড়িত। এজন্য মানচিত্রের জরিপলব্ধ তথ্যটি দুই-দুই সংযোগ সারণীতে রূপান্তরিত করতে হবে (সারণী ৫.১.৩)। ১০০টি জরিপ জমি খন্ড এই সারণীর চার অংশের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে। সারণীটি খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, উফশী ধান চাষের সাথে প্লাবন ভুমির হয়তোবা সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু আরও সঠিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক এই সম্পর্ক নির্ণয় করতে হলে প্রতি অংশের জমি খন্ড সংখ্যা যোগ করে নীচের সূত্রানুযায়ী ϕ-সহগ নির্ণয় করতে হবেঃ

$$\phi = \frac{a.d - b.c}{\sqrt{A.B.C.D}}$$

সারনী ৫.১.৩ বংশী নদীর অববাহিকায় দুই প্রকার ধান চাষের প্রবণতা

	প্লাবন ভূমি		অপ্লাবন ভূমি		
উফশী ধান	a	৩৬	b	১৮	৫৪ C
সাধারণ ধান	c	১২	d	৩৪	৪৬ D
		৪৮ A		৫২ B	১০০

যখন, a.b.c ও d = চারটি শ্রেণী অনুযায়ী জরিপ অংশের মান; এবং ABCD=চারটি শ্রেণীর জরিপ অংশের মানের সমষ্টি (সমীকরণের এই অংশে বর্গমূল ব্যবহার করা হয়)।
ϕ-সহগের মান সহসংস্রব সহগের মতই -১ থেকে +১'এর মধ্যে হবে এবং সহসংস্রবের মতোই ব্যাখ্যা করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উপরোক্ত সূত্রানুযায়ী ϕ–সহগ হবে ঃ

$$\phi = \frac{৩৬\times৩৪-১৮\times১২}{\sqrt{৪৮\times৫২\times৫৪\times৪৬}} = \frac{১২২৪-২১৬}{২৪৯০} = \frac{১০০৮}{২৪৯০} = ০.৪০ \text{ ।}$$

যদি উফশী ধান চাষ এবং প্লাবণ ভূমির মধ্যে সম্পর্ক প্রকৃতই থাকতো তখন সমগ্র নমুনাসমূহ দুই-দুই সারণীর a ও d ঘরে অথবা b ও c তে হতো। ফলে, হর ও লব সমান হতো এবং ϕ সহগ -১ বা +১ হতো। অপর পক্ষে, যদি নমুনাসমূহ সমানভাবে a.b.c ও d এর মধ্যে বিভক্ত থাকতো তখন (a.d-b.c) শুন্য (০) হতো এবং ϕ–সহগও শূন্য (০) হতো।
আলোচ্য উদাহরণে ϕ–সহগ ০.৪০ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ উফশী ধান চাষ এবং প্লাবনভুমির মধ্যে মোটামুটি একটা সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তবে এই সম্পর্কের মাত্রা খুব উচ্চ নয়। এই মানের যথার্থতা মাত্রা প্রচলিত নিয়মে নির্ণয় সম্ভব। এ ধরনের ক্ষেত্রে সম্পর্কের কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন এবং তা অনেকটা বাড়তি অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

পাঠ সংক্ষেপঃ

যখন একটি চলকের পরিবর্তন অপর চলকের একমুখী বা বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটায় তখন চলকদ্বয়ের মধ্যে সহসম্পর্ক বা সহগমন প্রবণতা আছে বলা যায়। এই ধরনের সম্পর্ক নির্ণয়ের নাম হচ্ছে সহসংস্রব সহগ। সংক্ষেপে এই সহগ 'r' চিহ্নদ্বারা নির্দেশিত হয়। সহসংস্রব নির্ণয়ের দুইটি প্রধান পরিমাপ হচ্ছে: (ক) পিয়ারসন-এর প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব এবং (খ) স্পিয়ারম্যান-এর মানানুক্রমিক সহসংস্রব। একাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানের যুগ্ম উত্তরের ক্ষেত্রে একটি সহজতম স্থানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি হচ্ছে ϕ -সহগ যুগ্ম পরিমাপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. ধনাত্মক সহসংস্রবের ক্ষেত্রে দুইটি তথ্য সারির একটি চলকের বৃদ্ধি বা হ্রাসের সাথে অপর চলকটিতে .... বা .... লক্ষ্য করা যায়।

১.২. সহসংস্রব পরিমাপের এই সহগ 'r' এর মান .... থেকে .... পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

১.৩. প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব .... বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণত: ব্যবহার হয়ে থাকে।

১.৪. প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব মান দুইটি চলকের মধ্যে .... পরিমাপ করে।

১.৫. দুইটি চলকের মধ্যে .... মান সংস্রবহীনতা বা সম্পর্কহীনতা নির্দেশ করে।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. 'r' -এর +১.০ মান উপাত্তদ্বয়ের মধ্যে সরাসরি ঋণাত্মক সম্পর্ক নির্দেশ করে।

২.২. তথ্য সারিদ্বয় যদি জরিপনির্ভর হয় তবে এই তথ্যের সাথে প্রকৃত তথ্যের (সমগ্রকের) প্রতিনিধিত্বতার সম্ভাবনা পরিমাপ করা যায়।

২.৩. প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব পরিমাপের কোন বিকল্প সূত্র নেই।

২.৪. যদি বিক্ষেপ বিন্দুর বিস্তরণ বিন্যাস রৈখিক না হয় তখন প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব মান নির্ণয় পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

২.৫. স্পিয়ারম্যান-এর মানানুক্রমিক সহসংস্রব দু'টি ক্রমবোধক তথ্য সারির অপরামাত্রিক সম্পর্ক পরিমাপ পদ্ধতি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. তথ্যের সহসংস্রব কাকে বলে? ব্যাখ্যা করুন।

২. প্রডাক্ট-মোমেন্ট ও স্পিয়ারম্যান মানানুক্রমিক সহসংস্রবের মধ্যে তুলনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. নিচের তথ্যসারি ব্যবহার করে প্রডাক্ট-মোমেন্ট সহসংস্রব সহগের মান নির্ণয় করুন:

স্থান	উচ্চতা (১০০০ মিটার) (x)	বৃষ্টিপাত (মি.মি) (y)
ক	৬.১	৯.৫
খ	১৫.৫	৭.৭১
গ	২৩.৫	১২.২৯
ঘ	২১.০	৯.২১
ঙ	৩.৭	৬.৩০
চ	০.৯	৭.২০
ছ	০.২	৭.৮৬
জ	১৬.৭	১৩.০৭
ঝ	০.২	৭.৭১
ঞ	১.০	৮.০৯

২. সারনী ৫.১.২ এরস্নাতক-২ ওস্নাতক-১ শিক্ষার্থীর চাকুরী গ্রহণের পছন্দনীয় শহরের ক্রমের মধ্যে স্পিয়ারম্যান'এর মানানুক্রমিক সহসংস্রব নির্ণয় করুন।

পাঠ-৫.২

নির্ভরণ বিশ্লেষণ

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- নির্ভরণ বিশ্লেষণ;
- সম্পূর্ন ও অসম্পূর্ন সম্পর্ক;
- রৈখিক ও অরৈখিক সম্পর্ক; এবং
- সাধারণ রৈখিক নির্ভরণ এবং তার নির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পাঠ-৫.১ এ দুইটি চলকের মধ্যে সম্পর্কের মাত্রা বা দৃঢ়তা ও গতি পরিমাপ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য পাঠে এই সম্পর্কের আকার, অর্থাৎ একটি চলকের অপর উপর চলকের উপর নির্ভরতা পরিমাপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। এ ধরণের পরিমাপ পদ্ধতির সাহায্যে চলকের গতিধারা অনুমান করা যায়।

চিত্র ৫.২.১ লেখচিত্রে ফারেনহাইট ও সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। কেবল দু'টি বিন্দু লেখচিত্রে দেখানো হয়েছে - একটি স্ফুটানাঙ্ক (২২১° ফা: বা ১০০° সে:) এবং অপরটি হিমাঙ্ক (৩২° ফারেনহাইট বা ০° সেন্টিগ্রেড)। যেহেতু ধনাত্মক সহগামী ও পূর্ণসংস্রব বিক্ষেপ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে রয়েছে, সেহেতু তাপমাত্রা পরিমাপের অপরাপর বিক্ষেপ বিন্দুসমূহ এই দুই বিন্দু সংযোগকারী রেখা বরাবর বিন্যস্ত হবে।

উদাহরণস্বরূপ, ৩০° সে: ও ৮৬° ফারেনহাইট বিক্ষেপটি নির্দেশিত রেখার উপর বিন্যাস্ত হবে (চিত্র ৫.২.১)।

এই রৈখিক সম্পর্কটি নিচের সূত্রদ্বারা প্রকাশ করা যায়:

y= ৩২+১.৮x

যেখানে, y = ফারেনহাইট ডিগ্রী সম্পন্ন মান, x= সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী সম্পন্নমান ১.৮ নির্ধারিত মান। এ সূত্রে তাপমাত্রার সেন্টিগ্রেডের মান ব্যবহার করে তুলনীয় ফারেনহাইট মান হবে ঃ

যদি, x=১০০ হয়; তবে y= ৩২+১.৮×১০০ = ৩২+১৮০=২১২° ফাঃ।

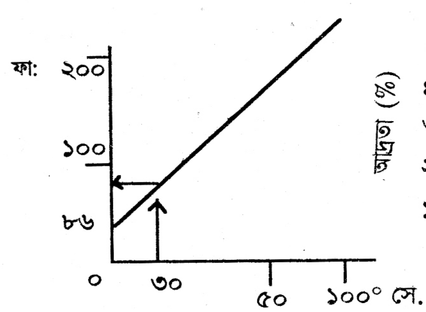

চিত্র ৫.২.১। ফারেনহাইট ও সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক

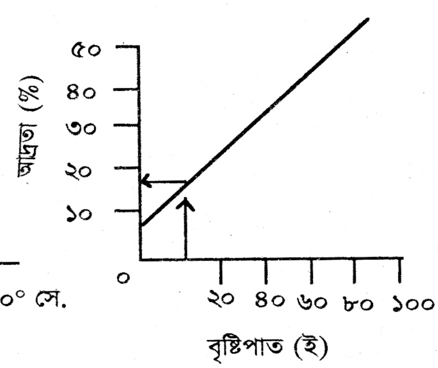

চিত্র ৫.২.২। বৃষ্টিপাত মাত্রা ও ভূমি আর্দ্রতা হারের সাথে সম্পর্ক।

এই ধরনের সূত্র সহজে ব্যবহারযোগ্য ও লেখচিত্রের সাহায্যে তুলনীয় মান নির্ণয়ের চেয়ে সঠিক। এই অধ্যায়ে ব্যবহৃত এই ধরনের পদ্ধতিসমূহ দুইটি চলকের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃত আকার ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে এবং সূত্রগত ভিত্তি প্রদান করে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে দুই ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হতে পারে ঃ

১. অনেক চলকের মধ্যে সম্পর্কটি সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ নাও হতে পারে; এবং

২. অনেক চলকের মধ্যে সম্পর্কটি রৈখিক নয়।

অসম্পূর্ণ সম্পর্কঃ পাঠ-৫.১ এ বর্ণিত সারনী ৫.১.১ অনুসারে বাংলাদেশের বরেন্দ্র বৃষ্টিপাত ও ভূমি আর্দ্রতার মধ্যে সম্পর্কে দেখানো হয়েছে। বাহ্যতঃ এই সম্পর্কের বিক্ষেপবিন্দুর মধ্যে পরিপূর্ণ সংস্রব নির্দেশক সকল বিন্দু সংযোগকারী একটি সরলরেখা টানা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে এমন একটি সরলরেখা টানা যায় যারদ্বারা সর্বোচ্চ সংখ্যক বিন্দুকে সংযোগ করে বা কাছাকাছি অবস্থান করে। এই রেখাকে সর্বোত্তম প্রয়োগযোগ্য (Best Fit) সরল রেখা বলা হয়।

বেশ কয়েকটি বিকল্প সর্বোত্তম প্রয়োগযোগ্য সরলরেখা হতে পারে। যেমন, সরলরেখা থেকে সমকৌণিক (Orthogonal) দূরত্ব সবচেয়ে কম ধরে, হ্রাসকৃত অক্ষীয় দূরত্ব হিসেবে টেনে যেখানে বিন্দু ও রেখা সন্নিহিত ত্রিভূজসমূহের আয়তন ন্যূনতম, বিন্দুসমূহ ও রেখার উল্লম্ব অক্ষের সামগ্রীক দূরত্ব ন্যূনতম দেখিয়ে এবং উল্লম্ব অক্ষ অনুযায়ী বিন্দুসমূহ ও রেখার সামগ্রিক ণ্যূনতম বর্গকে গুরুত্ব দিয়ে। এই পদ্ধতিতে সর্বোত্তম প্রয়োগযোগ্য অঙ্কিত রেখাকে ন্যূনতম বর্গ (Least Square) রেখা বলা হয় এবং সর্বোত্তম বর্গ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এ পদ্ধতি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, লেখচিত্রের বিভিন্ন বিন্দুর জন্য সর্বোত্তম প্রয়োগ রেখা অঙ্কনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এবং এর জন্য প্রাপ্ত রেখাসমূহের বিভিন্ন সূত্র রয়েছে। এই সমস্ত পদ্ধতির পার্থক্যের কারণে গৃহীত ধারণা ও পার্থক্য হতে পারে।

অরৈখিক সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চলকের মধ্যে উপস্থিত সম্পর্ক রৈখিক নাও হতে পারে। চিত্র ৫.২.৩' এ দু'টি চলকের মধ্যে একটি সাধারণ ধরনের অরৈখিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এখানে নমুনা জরিপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী ঢাকা শহরবাসীদের হাট-বাজার করার ধারা দেখানো হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, নগর কেন্দ্র থেকে প্রথম এক বা দুই কি.মি. দূরত্বের পর কেনা-কাটার ঘটন (Occurence) সংখ্যা সহসা কমে যায়। কিন্তু তারপর এই হ্রাসপ্রাপ্তির গতি মন্থর হয়ে পড়ে। আকারগতভাবে এই সম্পর্ক একটি বক্র রেখাদ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। চিত্র ৫.২.৪' এ আরেক প্রকার অরৈখিক সম্পর্কের উদাহরণ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে চলকের মধ্যে আবর্তনশীল পরিবর্তন বিদ্যমান এবং তথ্যের মধ্যে আবর্তণশীল বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। এদের মধ্যে অনেক সময় কালভিত্তিক এ ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ কোন স্থানের তাপমাত্রার কাল/সময় ভিত্তিক তারতম্য এ ধরনের লেখচিত্রের আকার ধারণ করতে পারে। একটি তথ্যসারির সময়/কাল ভিত্তিক পরিমাপকে কালীক সারি (Time Series) বিশ্লেষণ বলে। অর্থনৈতিক উপাত্ত ব্যাখ্যায় এ ধরণের বিশ্লেষণের বিশেষ পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি রয়েছে।

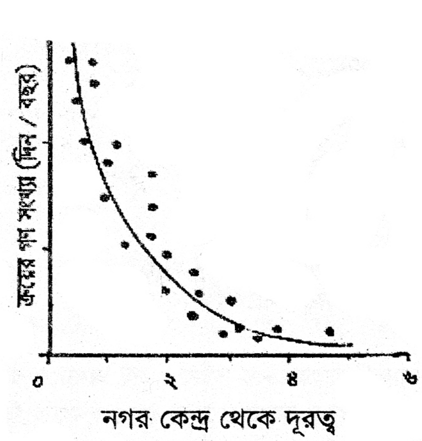

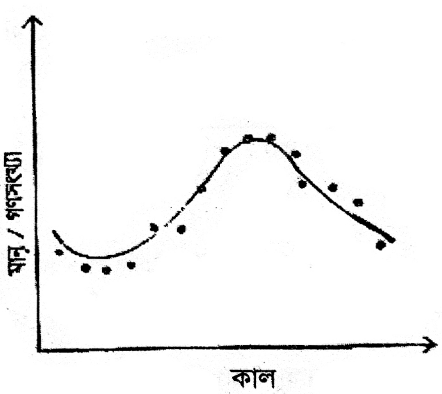

চিত্র ৫.২.৪ চলকদ্বয়ের আবর্তণশীল সম্পর্ক।

চিত্র: ৫.২.৩ ঢাকা শহরের অধিবাসীদের নগরকেন্দ্র থেকে দূরত্ব হিসেবে ক্রয়ের সম্পর্ক।

কোন উপাত্তের অরৈখিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ সূত্র ও পদ্ধতি রৈখিক সম্পর্ক ও সূত্র থেকে ভিন্নতর এবং জটিল। এই পাঠে কয়েকটি সহজতর পদ্ধতি কেবল আলোচনা করা হবে।

সাধারণ রৈখিক নির্ভরণ ঃ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে চলকের সম্পর্ক নির্দেশক রৈখিক লেখচিত্র অঙ্কনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে ন্যূনতম বর্গ পদ্ধতির কতকগুলি প্রায়োগিক সুবিধা রয়েছে। এটি অপেক্ষাকৃত সহজে তথ্য সারির জন্য প্রয়োগ করা যায় এবং এতে কিছু পরিসংখ্যানগত গুণাবলীও দৃশ্যমান। ন্যূনতম বর্গপদ্ধতিতে রৈখিক লেখচিত্র অঙ্কনের পরিমাপ ও পদ্ধতিকে সাধারণভাবে রৈখিক নির্ভরণ (Regression) বলা হয়। রৈখিক নির্ভরণ ভূমিতিক ও সামাজিক গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। অনেক সময় পদ্ধতিটির অপব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। কেননা পদ্ধতিটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে গৃহীত ধারণার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

নির্ভরণ বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হলো একটি বিশেষ পরিমাপ সূত্র, যেমন, সেন্টিগ্রেড থেকে ফারেনহাইট তাপমাত্রা নির্ধারণ করা। এই সূত্রটি নিম্নরূপ ধারণ করতে পারে:

$\hat{y} = a + bx$

যেখানে, $\hat{y}$ = অধীন চলকের নির্ভরাঙ্ক, x = স্বাধীন চলকের মান, a এবং b নির্ভরণ মান।

আদর্শ রৈখিক নির্ভরণ ক্ষেত্রে এবং স্বাধীন (Independent) চলকের প্রেক্ষিতে নির্ভরশীল বা অধীন (Dependent) চলকের মান কি হওয়া উচিৎ তা $\hat{y}$ Øviv পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কোনটি অধীন ও কোনটি স্বাধীন চলক সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

নির্ভরণ বিশ্লেষণে মূল ধারণা হচ্ছে নির্ভরশীল চলকের মানসমূহ স্বাধীন চলকের উপর নির্ভর করে বা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে একটি কার্য-করণ সম্পর্কের ধারণাও সৃষ্টি করে। এ অধ্যায়ে অধীন চলককে y এবং স্বাধীন চলককে xদ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। নির্ভরণ বিশ্লেষণে একটি প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে a এবং b এর মাত্রা নির্ণয়। এই মাত্রাদ্বয় যথাক্রমে নিচের সূত্রদ্বয়দ্বারা নির্ণিত হয়ঃ

$$b = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2 - n\bar{x}^2} \text{ , এবং } a = \bar{y} - b\bar{x}$$

যেখানে, x = স্বাধীন চলকের মান, y = অধীন চলকের মান, $\bar{x}$ ও $\bar{y}$ যথাক্রমে x ও y উপাত্তসারির গড়মান, এবং n = চলকের জোড়ের মোট সংখ্যা (বিক্ষেপ চিত্রের মোট বিন্দু সংখ্যা)। a ও b নির্ভরণ সহগ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বর্ণিত বরেন্দ্র অঞ্চলের আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উদাহরণটি ব্যবহার করে নির্ভরণ নির্ণয় করা যেতে পারে। এই উদাহরণে ভূমি আর্দ্রতাকে অধীন (y) এবং বৃষ্টিপাত মাত্রাকে স্বাধীন (x) ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য হচ্ছে যে, প্রতি জরিপ বর্গে বৃষ্টিপাতের মাত্রা অনুযায়ী ভূমি আর্দ্রতা সম্পর্ক নির্ণয় করা। এই সম্পর্ককে ভূমি আর্দ্রতার তারতম্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল বলা যাবে। এই অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বৃষ্টিপাত মাত্রাদ্বারা ভূমির আর্দ্রতা নিরূপণ করা যাবে।

এই উদাহরণে তথ্য সারিসহ উপরোক্ত সূত্রানুযায়ী সংশ্লিস্ট মান নির্ণয় পর্যায় সারণী ৫.২.১'-এ দেখানো হয়েছে। নির্ভরতা মানসমূহ নিম্নরূপ নির্ণয় করা হলোঃ

সারনী ৫.২.১। বরেন্দ্র অঞ্চলে বৃষ্টিপাত এবং ভূমি আর্দ্রতা সম্পর্কীয় নির্ভরণ বিশ্লেষণ।

জরিপ বর্গ	বৃষ্টিপাতের মাত্রা (x)	ভূমি আর্দ্রতা (y)	x^2	xy
ক	৪৭	২১	২২০৯	৯৮৭
খ	৩৫	১৮	১২২৫	৬৩০
গ	২৮	৯	৭৮৪	২৫২
ঘ	২৭	২৫	৭২৯	৬৭৫
ঙ	৪৪	২৭	১৯৩৬	১১৮৮
চ	৬৬	৩৮	৪৩৫৬	২৫০৮
ছ	৬০	৩৩	৩৬০০	১৯৮০
জ	৭৫	৪৮	৫৬২৫	৩৬০০
ঝ	৭৩	৪৯	৫৩২৯	৩৫৭৭
ঞ	৪৫	৩২	২০২৫	১৪৪০

$\Sigma x =$ ৫০০ $\Sigma y =$ ৩০০ $\Sigma x^2 =$ ২৭৮১৮ $\Sigma xy =$ ১৬৮৩৭

n = ১০ n = ১০

$\bar{x} =$ ৫০ $\bar{y} =$ ৩০

$$b = \frac{১৬৮৩৭ - (১০ \times ৫০ \times ৩০)}{২৭৮১৮ - (১০ \times ৫০^২)}$$

$$= \frac{১৬৮৩৭-১৫০০০}{২৭৮১৮-২৫০০০}$$

$$= \frac{১৮৩৭}{২৮১৮}$$

= ০.৬৫২।

a = ৩০-(০.৬৫২∞৫০)

= ৩০-৩২.৬

= - ২.৬।

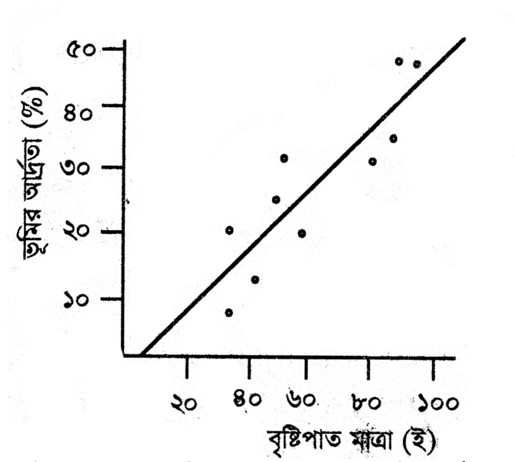

চিত্র: ৫.২.৫। বৃষ্টিপাত মাত্রার সাথে ভূমি আর্দ্রতার নির্ভরণ।

a ও b -এর মান অনুযায়ী $\hat{x}$ এর মান হবে: $\hat{y}$ = ২.৬+০.৬৫২.x।

এই সূত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট ভূমি আর্দ্রতায় (x) বৃষ্টিপাত সম্পর্ক নিরূপণ করা যাবে $\hat{y}$ । যেমন, যদি কোন নির্দিষ্ট জরিপ বর্গে আর্দ্রতা ৫০ হয় তবে অনুমতি বৃষ্টিপাত হবে:

$\hat{y}$ = ২.৬+(০.৬৫২∞২৫)= ১৩.৭ ।

কাজেই নূন্যতম বর্গ নির্ভরণ রেখা এমনভাবে বিস্তৃত হবে সেখানে x = ৫০ ও y=৩০, এবং x = ২৫ ও y=১৩.৭ যথাক্রমে পরস্পর ছেদ করে। চিত্র ৫.২.৫ এ নির্ভরণ রেখাটির অবস্থান দেখানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, X - এর উপর y এর নূন্যতম বর্গরেখা নির্ভরণ y-এর উপর X- এর ন্যূনতম বর্গরেখা এক নয়। এক কেবল তখনই হতে পারে যদি চলকদ্বয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এ'কারণে এ্যালজাব্রীয় নির্ভরণ সূত্র পরিবর্তিত করে y থেকে x এর প্রত্যাশিত মান নির্ণয় করা যায় না। অপরদিকে, নির্ভরণ পদ্ধতির অনুমিতি অনুযায়ী প্রক্রিয়াটি সাধারণত: একমুখী হয়ে থাকে অর্থাৎ x থেকে y' এর প্রত্যাশিত মান সচরাচর নির্ণয় করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ অধীন ও স্বাধীন চলকদ্বয় পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য নয়।

পাঠ সংক্ষেপঃ

নির্ভরণ বিশ্লেষনের মাধ্যমে স্বাধীন চলকের সাপেক্ষে নির্ভরশীল চলকের গতিধারা অনুমান করা যায়। সরল রৈখিক পদ্ধতিতে নির্ভরণের সূত্র হচ্ছে: $\hat{y} = a + bx$ যেখানে, $\hat{y}$ = অধীন চলকের নির্ভরাঙ্ক, x = স্বাধীন চলকের মান, a এবং b নির্ভরণ মান। এই পদ্ধতিতে সর্বোত্তম প্রয়োগযোগ্য অঙ্কিত রেখাকে ন্যুনতম বর্গ রেখা বলা হয়। রৈখিক নির্ভরণ ভূমিতিক ও সামাজিক গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. চলকের মধ্যে আবর্তনশীল পরিবর্তন তথ্যের মধ্যে .... বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে।

১.২. একটি তথ্যসারির সময়/কাল ভিত্তিক পরিমাপকে .... সারি বিশ্লেষণ বলে।

১.৩. ন্যূনতম বর্গপদ্ধতিতে রৈখিক লেখচিত্র অঙ্কনের পরিমাপ ও পদ্ধতিকে সাধারণভাবে .... বলা হয়।

১.৪. আদর্শ রৈখিক নির্ভরণ ক্ষেত্রে এবং স্বাধীন চলকের প্রেক্ষিতে চলকের মান কি হওয়া উচিৎ তা $\hat{y}$ Øviv পাওয়া যায়।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. চলকের মধ্যে উপস্থিত সম্পর্ক সকল সময় রৈখিক হয়।

২.২. উপাত্তের অরৈখিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ সূত্র ও পদ্ধতি রৈখিক সম্পর্ক ও সূত্র থেকে ভিন্নতর এবং জটিল।

২.৩. নির্ভরণ বিশ্লেষণে মূল ধারণা হচ্ছে নির্ভরশীল চলকের মানসমূহ স্বাধীন চলকের উপর নির্ভর করে বা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

২.৪. x - এর উপর y এর নূন্যতম বর্গরেখা নির্ভরণ y-এর উপর x- এর ন্যূনতম বর্গরেখা এক ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. দুইটি চলকের মধ্যে নির্ভরণ বিশ্লেষণ বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করুন।

২. সম্পূর্ন ও অসম্পূর্ন সসম্পর্ক বলতে কি বোঝেন?

৩. রৈখিক এবং অরৈখিক সম্পর্কের উদাহরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. নীচের উপাত্ত ব্যবহার করে নির্ভরণ রেখা নির্ণয় করুন।

সার প্রয়োগ (Kg)	২০	২১	২২	২৬	২৬	২৪	২৮	৩১
ধান উৎপাদন(M.Ton)	১৫	১৬	১৬	১৮	১৯	১৭	২০	২২

উত্তরমালা ঃ ইউনিট-৫

পাঠ-৫.১

১.১. বৃদ্ধি,হ্রাস, ১.২. -১, +১, ১.৩. সমাজ বিজ্ঞানের, ১.৪. রৈখিক সম্পর্ক, ১.৫. ০.০।
২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. মি, ২.৪. মি, ২.৫. স।

পাঠ-৫.২

১.১. আবর্তনশীল, ১.২. কালীক সারি, ১.৩. রৈখিক নির্ভরণ, ১.৪. নির্ভরশীল বা অধীন।
২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. স, ২.৪. মি।

ইউনিট-৬

তথ্যের পরিদৃশ্যমাণতা

পরিমানবাচক তথ্য (Quantitative Data), বিশেষ করে পরিসংখ্যানগত তথ্যের দৃশ্যমানতার জন্য ভূবিদগন নানা ধরণের কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। এগুলির মধ্যে মানচিত্রের মাধ্যমে কোন বিষয় বা উপাত্তের পরিসংখ্যানগত প্রদর্শন অন্যতম। এ সম্পর্কে ব্যবহারিক ভূগোল সম্পর্কীয় কোর্সে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। পরিসংখ্যানগত মানচিত্র ছাড়াও বিবিধ পদ্ধতিতে তথ্য প্রদর্শন বা পরিদৃশ্যমানতা সাধন করা যায়। সংযুক্ত ছকটিতে বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তথ্যের পরিদৃশ্যমানতা পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত

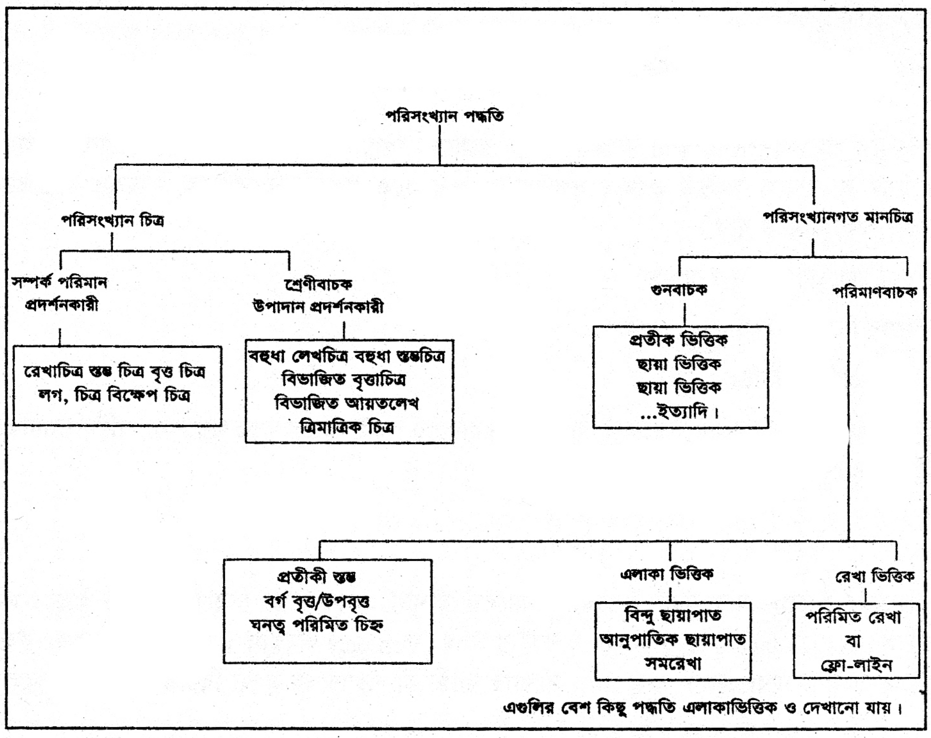

ছক ৬.ক। তথ্যের পরিদৃশ্যমানতা।

আলোচ্য ইউনিটের তিনটি পাঠে আমরা তথ্যের পরিদৃশ্যমানতা এবং ভূগোলে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে জানব।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হচ্ছে-

পাঠ-৬.১ তথ্য চিত্র

পাঠ-৬.২ প্রতীক

পাঠ-৬.৩ ভূগোলে কম্পিউটার ব্যবহার: একটি প্রাথমিক ধারণা

পাঠ-৬.১

তথ্য চিত্র

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- বিভিন্ন ধরনের তথ্য চিত্র;
- চিত্রলেখ;
- যোজিত চিত্রলেখ;
- লরেঞ্জ চিত্রলেখ; এবং
- লগ. ও সেমি-লগ. চিত্রলেখ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পরিসংখ্যানগতভাবে তথ্য প্রদর্শণের জন্য অনেক পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে পদ্ধতি চয়ন না করলে সংশ্লিষ্ট তথ্যের দৃশ্যমানতা ক্ষুন্ন হতে পারে। অপরদিকে, ব্যবহৃত পদ্ধতির ব্যাখ্যাগত যোগ্যতার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

মূলত: দুই ধরণের চিত্র (Diagram) রয়েছে:

(ক) বিভিন্ন ধরণের চিত্রলেখ (Graphs); এবং

(খ) বিভিন্ন ধরণের প্রতীক বা চিহ্ন।

ভূগোলে পরিসংখ্যানগত তথ্য প্রকাশে উভয়েরই ব্যাপক ব্যবহার হয়। এই পাঠের আওতায় তথ্য পরিদৃশ্যমানতার নির্বাচিত কয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করা হবে।

চিত্রলেখ ঃ

অপেক্ষাকৃত সহজতর চিত্রলেখ দ্বারা দুইটি চলকের বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। চিত্রলেখে দুইটি বাহুতে চলকের মধ্যে একটি আনুভুমিক (Horizontal) অবস্থান x এবং অপরটির উলম্ব (Vertical) অবস্থান Y দ্বারা চিহ্নিত হয়। উভয়ের মানের শুরুর সংযোগ অবস্থান o দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সংখ্যার ব্যাপ্তী বা পরস্পরের মধ্যে বিরতি অত্যাধিক হলে o-Y বাহুর শূরুতে, o অংশের উপরে বিরতি চিহ্ন (⚡) দিয়ে চলকের মান লিখতে হবে। অতএব, উলম্ব বাহুতে o-Y দ্বারা অধীন (Dependent) চলক দেখানো হয় এবং এবং একে অর্ডিনেট বলে।

আনুভূমিক বাহুতে o-Y দ্বারা স্বাধীন (Independnt) চলক দেখানো হয়। একে এ্যাবসিসা বলে (ইউনিট-২ দ্রষ্টব্য) (চিত্র-৬.১.১)। দুইটি চলকের মানসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান বিন্দুর সাহায্যে চিহ্নিত করে একটি বিক্ষেপ চিত্র (Scatter Diagram) তৈরী করা যায়। ঐ বিন্দু সমূহ সংযোগ করে একটি বহুভূজ (Polygon) অঙ্কন করা যায়। একটি গণসংখ্যা নিবেশন থেকে এরূপ চিত্র অঙ্কন করা হয় (চিত্র ৬.১.২)।

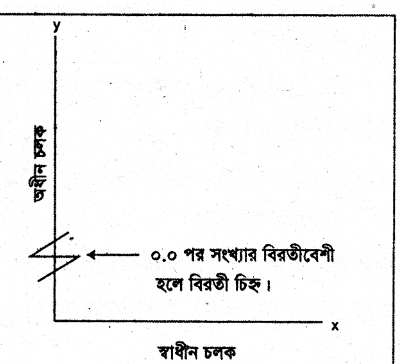

চিত্র ৬.১.১। চিত্র লেখের কাঠামো।

ইউনিট-২.৪-এ আলোচিত আয়তলেখ (Histogram) একটি বহুল প্রচলিত এবং সহজ চিত্রলেখের উদাহরণ। সারনী ৬.১.১ অবলম্বনে একটি আয়তলেখের সাথে বহুভূজ একত্রে চিত্র ৬.১.২-এ দেখানো হয়েছে।

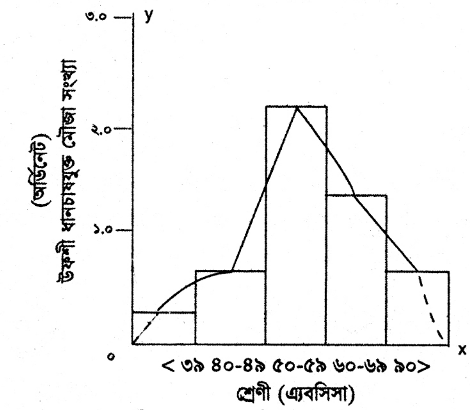

চিত্র ৬.১.২। একটি আয়তলেখ এবং বহুভূজ।

সারনী ৬.১.১। হবিগঞ্জে একটি উপ জেলায় জলাভূমির বিন্যাস।

জলাভূমির শতকরা শ্রেণীবিন্যাস	মৌজা সংখ্যা	ক্রমযোজিত সংখ্যা
< ৩৯	৩	৩
৪০-৪৯	৬	৯ (৩+৬)
৫০-৫৯	৩৪	৪৩(৯+৩৪)
৬০-৬৯	১৯	৬২ (৪৩+১৯)
৭০>	৫	৬৭ (৬২+৫)

এ প্রসঙ্গে আয়তলেখ ও দন্ড চিত্র (Bar Diagrm)-এর পার্থক্য জানা প্রয়োজন। দন্ডচিত্র অঙ্কনের জন্য গণসংখ্যা নিবেশন সারণী প্রয়োজন হয় না। দন্ড চিত্র দ্বার সময়ভিত্তিক বা তুলনামূলক স্থানভিত্তিক তথ্য দেখানো যায়। অপরদিকে, আয়তলেখের জন্য গণসংখ্যা নিবেশন অপরিহার্য। নিচে একটি ছকের মাধ্যমে এদের মধ্যে অন্যান্য পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

আয়তলেখ	দন্ডচিত্র
১। গণসংখ্যা নিবেশনের শ্রেণীসীমার মান পাশাপাশি আয়তক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।	১। দন্ড চিত্র কোন স্থান বা সময় ব্যাপ্তীর ভিত্তিতে তথ্য সারির দন্ডের উচ্চতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।
২। আয়তলেখ অঙ্কনের সময় আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়ই সাধারণত গণনায় ধরা হয়।	২। দন্ডচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে দন্ডের প্রস্থ গণনায় আনা হয় না।
৩। অসম শ্রেণীবিশিষ্ট গণসংখ্যা নিবেশন বিন্যাস আয়তলেখে দেখানো যায়। সেক্ষেত্রে আয়তক্ষেত্রের প্রস্থে ভিন্নতা থাকে।	৩। অসমশ্রেণীবিশিষ্ট গণসংখ্যা নিবেশনের ক্ষেত্রে দন্ড চিত্র অঙ্কন করা হয় না।

আয়তলেখের কেন্দ্রীয় শীর্ষবিন্দু সংযোগ করে একটি বহুভূজ পাওয়া যায় (চিত্র ৬.১.২)। এছাড়া এই সাধারণ চিত্রলেখটি নানাভাবে পরিবর্ধিত করা সম্ভব যেমন, কোন বিষয়ে (যেমন জনসংখ্যা) একাধিক চলক ব্যবহার করে তুলনামূলক চিত্র নির্মাণ করা যায়। এরূপ চিত্রলেখ অঙ্কনের সময় o-X ও o-Y তে ব্যবহৃত সারণীর মান সাবধানতার সাথে উপস্থাপন করা

প্রয়োজন। নচেৎ চলকের দৃশ্যমানতা দেখে প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদানে সমস্যা হতে পারে। ফলে তথ্যে বিন্যাস ধারা সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে।

যোজিত চিত্রলেখ ঃ

ইউনিট-২- এর পাঠ-৪ এ আলোচিত অজিভ একটি যোজিত চিত্রলেখের উদাহরণ (চিত্র ৬.১.৩) । যোজিত চিত্রলেখ অঙ্কনের ক্ষেত্রে শ্রেণী গণসংখ্যাগুলিকে সরাসরি চিত্রলেখে স্থাপন না করে একটি শ্রেণীর গণসংখ্যাকে পরবর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যার সাথে ক্রমান্বয়ে যোগ করা হয়। এই পদ্ধতিকে ক্রম যোজিত সংখ্যা বলে (সারণী ৬.১.১)। এই ক্রমযোজন প্রক্রিয়া উচ্চক্রম বা নিম্নক্রম অনুসারে করা যায়।

o-x বাহুতে শ্রেণী ব্যাপ্তী (বা সময় ব্যাপ্তী) এবং o-y বাহুতে যোজিত গণসংখ্যা দেখানো হয়। নিম্ন থেকে উচ্চক্রম বা সম্মুখগামী যোজিত গণসংখ্যা উপস্থাপন করে যে রেখাটি পাওয়া যায় তাকে উন-অজিভ বলে (দ্রষ্টব্য: ইউনিট-২-এর চিত্র ২.৪.৩)। একইভাবে উচ্চক্রম থেকে নিম্নক্রম বা পশ্চাদগামী যোজিত গণসংখ্যা ব্যবহার করে যে যোজিত চিত্রলেখ পাওয়া যায় তাকে অধি-অজিভ বলে (চিত্র ২.৪.৩)।

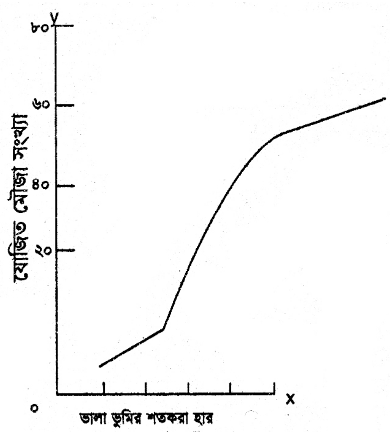

চিত্র ৬.১.৩। একটি অজিভ।
(সুত্র সারণী ৬.১.১)

যোজিত শতকরা হারের তথ্য দিয়ে অপর একটি চিত্রলেখ অঙ্কন করা যায় যেখানে দুইটি সম্পর্কীয় চলকের তথ্য ব্যবহার করা হয়। একে ‘লরেঞ্জ চিত্র লেখ’ (Lorenze Curve) বলে। এই চিত্রলেখ দ্বারা দুইটি সম্পর্কীয় চলকের বিন্যাসের মধ্যে সম্পর্কের ধরণ আদর্শ ধরণের পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো হয়। এ জন্য একটি বর্গাকার গ্রাফ কাগজ o-x এবং o-Y অক্ষে সমদূরত্বে চলকদ্বয়ের যোজিত শতকরা হার ০ (শূণ্য) থেকে ১০০ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয়। তদানুযায়ী চলকদ্বয়ের যোজিত শতকরা হারের মানসমূহ গ্রাফে নির্দেশ করে একটি রেখাদ্বারা সংযোগ করা হয়। যদি রেখাটি ৪৫° বরাবর আদর্শ বিন্যাস রেখা অনুসরণ করে তাহলে বলা যাবে যে চলকদ্বয়ের মানের মধ্যে বিন্যাসের ভাল সমতা রয়েছে। আদর্শ রেখা-থেকে প্রদর্শিত রেখার দূরত্ব চলকদ্বয়ের মানের বিন্যাসের অসমতা নির্দেশ করে।

সারনী ৬.১.২। একটি জেলার ১০টি থানার জনসংখ্যা ও আয়তন অনুযায়ী লরেঞ্জ চিত্রলেখ অঙ্কন পদ্ধতি

থানা	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতিবর্গ মাইল)	আয়তন (বর্গ মাইল)	যোজিত		যোজিত শতকরা	
			জনসংখ্যার ঘনত্ব	আয়তন	জনসংখ্যার ঘনত্ব	আয়তন
জ	৩৬১৩	৬০০	৩৬১৩	৬০০	৩৬.৬৫	৫.০৫
ঝ	১২২১	৭১৪	৪৮৩৪	১৩১৪	৪৯.০৫	১১.০৬
ছ	১০৫৩	১২৬৫	৫৮৮৭	২৬০৯	৫৯.৭৩	২১.৯৫
খ	৮৬৯	১১২৮	৬৭৫৬	৩৭৩৭	৬৮.৫৫	৩১.৪৫
ঙ	৭৩২	১২২১	৭৪৮৮	৪৯৫৮	৭৫.৯৭	৪১.৭২
ক	৬৮৬	৬৯৫	৮১৭৪	৫৬৫৩	৮২.৯৩	৪৭.৫৭
ঞ	৬১৫	৮২৮	৮৭৮৯	৬৪৮১	৮৯.১৭	৫৪.৫৪
গ	৫০৮	১৩৬০	৯২৯৭	৭৮৪১	৯৪.৩৩	৬৫.৯৮
ঘ	৩৬৩	২২৮৭	৯৬৬০	১০১২৮	৯৮.০১	৮৫.২৩
চ	১৯৬	১৭৫৫	৯৮৫৬	১১৮৮৩	১০০.০০	১০০.০০

একটি উদাহরণ দ্বারা লরেঞ্জ চিত্রলেখ অঙ্কনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হবে। সারনী ৬.১.২-এ ১০টি থানার জনসংখ্যা ঘনত্ব (প্রতি বর্গ মাইলে) এবং আয়তন (বর্গ মাইলে) দেখানো হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারি)। এই সারনী অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নিন্তে বর্ণিত পর্যায়ে সারণীর অন্যান্য সারিতে দেখানো হয়েছেঃ

- জনসংখ্যা ঘনত্ব অনুযায়ী থানা সমূহকে মানানুক্রমিক (উচ্চ থেকে নিম্ন মানে) সাজানো হয়েছে;
- জনসংখ্যা ঘনত্বের ক্রম অনুযায়ী থানা সমূহের আয়তন দেখানো হয়েছে;
- জনসংখ্যা ঘনত্ব এবং আয়তনের যোজিত সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে (চতুর্থ ও পঞ্চম সারি);
- দুইটি চলকের যোজিত সংখ্যার থানা ওয়ারি শতকরা হার নির্ণয় করা হয়েছে (সর্বশেষ দুই সারি); এবং
- দুইটি চলকের যোজিত শতকরা হার গ্রাফে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৬.১.৩-এ উপরে বর্ণিত পর্যায় অনুসারে একটি লরেঞ্জ চিত্র লেখ অঙ্কিত হয়েছে।

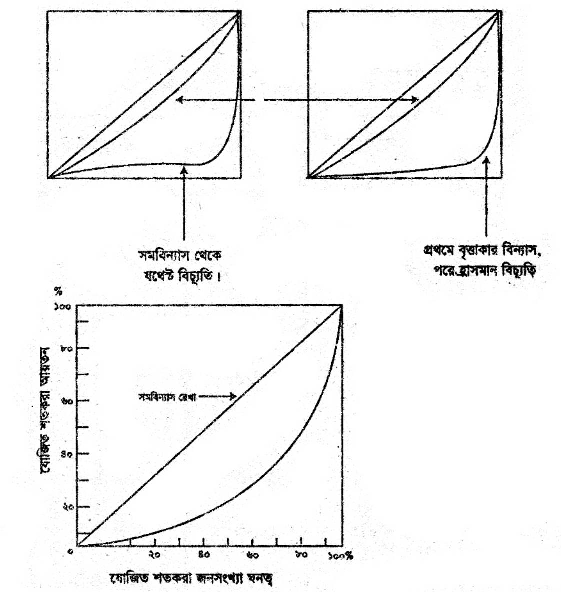

চিত্র ৬.১.৪। একটি লরেঞ্জ চিত্রলেখ (সূত্রঃ সারণী ৬.১.২)।

লগ. এবং সেমি-লগ. চিত্রলেখ

পরিদৃশ্যমানতার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত তথ্যকে চিত্র লেখে লগারিদমিক (লগ. x লগ.) গ্রাফ কাগজে প্রকাশ করতে হয়। সাধারণ গ্রাফ কাগজ থেকে এ ধরণের গ্রাফ কাগজ মাপনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভিন্নতর। সাধারণ গ্রাফ কাগজে গাণিতিক মাপনী ব্যবহার হয়। কিন্তু লগ. বা সেমি-লগ. গ্রাফ কাগজে চক্রবৃদ্ধিক জ্যামিতিক মাপনী ব্যবহার হয় (চিত্র ৬.১.৪)। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাধারণ গ্রাফে এক ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারকে ১০ ভাগ ভাগ করে দেখানো হয়। কিন্তু লগ. বা লগ-লগ. গ্রাফ কাগজে উভয় বাহুতে ১০' এর গুণিতক বিভাজন দেখানো হয়।

চিত্র ৬.১.৫ । বিভিন্ন ধরণের লগারিদমিক গ্রাফ-কাগজ ।

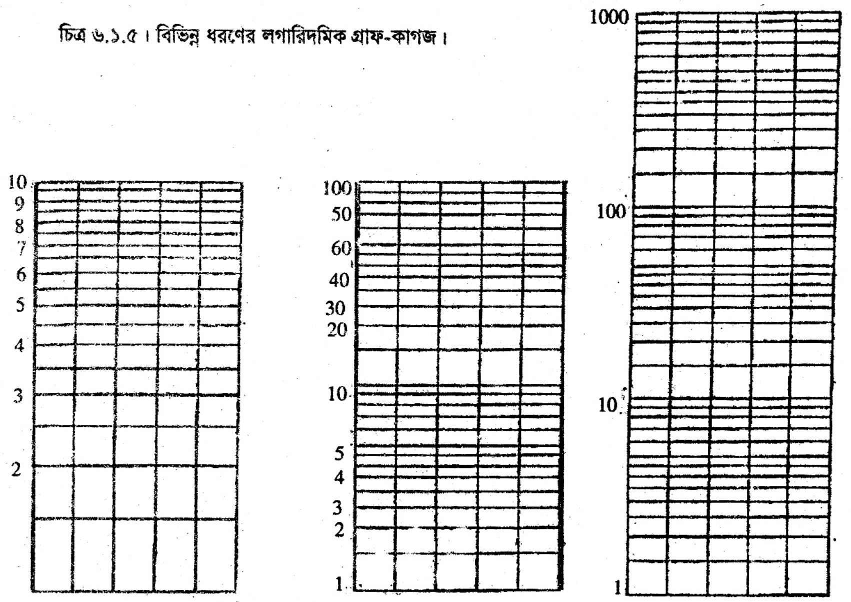

(ক) এক চক্র সেমি লগ গ্রাফ কাগজ । (খ) দুই চক্র সেমি লগ গ্রাফ কাগজ । (গ) তিন চক্র সেমি লগ গ্রাফ কাগজ ।

এই বিভাজনটি ১০X১০.......' এর আবর্তক বা চক্রে গণনা করা হয় - অর্থাৎ প্রতিটি চক্রের শুরু ও শেষ ১০-এর গুণিতক বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি লগ. গ্রাফে প্রথম চক্র যদি ১ থেকে ১০ হয় তবে দ্বিতীয় চক্র ১০ থেকে ১০০ .... ইত্যাদি হারে আবর্তিত হবে (চিত্র ৬.১.৪)। লক্ষণীয় যে, লগারিদমিক গ্রাফ ০ (শুণ্য) থেকে শুরু হয় না। সেমি-লগ. গ্রাফ কাগজে উল্লম্ব বাহুতে উপরোক্ত ধারায় মান বন্টন হয়। পক্ষান্তরে লগ.-লগ. গ্রাফে উল্লম্ব ও আনুভূমিক উভয় বাহুতে উপরোক্ত পদ্ধতিতে মান বন্টন হয়ে থাকে।

প্রধানত: তিন থেকে এই বিশেষ ধরনের গ্রাফ কাগজ ব্যবহার হয়:

ক) যখন একটি তথ্য সারির নিম্ন ও উচ্চ মানের মধ্যে ব্যবধানকে সঙ্কুচিত করে পরিদৃশ্যমান করা হয়;
খ) যখন কোন তথ্য সারির এক প্রান্তে মানের বিন্যাস অধিক থাকে তখন প্রান্তদেশীয় তথ্যের মান সঙ্কুচিত আকারে এইরূপ গ্রাফ কাগজে প্রকাশ করা যায়; এবং
গ) যখন একটি তথ্য সারির বৃদ্ধির পরিমানের চাইতে হার মূখ্যত দেখানো হয় (যেমন, বিশেষ কালিক তথ্য সারির ক্ষেত্রে), তখন এই গ্রাফ কাগজ ব্যবহার হয়।

পাঠ সংক্ষেপ ঃ

পরিসংখ্যানগতভাবে তথ্য প্রদর্শণের জন্য মূলত: দুই ধরনের চিত্র ব্যবহৃত হয়। এগুলো হচ্ছে- (ক) বিভিন্ন ধরণের চিত্রলেখ; এবং (খ) বিভিন্ন ধরণের প্রতীক বা চিহ্ন। চিত্রলেখে দুইটি বাহুতে চলকের মধ্যে একটি আনুভূমিক অবস্থান x এবং অপরটির উলম্ব অবস্থান Y দ্বারা চিহ্নিত হয়। দন্ডচিত্র অঙ্কনের জন্য গণসংখ্যা নিবেশন সারনী প্রয়োজন হয় না। আয়তলেখের জন্য গণসংখ্যা নিবেশন অপরিহার্য। যোজিত চিত্রলেখ অঙ্কনের ক্ষেত্রে শ্রেণী গণসংখ্যাগুলিকে সরাসরি চিত্রলেখে স্থাপন না করে একটি শ্রেণীর গণসংখ্যাকে পরবর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যার সাথে ক্রমান্বয়ে যোগ করা হয়। নিম্ন থেকে উচ্চক্রম বা সম্মুখগামী যোজিত গণসংখ্যা উপস্থাপন করে যে রেখাটি পাওয়া যায় তাকে উন-অজিভ বলে । যোজিত শতকরা হারের তথ্য দিয়ে যে চিত্রলেখ অঙ্কন করা যায় তাকে 'লরেঞ্জ চিত্র লেখ' বলে। পরিদৃশ্যমানতার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত তথ্যকে চিত্র লেখে লগারিদমিক (লগ.x লগ.) গ্রাফ কাগজে প্রকাশ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. দুইটি চলকের মানসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান বিন্দুর সাহায্যে চিহ্নিত করে একটি .... তৈরী করা যায়।

১.২. দন্ড চিত্র দ্বারা .... বা তুলনামূলক .... তথ্য দেখানো যায়।

১.৩. সাধারণ গ্রাফ কাগজে .... মাপনী ব্যবহার হয়।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. আয়তলেখ অঙ্কনের সময় আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়ই সাধারণত গণনায় ধরা হয়।

২.২. অসমশ্রেণীবিশিষ্ট গণসংখ্যা নিবেশনের ক্ষেত্রে দন্ড চিত্র অঙ্কন করা হয়।

২.৩. অজিভ একটি যোজিত চিত্রলেখের উদাহরণ ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. লগ ও সেমি-লগ গ্রাফের ব্যবহার আলোচনা করুন।

২. লরেঞ্জ কার্ভ কাকে বলে? এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. নিম্নে তথ্য সারি অনুযায়ী: (ক) একটি আয়তলেখ, (খ) একটি বহুভূজ; এবং (গ) একটি অজিভ অঙ্কন করুন। প্রতিটির জন্য ১০টি বাক্যে মন্তব্য করুন।

শ্রেণী ব্যবধান	২০-২৫	২৫-৩০	৩০-৩৫	৩৫-৪০	৪০-৪৫	৪৫-৫০	৫০-৫৫
গণসংখ্যা	৩	৮	১২	১৮	১৫	১০	৭

পাঠ-৬.২

প্রতীক

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- চিত্র কেন্দ্রীক প্রতীক;
- আয়তনিক প্রতীক;
- ত্রি-মাত্রিক প্রতীক;
- বিভক্ত আনুপাতিক প্রতীক; এবং
- বিশেষ ধরণের চিত্রলেখ সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে পারবেন।

ভূগোলে ব্যবহৃত অনেক তথ্য বিভিন্ন প্রতীক বা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। পরিমাণ প্রদানের জন্য এই সমস্ত প্রতীক চলকের মান অনুযায়ী আনুপাতিক আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আনুপাতিক প্রতীক (Proportional symbol) তিন ধরণের হয়ে থাকে:

৬.২.১) চিত্র কেন্দ্রীক প্রতীক

অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য কোন তথ্যের প্রকৃত চিত্র এক্ষেত্রে অঙ্কন কর হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি দেশের শ্রমিক সংখ্যা বা এই সংখ্যার কালিক পরিবর্তন শ্রমিক-পোশাক পরিহিত চিত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে একটি চিত্র এক বা একাধিক শ্রমিক সংখ্যা নির্দেশ করতে পারে (চিত্র ৬.২.১ ক)। তথ্য প্রকাশে বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার করা হয়: চিত্র কেন্দ্রিক. আয়তনিক, ত্রি-মাত্রিক, বিভক্ত আনুপাতিক, বিশেষ গ্রাফ চিত্র।

(ক) স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারী

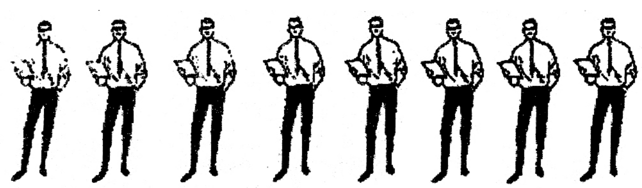

সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারী

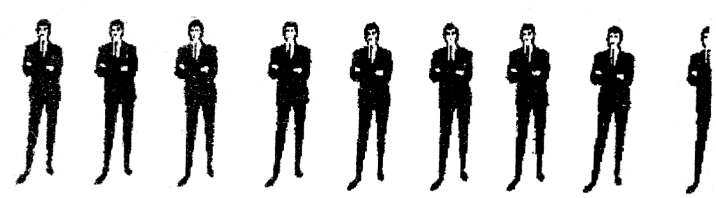

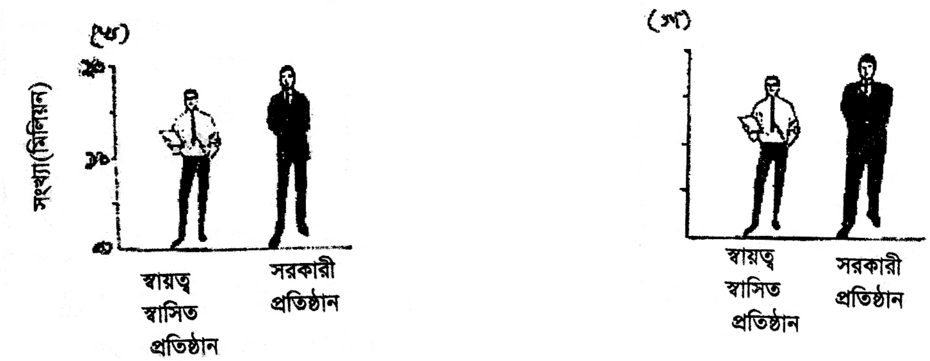

চিত্র ৬.২.১। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের চিত্রকেন্দ্রিক প্রতীক দ্বারা তথ্যের পরিদৃশ্যমানতা।

আবার চিত্রের আকার বা উচ্চতা দ্বারাও শ্রম-শক্তির তুলনামূলক সংখ্যা নির্দেশ করা যায় (চিত্র ৬.২.১ খ ও গ। গ'তে উচ্চতার সাথে আকার পরিবর্তণ করাতে সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের গুরুত্ব বর্ধিত করা হয়েছে।

৬.২.২) আয়তনিক প্রতীক

আয়তনিক প্রতীক (Volumetric Symbol) বর্গ, বৃত্ত, স্তম্ভ বা যে কোন দ্বি-মাত্রিক জ্যামিতিক আকারের হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রদর্শিত তথ্যের পরিমাণ অনুযায়ী স্তম্ভ চিত্রের জন্য উচ্চতা আনুপাতিক মাপনী, উপবৃত্ত, বা বৃত্তের জন্য ব্যাসমান বা বর্গ মূল, বর্গের জন্য বর্গমূল সংশ্লিষ্ট তথ্য সারি থেকে নির্ণয় করে তূলনামূলক ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে (চিত্র ৬.২.২)। তবে যে কোন প্রতীকই ব্যবহার হোক না কেন, মনে রাখতে হবে যে, তথ্যের মান অনুযায়ী যেন প্রতীকসমূহের আকার আনুপাতিকভাবে নির্ধারিত হয় এবং একটি তথ্য সারি মানসমূহ প্রকাশের জন্য একাধিক প্রতীক ব্যবহার না করা হয়। তা নাহলে তথ্য সারির ব্যাখ্যায় সমস্যা দেখা দিবে।

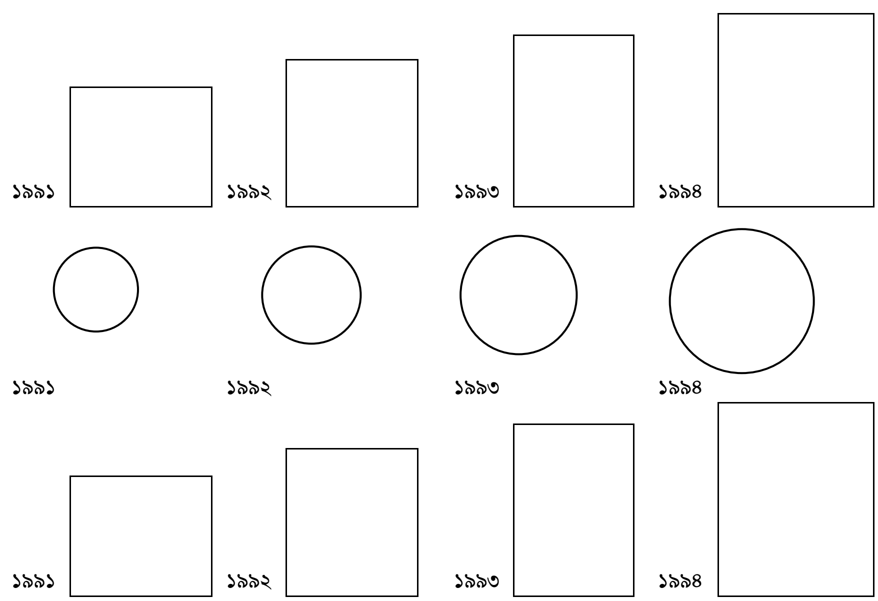

চিত্র ৬.২.২। আয়তনিক প্রতীকের কতিপয় উদাহরণ। বর্দ্ধনশীল আকার তথ্যের কালিক বৃদ্ধি নির্দেশ করছে।

৬.২.৩) ত্রি-মাত্রিক প্রতীক ঃ

ত্রি-মাত্রিক প্রতীক (Thre Dimensional Symbol) দ্বারা একটি তথ্য সারির আনুপাতিক পরিমাণ দেখানো হয়। আয়তনিক প্রতীকসমূহ দ্বি-মাত্রিক হওয়ার জন্য যেমন প্রধানত তথ্যের বর্গমূল ব্যবহার করা হয়, ত্রি-মাত্রিক প্রতীকে তথ্য সারির কিউবরূট বা ঘনমূল ব্যবহার হয়। ঘনমূল মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রতীকের ত্রি-মাত্রিক রূপদান করা হয়।

আয়তনিক প্রতীকের মতই এই পদ্ধতি প্রধানত তথ্য সারির তুলনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে এবং এজন্য প্রতীকের আকার নির্ধারিত আনুপাতিক ঘনমূল নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়।

বিভক্ত আনুপাতিক প্রতীক ঃ

চলকের বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক বা তুলনামূলক গুরুত্ব প্রদানের বা প্রকাশের জন্য একটি প্রতীকের মধ্যেই তথ্যের অংশবিশেষের আনুপাতিক চিত্র প্রকাশ করা হয়। এইরূপ প্রতীকের আওতায় স্তম্ভ চিত্র, বৃত্ত/পাই চিত্র, সংযুক্ত রেখাচিত্র বা যে কোন আয়তনিক প্রতীকের মাধ্যমে দেখানো যায়। অনেক সময় চলকের মূল মান, যেমন, জনসংখ্যা এবং এলাকার আয়তনের অংশ বিশেষ, যথাক্রমে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা হার বা অনুপাত এবং কোন এলাকার ভূমি ব্যবহার বিভক্ত আনুপাতিক প্রতীক দ্বারা দেখানো যায়। এরূপ ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বা এলাকার আবার তুলনামূলক চিত্র দেখানোর জন্য (যেমন বিভিন্ন জেলার) জেলাসমূহের মোট জনসংখ্যা বা আকারের আনুপাতিক আয়তিক চিত্রের মধ্যে উপরোক্ত অংশবিশেষ সন্নিবেশ করা সম্ভব (চিত্র ৬.২.৩)। এতে তথ্যের মোট বৈশিষ্ট্যের সাথে অংশবিশেষের চরিত্র পরিস্ফুট হবে।

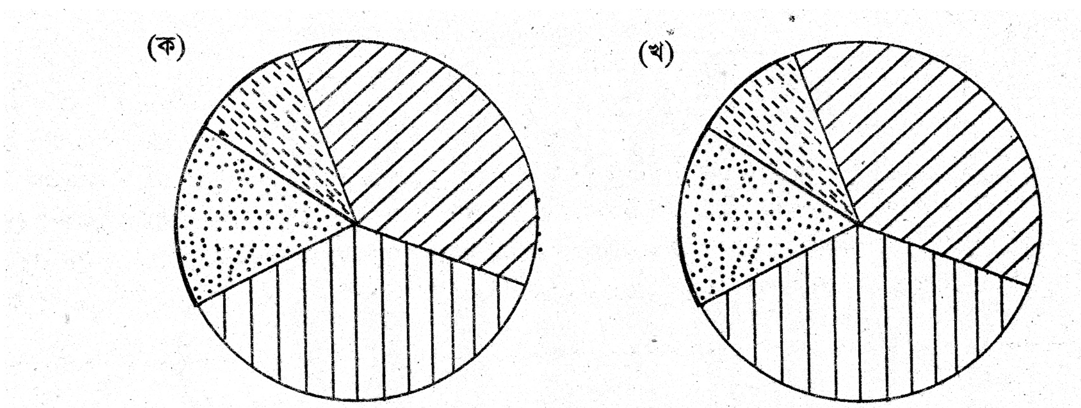

চিত্র ৬.২.৩। বিভক্ত আনুপাতিক প্রতীক (ক) প্রধান শ্রেণীবিভাগ; (খ) বিশদ শ্রেণীবিভাগ।

বিশেষ ধরণের চিত্রলেখ ঃ

অনেক সময়ে দুই-এর বেশী সম্পর্কযুক্ত চলকের মান বিশেষ ধরনের চিত্রলেখ দ্বারা প্রদর্শন করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি সমস্যাযুক্ত মনে হলেও ত্রিভুজ গ্রাফের মাধ্যমে তা সহজে নিরসন করা যায়। ত্রিভুজ গ্রাফের তিন বাহুতে তিনটি সম্পর্কীয় চলকের (যেমন, জনসংখ্যার শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ; বা শিল্প শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক ও সেবামূলক শ্রমিক; মৃত্তিকার গঠন দোঁয়াশ, বেলে ও কর্দম ইত্যাদি) শতাংশ হারে মান সন্নিবেশ করে মানগুলির অবস্থানিক ধারা পর্যালোচনা করতে হয়। (চিত্র ৬.২.৪)। নির্দিষ্ট বাহুর দিকে শতকরা হারের সম্মিলিত পর্যালোচনা করে চলকের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায়।

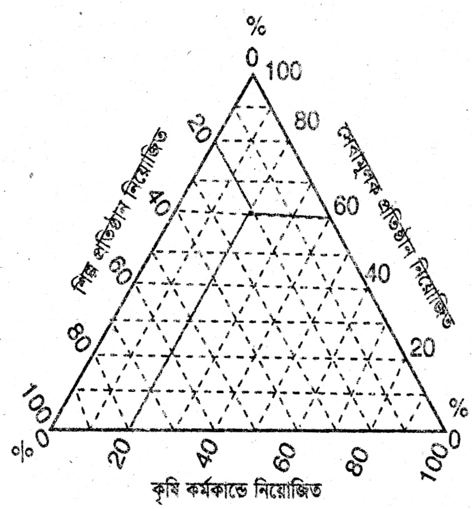

চিত্র ৬.২.৪। ত্রিভূজ-গ্রাফে একটি জনগোষ্ঠীর পেশাগত কাঠামো: কৃষি ২০%, শিল্প ২০%, ও সেবামূলক ৬০%।

সাধারণতঃ একটি চলকের তিনটি বৈশিষ্ট্য, যেমন, জনসংখ্যার বয় কাঠামোর শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ জনসংখ্যার শতকরা হার বা কোন স্থানের মৃত্তিকার গঠন (বেলে, দোঁয়াশ, এঁটেল) অথবা জনসংখ্যার শ্রম কাঠামো (কৃষি, শিল্প, সেবামূলক) শতাংশ হারে ত্রিভূজ গ্রাফে প্রদর্শন করা হয়। চিত্র ৬.২.৪-এ একটি জনগোষ্ঠীর পেশাগত কাঠামো দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যায় যে, ২০ শতাংশ জনসংখ্যা কৃষিজীবী, ২০ শতাংশ শিল্প এবং ৬০ শতাংশ সেবাজীবি। ফলে গ্রাফে তিনটি শ্রেণীর বিন্যাস বিন্দুটি সেবাজীবি বাহুর নিকট অবস্থিত হয়েছে। এতে বলা যায় যে, জনগোষ্ঠীর পেশা কাঠামো সেবাজীবি ভিত্তিক।

এই পাঠে কেবলমাত্র নির্বাচিত কয়েকটি প্রতীকের ব্যবহার তথ্য পরিদৃশ্যমানতার ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে। এগুলি ছাড়াও ভূগোলে ব্যবহার্য আরও প্রতীক ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। একইভাবে তথ্য চিত্র ব্যবহারেরও সুযোগ রয়েছে। সাম্প্রতিককালে এ সমস্তের ব্যবহার মানচিত্র সহযোগেও সম্ভব, যার ফলে তথ্যের স্থানিক ভিন্নতা প্রকাশ করা যায়। তথ্যের পরিদৃশ্যমানতার বহুবিধ কম্পিউটার পদ্ধতিও আজকাল উদ্ভাচিত হয়েছে এবং ভূগোল এর ব্যবহারের বিস্তার ঘটছে ।

পাঠ সংক্ষেপ ঃ

ভূগোল ব্যবহৃত অনেক তথ্য বিভিন্ন প্রতীক বা চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। পরিমাণ প্রদানের জন্য এই সমস্ত প্রতীক চলকের মান অনুযায়ী আনুপাতিক আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তথ্য প্রকাশে বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার করা হয়: চিত্র কেন্দ্রিক. আয়তনিক, ত্রি-মাত্রিক, বিভক্ত আনুপাতিক, বিশেষ গ্রাফ চিত্র। আয়তনিক প্রতীক বর্গ, বৃত্ত, স্তম্ভ বা যে কোন দ্বি-মাত্রিক জ্যামিতিক আকারের হতে পারে। ত্রি-মাত্রিক প্রতীক দ্বারা একটি তথ্য সারির আনুপাতিক পরিমাণ দেখানো হয়। চলকের বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক বা তুলনামূলক গুরুত্ব প্রদানের বা প্রকাশের জন্য একটি প্রতীকের মধ্যেই তথ্যের অংশবিশেষের আনুপাতিক চিত্র প্রকাশ করা হয়। ত্রিভূজ গ্রাফের তিন বাহুতে তিনটি সম্পর্কীয় চলকের মান প্রকাশ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. আনুপাতিক প্রতীক .... ধরণের হয়ে থাকে।

১.২. আয়তনিক প্রতীকসমূহ দ্বি-মাত্রিক হওয়ার জন্য প্রধানত তথ্যের .... ব্যবহার করা হয়।

১.৩. তথ্যের পরিদৃশ্যমানতার বহুবিধ ....পদ্ধতিও আজকাল উদ্ভাচিত হয়েছে এবং ভূগোল এর ব্যবহারের বিস্তার ঘটছে ।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. একটি তথ্য সারি মানসমূহ প্রকাশের জন্য একাধিক প্রতীক ব্যবহার করা যায়।

২.২. ত্রি-মাত্রিক প্রতীকে তথ্য সারির কিউবরূট বা ঘনমূল ব্যবহার হয়।

২.৩. দুই-এর বেশী সম্পর্কযুক্ত চলকের মান বিশেষ ধরনের চিত্রলেখ দ্বারা প্রদর্শন করা যায়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. ত্রিভূজ গ্রাফ কি?

২. ত্রি-মাত্রিক এবং বিভক্ত আনুপাতিক প্রতীক এর মধ্যে পার্থক্য নিরুপন করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ভূগোলে প্রতীক ব্যবহার সম্পর্কে উদাহরন সহ আলোচনা করুন।

২. নিচের তথ্য সারি পরিদৃশ্যমানতার জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করুন:

সাভারে ভূমি ব্যবহার	(শতকরা হার)
কৃষি ভূমি	৭৪.১৩
জনবসতি	১০.৮৪
বিবিধ	১৫.০৩

নির্বাচিত পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি দেখান এবং দশটি বাক্যের মধ্যে সাভারের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

পাঠ-৬.৩

ভূগোলে কম্পিউটার ব্যবহারঃ একটি প্রাথমিক ধারণা

এই অংশটুকু পাঠ করে আপনি-

- ভূগোলে কম্পিউটারের ব্যবহার ;
- কম্পিউটারে তথ্য ব্যবহার উপকরণ ও পদ্ধতি; এবং
- ভৌগোলিক তথ্য সিস্টেমস (জি.আই.এস) সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

এই পাঠে ভূগোল শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার পরিচালনা বা কম্পিউটার পদ্ধতি ব্যবহার শিক্ষাদান উদ্দেশ্য নয়, কেননা এজন্য একটি পৃথক কোর্সের প্রয়োজন হতে পারে। স্নাতক পর্যায়ে তা সম্ভবও নয়। তবে এই পাঠের আলোচনা ভূগোল চর্চায় শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবে।

ভূগোল কম্পিউটারায়নঃ একটি পদ্ধতিগত বিবর্তণ

১৯৫০ দশকের প্রথম দিকে কম্পিউটারের প্রচলন ঘটলেও ভূগোলে এর ব্যবহার ঘটতে আরও প্রায় দশ বৎসর অতিবাহিত হয়। তবে এই সময়কালে ভূগোল শাস্ত্রে প্রভূত দার্শনিক এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ষাট দশকের শেষে ও সত্তর দশকের প্রথমে ভূগোলে পরিমাত্রিক (Quantitative) বিপ্লব ঘটে। এর ফলে এই শাস্ত্রে তথ্য ব্যবস্থাপনায় পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়। এই সময়ে মেইন ফ্রেম কম্পিউটারের সীমিত ব্যবহার ভূগোলে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। সত্তর দশকের শেষে এবং আশি দশকের প্রথমে ক্ষুদ্র কম্পিউটারের (Micro-Computer) প্রচলন শুরু হলে ভূগোলে পূর্বেকার হার্ডওয়্যার সমস্যা প্রধানত দূর হয়। আশি দশকের মাঝামাঝি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সমস্যা নিরসন হলেও ভূগোল কেন্দ্রিক সফটওয়ারের সমস্যা থেকে যায় (চিত্র ৬.৩.১)।

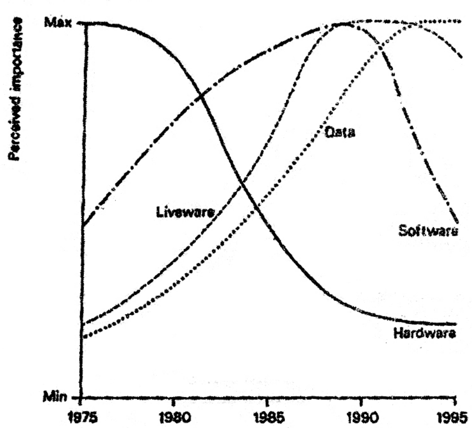

চিত্র ৬.৩.১। কম্প্যুটার ব্যবহারের ভূগোলের অবস্থান (Rhind, 1988)।

কাজেই এসময় ভূগোলে যে সমস্ত সফটওয়্যার ব্যবহার হতো সেগুলো প্রধাণতঃ পরিসংখ্যানভিত্তিক ছিল। এই পরিস্থিতি প্রায় নব্বই দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রায় ৫ থেকে ১০ বৎসরের মধ্যে ভূগোলবিদগণ নিজস্ব প্রয়োজন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যভিত্তিক সফটওয়্যার প্রণয়নের যোগ্যতা অর্জন করতে থাকেন। কম্পিউটারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সাথে সাথে এই ধারা এখনও সচল আছে।

কম্পিউটার এবং ভূগোল ঃ

কম্পিউটার নির্দেশ পালনকারী বা প্রোগ্রাম করা যায় এমন একটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র যা দ্বারা তথ্য নিবেশন, পরিচালনা, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এবং কঙ্খিখত ফলাফল লাভ করা যায়। বিভিন্ন ধরণের কম্পিউটার বিশ্বে প্রচলিত হলেও সাম্প্রতিক কালে পার্সোণাল কম্প্যুটার বা PC বহুল প্রচলিত। তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কম্পিউটার ভূগোলসহ প্রায় সকল বিষয়ে এখন অপরিহার্য উপকরণ ।

তত্ত্বীয়ভাবে, কম্পিউটার দ্বারা ভূগোলবিদগণ এখন যে সব কাজ করছেন তা অন্য বা সনাতন পদ্ধতিতেও করা সম্ভব। কিন্তু ব্যবহারিকভাবে কম্পিউটার দ্বারা ভূগোলে এখন স্বল্প সময়ে এবং নির্ভুলতার সাথে তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং উপস্থাপন সম্ভব, যেখানে সনাতন পদ্ধতিতে বহুসময় ব্যয় হতো এবং নির্ভুলতার নিশ্চয়তা সম্পর্কে সন্দেহ থাকতো। উল্লেখ্য যে, কম্পিউটার ব্যবহার করে উপরোক্ত কার্যাবলী সাধনের জন্য অবশ্যই নির্ভুল তথ্যরাজি ব্যবহার একটি পূর্বশর্ত। নয়তো চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভুল হবে না।

কম্পিউটার ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার ও উপস্থাপন একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এরূপ তথ্য উপস্থাপন চারটি ধাপ বা পর্যায়ে পরিচালিত হয় (চিত্র ৬.৩.২)।

ক) পরিমাপ (Measure)ঃ যেমন, কোন শহরের পরিকল্পনা বা সম্পদ ব্যবস্থাপনায় শহরটির স্থানিক বা অবস্থানিক তথ্য জানতে হয়। এরূপ তথ্য আয়তন বা ক্ষেত্রফল বা বিন্দু অথবা রেখার সংখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা হয়। একে পরিমাপ বলে। এরূপ নির্দিষ্ট কার্যের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য কম্পিউটারে ধারণ করা হয়।

খ) মানচিত্রায়ন (Mapping)ঃ বিন্দু, রেখা এবং আয়তন দিয়ে যে নকসা বা চিত্র অঙ্কন করা হয় তাকে মানচিত্রায়ন বা মানচিত্রের মূলউপাদান বলে। জিআইএস পদ্ধতিতে এই কাজ অতি দ্রুততার ও নির্ভুলতার সাথে করা যায়।

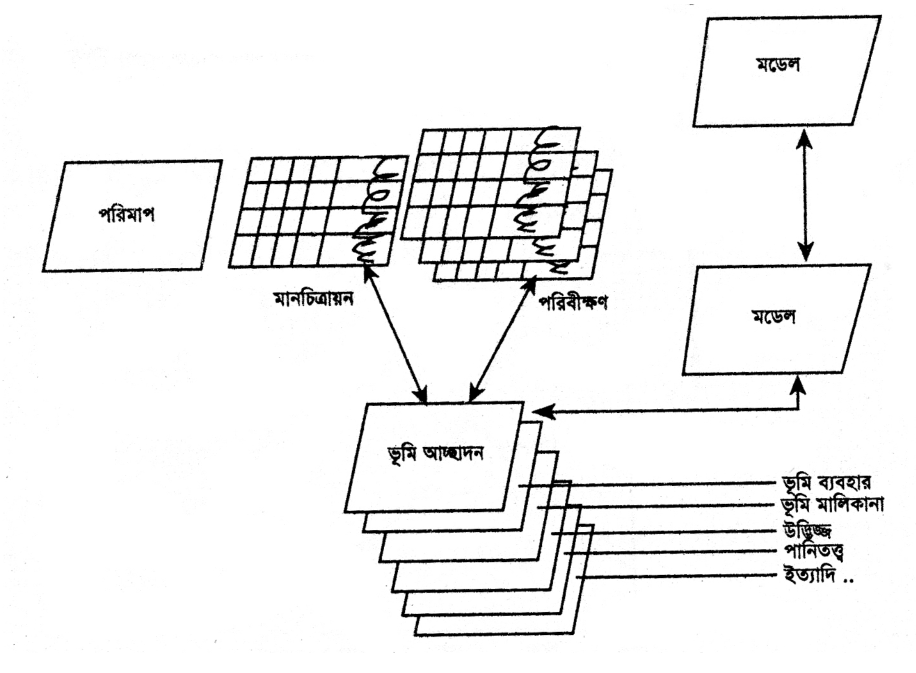

চিত্র ৬.৩.২। ভৌগোলিক তথ্য উপস্থাপনা পদ্ধতির প্রধান পর্যায়সমূহ।

গ) পরিবীক্ষণ (Monitring)ঃ বিন্দু, রেখা ও আয়তনের তথ্য সমন্বয়ে মানচিত্রে স্থান ও কালভিত্তিক তথ্য সংযোজন করে বিষয়ভিত্তিক (Thematic) মানচিত্র তৈরি করা যায়। এরূপ মানচিত্রে বিভিন্ন সময়ের বা কালভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করে

পূর্ববর্তী সময়ের তথ্যযুক্ত মানচিত্রের সাথে পরবর্তিকালের মানচিত্রে তথ্যের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পার্থক্য পরিবীক্ষণ করে ফলাফল বিশ্লেষণ করা যায়।

ঘ) মডেল নির্মাণ (Modelling)ঃ এই পর্যায়ে কম্পিউটারে ব্যবহার্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বণে (যেমন, জিআইএস) তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের দ্বারা বিভিন্ন সরলীকৃত কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য সীমান্তে পৌছানো যায়। এ পর্যায়কে মডেল নির্মাণ বলে (চিত্র ৬.৩.২)।

কম্পিউটারে তথ্য ব্যবহার উপকরণ ও পদ্ধতি

বর্তমাণে ভূগোল শাস্ত্রে ব্যবহারযোগ্য ব্যাপক কম্পিউটার হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার রয়েছে এবং এ সমস্তের ক্রমাগত বিকাশ ঘটছে। তবে ভূগোলে কম্পিউটার ব্যবহারযোগ্যতার জন্য কতকগুলি পূর্বশর্ত চিহ্নিত করা যায়। এগুলো প্রধাণত: তথ্যের বৈশিষ্ট্য, তথ্যের প্রাপ্তি, গুণগতমান এবং পরিমাণ সংক্রান্ত। একই সাথে মানচিত্রায়নের জন্য নির্ভুল ভিত্তি মানচিত্র ডিজিটাইজ (Digitize) করার জন্য প্রয়োজন। অবশ্য কোন স্থানের মানচিত্র ইতিপূর্বে করা না হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে প্রচলিত ভূমি জরিপ অথবা GPS ব্যবহার করে ভিত্তি মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব। মানচিত্রের বিকল্প হিসেবে অথবা মানচিত্র সংশোধন, সংযোজন ও তথ্যসম্ভার বিন্যাসের জন্য দূর অনুধাবন তথ্য (Remote Sensing Data) বা উপগ্রহ চিত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর সাথে আকাশ ধৃত (Aerial photo) চিত্রও ব্যবহার হতে পারে। এই সমস্ত কাজে বৃহৎ তথ্যরাজি সমৃদ্ধ ফাইল একমাত্র কম্পিউটারে সংরক্ষণ সহজে সম্ভব। এই ফাইল থেকে পরবর্তিতে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ থেকে মানচিত্রায়ন এবং পছন্দমাফিক যে কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট কম্পিউটার সফটওয়ার (যেমন জিআইএস) ব্যবহার করা সম্ভব।

ভূগোলে কম্পিউটার ব্যবহারের বিস্তৃত পরিধি সংক্ষেপে চিত্র ৬.৩.৩-এ দেখানো হয়েছে। এই ছকে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য অংশসমুহ এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

ক) ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহঃ ভৌগোলিক সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ একটি মৌলিক বিষয়। সংগৃহীত প্রায় সকল তথ্যই কম্পিউটার প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী। এক্ষেত্রে কম্পিউটার পদ্ধতি দ্বারা তথ্যের ব্যবহার দ্রুত ও সুচারুভাবে সমাধা করা যায় (যেমন, স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ)। কম্পিউটার ব্যবহার করে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পর তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। এ কারণে ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ কম্পিউটার দ্বারা সমাধার পূর্ব শর্ত।

কম্পিউটারে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় প্রধানত: তথ্যরাজি বিন্যাস ও শ্রেণীকরণের মাধ্যমে। এই কাজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হতে পারে (যেমন, আবহাওয়া উপাত্ত বা দূর অনুধাবন তথ্য আহরণ) অথবা সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটারে প্রবেশ বা 'এন্ট্রি' করার মাধ্যমে।

খ) তথ্য ব্যবস্থাপনা ঃ সাম্প্রতিককালে ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশগত তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টির কারণে তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এ জন্য বিবিধ ধরণের কম্পিউটার সফট্ওয়ার বিশেষভাবে প্রচলিত। অপর একটি সফটওয়ারের DBMS (Data Base Management System) বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাত্ত ও তথ্য ব্যবস্থাপনায়ও বিশেষ উপযোগী।

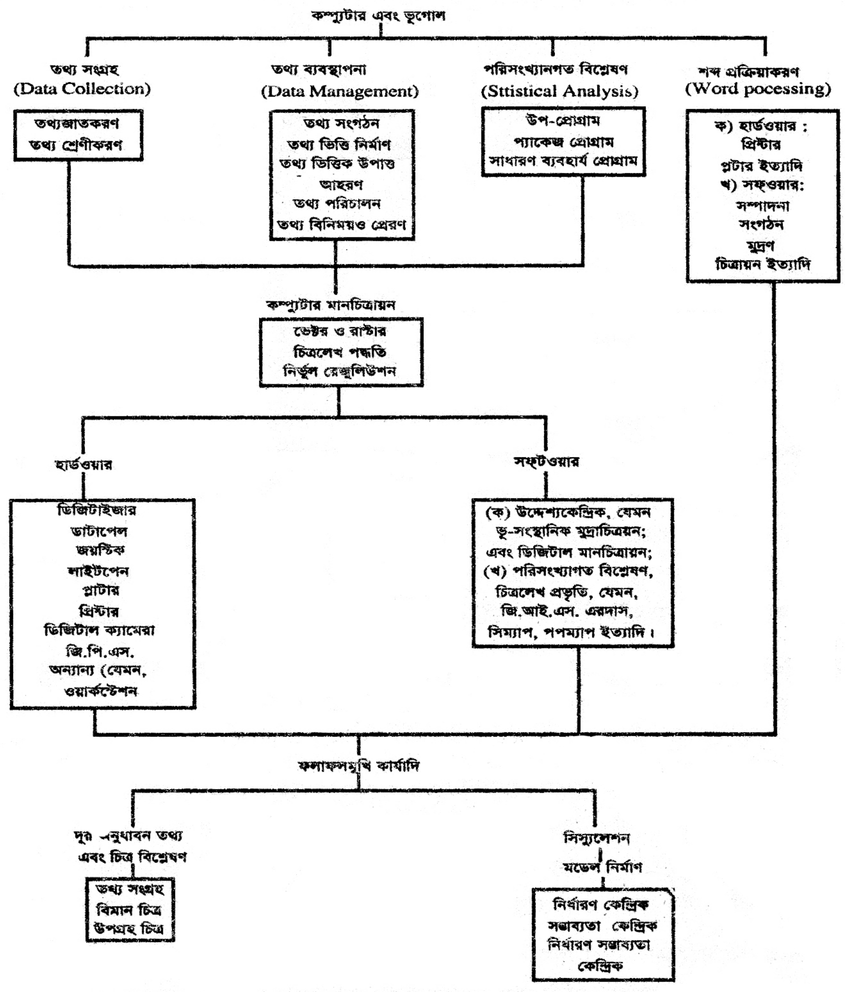

চিত্র ৬.৩.৩। ভূগোল কম্পিউটার ব্যবহারেরমূল অংশসমূহ

তবে প্রাথমিক পর্যায়ে dBase সফটওয়ার বিশেষভাবে প্রচলিত। এই সফট্ওয়ার থেকে তথ্য ব্যবহার উপযোগীতা অনুযায়ী অন্যান্য সফট্ওয়ার (যেমন, পরিসংখ্যানভিত্তিক) এর সাথে সংযুক্ত করে ব্যবহার করা যায়। এরূপ সংযুক্তির প্রয়োজন হয় কোন তথ্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। তথ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় তথ্যের নিরাপত্তা বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক দেশে গবেষকগণ এজন্য বিশেষ সংকেত (Code/password) অথবা কপিরাইট বা অনুরূপ আইনের আশ্রয়গ্রহণ করে তথ্যের অবৈধ ব্যবহার রোধ করার ব্যবস্থাগ্রহণ করে থাকেন।

গ) পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণঃ পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ বিগত কয়েক দশক থেকে পরিমাত্রিক ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। সাম্প্রতিককালে এই বিশ্লেষণে কম্প্যুটার পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্প্যুটার মানচিত্রায়ন, দূর অনুধাবন সমীক্ষা, সিম্যুলেশন নির্মাণ, ভৌগোলিক তথ্য সিসটেমস্ (Geographic Information Systems-GIS) এ সমস্তই পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ নির্ভর হতে পারে। এ ছাড়াও সাধারণত: মূল পরিসংখ্যানগত সফট্ওয়ার ও ভূগোলে ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে; এর মধ্যে এস.পি.এস.এস (SPSS), স্ট্যাটা (Stata),ন্যাপ (SNAP- জরিপ কাজে ব্যবহার্য) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

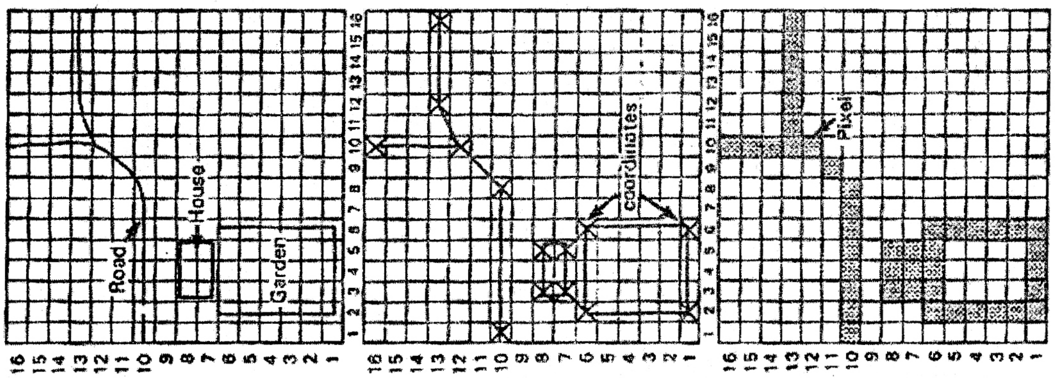

(ক) (খ) (গ)

চিত্র ৬.৩.৪। চিত্রলেখ তথ্য উপস্থাপনের পদ্ধতি (ক) মানচিত্রে এ্যানালগ বা প্রচলিত পদ্ধতি; (খ) ডিজিটাল ভেক্টর পদ্ধতি; এবং (গ) ডিজিটাল রাস্টার পদ্ধতি (Maguire, 1989)।

ঘ) কম্পিউটার মানচিত্রায়নঃ কম্পিউটারের সাহায্যে মানচিত্র ও চিত্রলেখ অঙ্কন এবং বিবিধ চিত্রলেখ মানচিত্রে অন্তর্ভূক্তি একটি দ্রুত বিকাশশীল ক্ষেত্র। কেননা ভূগোলবিদ ছাড়াও এ সমস্তের ব্যবহারকারীগণ হলেন সম্পর্কীয় সমাজ বিজ্ঞান ও মৌল বিজ্ঞানের শাখা থেকে সংবাদ সংস্থা পর্যন্ত ব্যাপ্তি। এ ধরণের মানচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত তথ্য/উপাদানসমূহ সহজে প্রকাশ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং একই সাথে বিভিন্ন তথ্য/উৎপাদনসমূহের মধ্যে সম্পর্কও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

কম্পিউটার মানচিত্রায়ন প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে অঙ্কন করা হয়: ভেক্টর (Vector) ও রাস্টার (Rester) চিত্রলেখ অনুসারে। ভেক্টর চিত্রলেখে মানচিত্রায়ন বিন্দু, রেখা ও এলাকা অনুযায়ী অঙ্কিত হয় এবং প্রতিটি x-y অক্ষ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। রাস্টার চিত্রলেখের ক্ষেত্রে অঙ্কিত মানচিত্র x-y অক্ষের বিভিন্ন কক্ষ (Cells) ধরে অঙ্কন করা হয় (চিত্র ৬.৩.৪)। এই সমস্ত কক্ষকে পিক্সেল (Pixel) বলে।

এই দুই পদ্ধতির মধ্যে অঙ্কনগত পার্থক্যের জন্য তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং প্রদর্শণের মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। যাহোক, উভয় পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। ব্যবহারগত উপযোগীতা অনুযায়ী মানচিত্রায়ন পদ্ধতিটি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। জিআইএস পদ্ধতিতে মানচিত্রায়নে এই দুইটি অঙ্কনগত বিষয় বিশেষ গুরুত্ববহ। সাম্প্রতিককালে কম্পিউটার মানচিত্রায়নে জিআইএস পদ্ধতির ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং নতুন বিকাশের অন্তর্ভূক্তি প্রতিনিয়ত ঘটছে।

ঙ) দূর অনুধাবন তথ্য ও চিত্র বিশ্লেষণঃ বিমান থেকে গৃহীত আকাশধৃত চিত্র (Aerial Photographs) এবং উপগ্রহ থেকে লব্ধ চিত্র (Satellite Images) থেকে তথ্য আহরণের জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে দূর অনুধাবন (Remote Sensing) কৌশল আবিষ্কৃত হয়। ভূমি আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহার এবং এদের কালিক পরিবর্তন মানচিত্র তৈরি ও ব্যাখ্যার জন্য এই কৌশল ব্যবহার হয়। সম্প্রতি এই কৌশলের আরও অগ্রগতি ঘটেছে এবং মেঘমালা ভেদকারী রাডার (Radar) চিত্র একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার হচ্ছে। দূর অনুধাবন কৌশল অবলম্বনের ফলে ভূ-জরিপ কাজের গতি বৃদ্ধি এবং ভূ-পৃষ্টের আবৃত স্থানের তথ্য প্রসারিত হয়েছে (চিত্র ৬.৩.৫)। ফলে, এর সাথে জিআইএস বা অন্যান্য কৌশল ব্যবহার করে দ্রুত ও নির্ভুল মানচিত্র প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে। এ কাজে আজকাল আকাশধৃত মানচিত্রের চাইতে উপগ্রহ চিত্রের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

দূর অনুধাবন তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষণের মাধ্যমে এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে এলাকা ভিত্তিক বা স্থানিক তথ্য বিভিন্ন সময়ের জন্য সংগ্রহ করে ক্রমান্বয়ে একটি তথ্যভিত্তি তৈরি করা যায়। এই তথ্য বিভিন্ন ভৌগোলিক ও সম্পর্কীয় সমীক্ষার কাজে সমন্বয় করে ব্যবহার করা যায়।

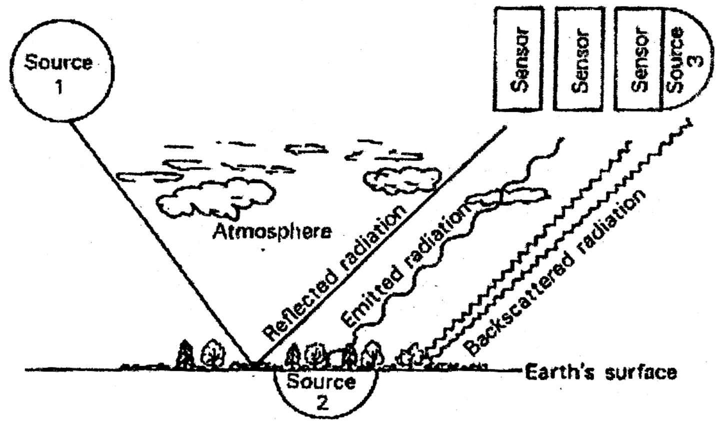

চিত্র ৬.৩.৫। দূর অনুধাবন তথ্যসংগ্রহের মূল প্রক্রিয়া (Maguire, 1989)।

এই ধরণের তথ্য আঞ্চলিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা যায়।

সাম্প্রতিককালে কম্প্যুটার মানচিত্রায়নে জি.আই.এস. পদ্ধতির ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং একই সাথে দূর অনুধাবন তথ্যের অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চ) সিম্যুলেশনঃ সিম্যুলেশন বলতে একটি বাস্তব পরিস্থিতির মডেল তৈরির প্রক্রিয়া এবং তদানুযায়ী কম্পিউটার ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট তথ্যরাজির বর্ণনা, ব্যাখ্যা এবং ধারা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা বুঝিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরণের সিম্যুলেশন মডেল (Simulation model) ভূগোলে ব্যবহার হয়ে থাকে। এর মধ্যে স্কেল মডেল এবং ধারণাগত মডেল উল্লেখযোগ্য। স্কেল মডেল প্রধানত প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন বিষয়ের (যেমন, নদী খাত পরিবর্তন, বন্যার বিস্তৃতি, হিমবাহ উপত্যকার পরিবর্তন ইত্যাদি) প্রকৃত অবস্থিতির পরিবর্তিত স্কেল বা মাপ অনুযায়ী প্রতিকৃতি বিশেষ। অপরদিকে, ধারণাগত মডেলগুলি বিভিন্ন তথ্য উপাদানের সম্পর্ক নির্দেশক চিত্রলেখ (যেমন, ফ্লো বা পরিচলন লেখ) যার দ্বারা কোন বিষয়ের ধারণাগত ব্যাখ্যাকে সুসংহত করে। চিত্র ৬.৩.৬-এ বঙ্গোপসাগর উপকূলের সমুদ্র স্রোতের সিম্যুলেশন চিত্র দেখানো হয়েছে।

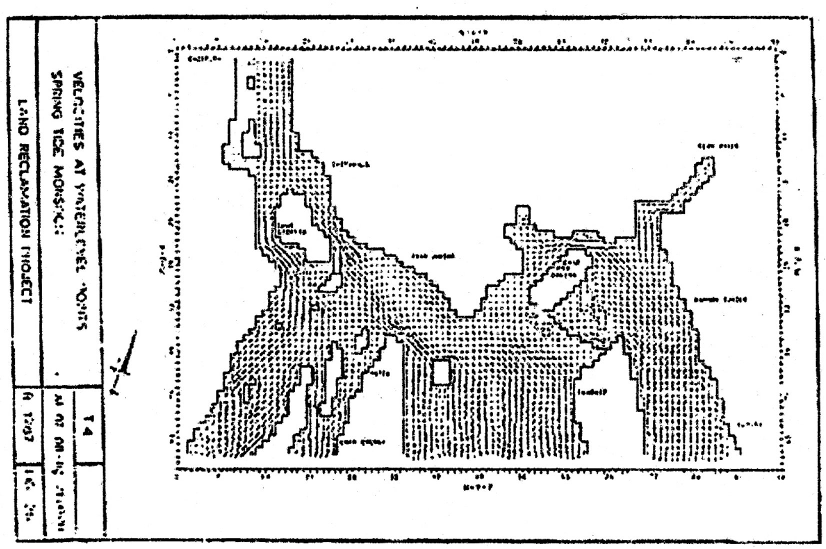

চিত্র ৬.৩.৬। বঙ্গোপসাগর উপকূলের সমুদ্র স্রোতের সিম্যুলেশন চিত্র (L.RP, 1984)।

ছ) জিআইএস- (ভৌগোলিক তথ্য সিস্টেম্‌স-GIS) ঃ মাত্র গত প্রায় একদশকে ভূগোলবিদগণ বহুমাত্রিক ও সমন্বিত তথ্যমালা এবং প্রোগ্রামকে একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া বা সিস্টেমে ব্যবহার করার সুবিধা অনুধাবন করতে পেরেছেন। ফলে তথ্যের বহুমুখি ব্যবহার এবং সম্ভাব্য প্রয়োগের দ্বার আরও উন্মোচিত হয়েছে। এ ধরণের সমন্বিত প্রক্রিয়া বা সিস্টেম জি.আই.এস. প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব। জি.আই.এস. হলো একটি সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, উপযোগীকরণ এবং উপস্থাপন করার কম্প্যুটার-সহযোগী পদ্ধতি। জিআইএস পদ্ধতি বেশ কয়েক ধরণের হতে পারে এবং এদের ব্যবহারের পরিধিও ব্যাপক। বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের রকমের সীমিতকরণের কারণে পদ্ধতির নামকরণটি অনেকে নির্দিষ্টকরণ করে থাকেন, যেমন, ভূমিতথ্য সিস্টেমস (LIS), মৃত্তিকা তথ্য সিস্টেম্‌স (SIS) ইত্যাদি। জি.আই.এস. এর কার্যপ্রণালী চিত্র ৬.৩.৭-এ সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে।

তথ্যজাতকরণ (অভযর্ল)	তথ্যসংগ্রহ (ভৌগোলিক এবং পরিসংখ্যানগত)	
	তথ্যপ্রেরণ/আদান প্রদান	
	তথ্য নির্ভূলতা সাধন	
	তথ্য সম্পাদনা	
সংরক্ষণ (ওমরটথণ)	কম্পিউটার ডিস্কেট (অস্থায়ী)	
	চৌম্বক ফিতা (কিছুটা স্থায়ী)	
	কম্পিউটার হার্ডডিস্ক (স্থায়ী কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে)	
	কম্প্যাক্ট ডিস্ক-সি.ডি. (দীর্ঘস্থায়ী)	
পরিচালনা (Manipulation)	মানচিত্রায়নঃ	- মাপনীর পরিবর্তন
		- ভেক্টর-রাস্টার-ভেক্টর পরিবর্তন
		- প্রাক্কলন পরিবর্তন
		- মানচিত্র সম্পাদনা
	তথ্য সমন্বয়করণঃ	- মানচিত্রের উপর্যুপরি স্থাপন
		- স্থানিক সংযোজন
		- স্থানিক পরিবর্তন/পরিবর্ধণ
	বস্তুর পরিবর্তন :	- উপস্থাপিত বস্তুর সংখ্যা নির্ণয়
		- দূরত্ব, আয়তন, পরিমাণ, আকৃতি নির্ণয়
	স্থানিক অনুসন্ধানঃ	- বিন্দু, রেখা এবং আয়তন অনুযায়ী দূরত্ব, কোন, সংযোজন প্রভৃতি নিরূপণ
	পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণঃ	- বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান, ক্রম-সূচক তালিকা, সহ- সম্বন্ধ বিশ্লেষণ ইত্যাদি।
ফলাফল (ৃর্লযর্ল)	তথ্য উপস্থাপনা :	- মানচিত্র, চিত্রলেখ, সারণী, বর্ণনা ইত্যাদি
		- মানচিত্র উপরিস্থাপন (ৃশণরফটহ)
	তথ্যপ্রেরণ/আদান-প্রদান	

চিত্র ৬.৩.৭। জি.আই.এস. এর কার্যপ্রণালীর প্রধান পর্যায়সমুহ

পরিচালনাগতভাবে জি.আই.এস-কে দুইটি উৎপত্তিগত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকেঃ রাস্টার ভিত্তিক এবং ভেক্টর-ভিত্তিক (উপরে দ্রষ্টব্য)। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ছক ক্ষেত্র গুলিকে সাংকেতিক পদ্ধতিতে তথ্যজাত করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কার্টিজিয় অক্ষ অনুযায়ী তথ্যবিন্যাস করা হয়। এই পদ্ধতি ভূ-সংস্থানিক এবং বিষয়ভিত্তিক মানচিত্রায়নে তথ্য ব্যবহার সহজ হয়। চিত্র ৬.৩.৮-এ নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জি.আই.এস. পদ্ধতির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে।

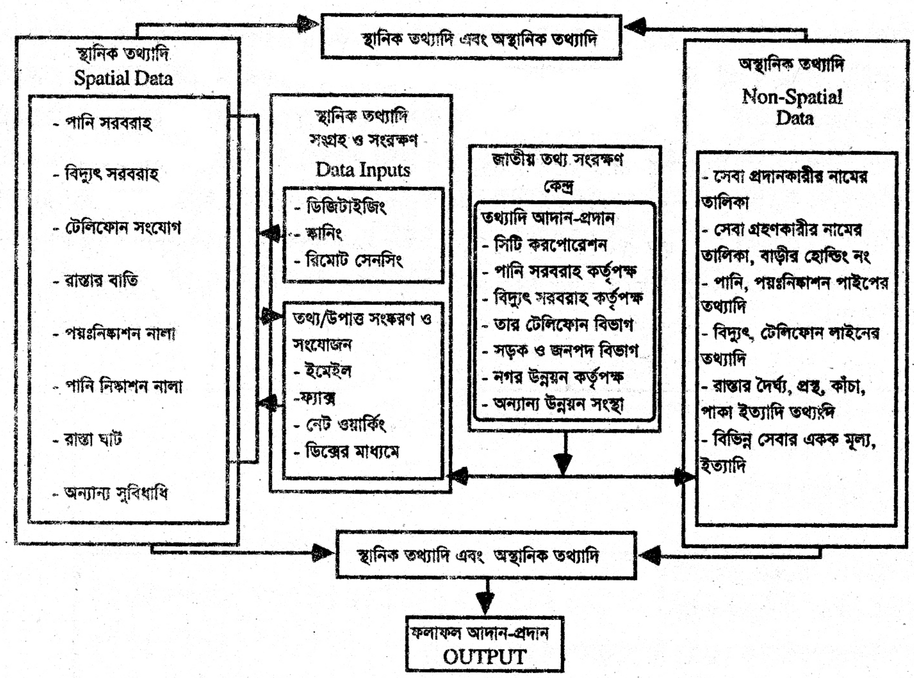

চিত্র ৬.৩.৮। একটি নগর পরিকল্পনায় জি.আই.এস. পদ্ধতি প্রয়োগের নমুনা।

জিআইএস এর সমন্বিত ও প্রায়োগিক উপযোগীতা ভূগোলবিদদের আজকাল অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট করছে। এই পদ্ধতিটি ভূগোলের বহুধা শাখা সমূহকে একীভূত করার ক্ষমতা রাখে এবং বিষয়টি ভূগোলের মূলতত্ত্বীয় ভিত্তি হিসেবে ভূ-পৃষ্টের বিভিন্ন বিষয় সমন্বয়ে আঞ্চলিকীকরণের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

জ) শব্দ প্রক্রিয়াকরণঃ শব্দ প্রক্রিয়াকরণ (Word Pocessing) বলতে কোন ভাষার কম্পিউটারে ধারণ (Input), উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং মুদ্রণের প্রক্রিয়া বুঝিয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে একাধিক সফটওয়ার রয়েছে। গত শতাব্দীর আশির দশকে ওয়ার্ডস্টার এই কাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু সফটওয়ার বিকাশের সাথে সাথে পরবর্তী দশকের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ওয়ার্ডপারফেক্ট এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (MSword) বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপকতা লাভ করেছে।

শব্দ প্রক্রিয়াকরণ ভূগোলসহ যে কোন বিষয়ে সাধারণ ব্যবহারিক কাজ থেকে শুরু করে প্রতিবেদন মুদ্রণের কাজে ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।

উপরের আলোচনায় দেখা গেছে ভূগোলে কম্প্যুটার ব্যবহার প্রধানত: তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং উপস্থাপনা সংক্রান্ত। তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান পূর্বশর্ত হলো সঠিক তথ্যসংগ্রহ ও পরিবেশন করা। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে কম্পিউটারের নিজস্ব চিন্তা শক্তি নেই - এটি প্রকৃতপক্ষে নির্দেশপালনকারী যন্ত্র। কাজেই এই প্রক্রিয়ায় ভুলতথ্য সরবরাহ বা ব্যবহার করলে কম্পিউটার ভুল ফলাফল বা সিদ্ধান্ত (Output) দিবে। এ কারণে কম্পিউটার ব্যবহারে ভূবিদদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সাধারণত: ভূগোলে কম্পিউটার ব্যবহার শিক্ষা অর্জনে জন্য ব্যাপক গাণিতিক বা পরিসংখ্যানগত জ্ঞানের প্রয়োজন নেই - তবে এই জ্ঞান থাকলে ভাল হয়। যেহেতু ব্যবহারযোগ্য সমস্ত প্রোগ্রাম/সফটওয়্যার বর্তমানে পাওয়া যায় ও এর ক্রমাগত বিকাশ ঘটছে, সেহেতু এই সমস্তের ব্যবহারের নিয়মিত অনুশীলন এবং বিকাশের সাথে একজন ভূবিদের ক্রমাগত নিয়মিত পরিচিতি থাকা প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে একজন ভূগোল শিক্ষার্থীর dbase প্রোগ্রাম, শব্দ প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পর্কীয় বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে ভূগোলে ব্যবহৃত সফটওয়্যার অনুধাবনে সহায়ক হবে। ভূগোলে ব্যবহৃত কম্প্যুটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সম্বলিত উপকরণ ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে নিয়মিত অনুশীলনের জন্য ভাল ল্যাবরটরী অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অপরিহার্য।

পাঠ সংক্ষেপঃ

কম্প্যুটার নির্দেশ পালনকারী বা প্রোগ্রাম করা যায় এমন একটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র যা দ্বারা তথ্য নিবেশন, পরিচালনা, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এবং কক্ষিখত ফলাফল লাভ করা যায়। ব্যবহারিকভাবে কম্পিউটার দ্বারা ভূগোলে এখন স্বল্প সময়ে এবং নির্ভুলতার সাথে তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং উপস্থাপন সম্ভব। কম্পিউটার ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার ও উপস্থাপনের চারটি ধাপ হচ্ছে- (ক) পরিমাপ (খ) মানচিত্রায়ন (গ) পরিবীক্ষণ এবং (ঘ) মডেল নির্মাণ। কম্পিউটারে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় প্রধাণত: তথ্যরাজি বিন্যাস ও শ্রেণীকরণের মাধ্যমে। কম্পিউটার মানচিত্রায়ন, দূর অনুধাবন সমীক্ষা, সিম্যুলেশন নির্মাণ, ভৌগোলিক তথ্য সিসটেমস্ (Geographic Information Systems-GIS) এ সমস্তই পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ নির্ভর হতে পারে। জিআইএস হলো একটি সমন্বিত তথ্যসংগ্রহ, সংরক্ষণ, উপযোগীকরণ এবং উপস্থাপন করার কম্পিউটার-সহযোগী পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. শূণ্যস্থান পূরণ করুনঃ

১.১. ষাট দশকের শেষে ও সত্তর দশকের প্রথমে ভূগোলে .... ঘটে।
১.২. তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য .... ভূগোলসহ প্রায় সকল বিষয়ে এখন অপরিহার্য উপকরণ ।
১.৩. বিন্দু, রেখা ও আয়তনের তথ্য সমন্বয়ে মানচিত্রে স্থান ও কালভিত্তিক তথ্য সংযোজন করে .... তৈরি করা যায়।
১.৪. তথ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় তথ্যের .... বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
১.৫. কম্পিউটার মানচিত্রায়ন প্রধানত দুইটি পদ্ধতিতে অঙ্কন করা হয়: .... ও .... চিত্রলেখ অনুসারে।

২. সত্য হলে (স) মিথ্যা হলে (মি) লিখুনঃ

২.১. সত্তর দশকের শুরুতে প্রথমে ক্ষুদ্র কম্পিউটারের (Micro-Computer) প্রচলন শুরু হয়।
২.২. কম্পিউটার দ্বারা ভূগোলবিদরা এখন যেসব কাজ করছেন তা অন্য বা সনাতন পদ্ধতিতেও করা সম্ভব।
২.৩. কম্পিউটার ব্যবহার করে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পর তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না।
২.৪. SPSS একটি ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়ার।
২.৫. দূর অনুধাবন কৌশল অবলম্বনের ফলে ভূ-জরিপ কাজের গতি হ্রাস পেয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. কম্পিউটার মানচিত্রায়ন কি?
২. সুমুলেশন বলতে কি বুঝ?
৩. জিআইএস কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ভূগোলে পদ্ধতিগত বিকাশের ক্ষেত্রে কম্পিউটারায়ণের ভূমিকা আলোচনা করুন।
২. কম্পিউটার পদ্ধতি সহযোগে ভূগোলের তথ্য উপস্থাপনের পর্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. কম্পিউটার ভৌগোলিক তথ্য ব্যবহারের উপকরণ ও পদ্ধতিগুলির বিবরণ দিন।
৪. ভৌগোলিক তথ্য সিস্টেমের (GIS) আওতায় তথ্য ব্যবস্থাপনা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ইউনিট-৬

পাঠ-৬.১

১.১. বিক্ষেপ চিত্র, ১.২. সময়ভিত্তিক, স্থানভিত্তিক, ১.৩. গাণিতিক মাপনী।
২.১. স, ২.২. মি, ২.৩. স।

পাঠ-৬.২

১.১. তিন, ১.২. বর্গমূল, ১.৩. কম্পিউটার।
২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. স।

পাঠ-৬.৩

১.১. পরিমাত্রিক বিপ্লব, ১.২. কম্পিউটার, ১.৩. বিষয়ভিত্তিক মানচিত্র, ১.৪. নিরাপত্তা, ১.৫. ভেক্টর, রাষ্টার।
২.১. মি, ২.২. স, ২.৩. মি, ২.৪. মি, ২.৫. মি।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক ঃ অক্রম সংখ্যার সারণী

80 30	23 64	67 96	21 33	36 90	03 91	69 33	90 13	34 43	02 19
61 29	89 61	32 08	12 62	26 08	26 08	31 73	31 30	30 61	34 11
23 33	61 01	02 21	11 81	51 32	51 32	23 74	50 31	90 11	73 52
94 21	32 92	93 50	72 67	23 20	23 20	30 30	43 66	75 32	27 97
87 61	92 69	01 60	28 79	74 76	74 76	39 29	73 85	03 27	50 57
37 56	19 18	03 42	96 03	85 74	44 81	86 45	71 16	13 52	35 56
64 86	66 31	55 04	88 40	10 30	84 38	06 13	58 83	62 04	63 52
22 69	22 69	58 45	49 23	09 81	98 84	05 04	75 99	27 70	72 79
23 22	14 22	64 90	10 26	74 23	53 91	27 73	78 19	92 43	68 10
42 38	59 64	72 96	46 57	89 67	22 81	94 56	69 84	18 31	06 39
17 18	01 34	10 98	37 48	93 86	88 59	69 53	78 86	37 26	85 48
39 45	69 53	94 89	58 97	29 33	29 19	50 94	80 57	31 99	38 91
43 18	11 42	56 19	48 44	45 02	84 29	01 78	65 77	76 84	88 85
59 44	06 45	68 55	16 65	66 13	38 00	95 76	50 67	67 65	18 83
01 50	34 32	38 00	37 57	47 82	66 59	19 50	87 14	35 59	79 47
79 14	60 35	47 95	90 71	31 03	85 37	38 70	34 16	64 55	66 49
01 56	63 68	80 26	14 97	23 88	59 22	82 39	70 83	48 34	46 48
25 76	18 71	29 25	15 51	92 96	01 01	28 18	03 35	11 10	27 84
23 52	10 83	45 06	49 85	35 45	84 08	81 13	52 57	51 23	67 02
91 64	08 64	25 74	16 10	97 31	10 27	24 48	89 06	42 81	29 10
80 86	07 27	26 70	08 65	85 20	31 23	28 99	39 63	32 03	71 91
31 71	37 60	95 60	94 95	54 45	27 97	03 67	30 54	86 04	12 41
05 83	50 36	09 04	39 15	66 55	80 36	39 71	24 10	62 22	24 53
98 70	02 90	30 63	62 59	26 04	97 20	00 91	28 80	40 23	09 91
82 79	35 45	64 53	93 24	86 55	48 72	18 57	05 79	20 09	31 46
37 52	49 55	40 65	27 61	08 59	91 23	26 18	95 04	98 20	99 52
48 16	69 65	69 02	08 83	08 83	68 37	00 96	13 59	12 16	17 93
50 43	06 59	56 53	30 61	30 61	29 06	49 60	90 38	31 43	19 25
89 31	62 79	45 73	71 72	71 72	28 80	72 35	75 77	24 72	98 43
63 29	90 61	86 39	07 38	07 38	77 06	10 23	30 84	07 95	30 76
71 68	93 94	08 72	36 27	36 27	40 59	83 37	93 85	73 97	84 05
05 06	96 63	58 24	05 95	05 95	77 53	85 64	15 95	93 91	59 03
03 35	58 95	46 44	25 70	25 70	01 05	44 44	62 91	36 31	45 04
13 04	57 67	74 77	53 35	53 35	82 83	27 38	63 16	04 48	75 23
49 96	43 94	56 04	02 79	02 79	01 44	72 26	85 54	01 81	32 82
24 36	24 08	44 77	57 07	57 07	04 56	09 44	30 58	25 45	37 56
55 19	97 20	01 11	47 45	47 45	06 72	12 81	86 97	54 09	06 53
02 28	54 60	28 35	32 94	32 94	51 63	96 90	04 13	30 43	10 14
90 50	13 78	22 20	37 56	37 56	49 95	91 15	52 73	12 93	78 94
33 71	32 43	29 58	47 38	47 38	67 51	64 47	49 91	64 58	93 07
70 58	28 49	54 32	97 70	27 81	64 69	71 52	02 56	61 37	04 58
09 58	96 10	57 78	85 00	89 81	98 30	19 40	76 28	62 99	99 83
19 36	60 85	35 04	12 87	83 88	66 54	32 00	30 20	05 30	42 63
04 75	44 49	64 26	51 46	80 50	53 91	00 55	67 36	68 66	08 29
79 83	32 39	46 77	56 83	42 21	60 03	14 47	07 01	66 85	49 22
80 99	42 43	05 58	54 41	98 05	54 39	34 42	97 47	38 35	59 40
48 83	64 99	86 94	48 78	79 20	62 23	56 45	92 65	56 36	83 02
28 45	35 85	22 20	13 01	73 96	70 05	84 50	68 59	96 58	16 63
52 07	63 15	82 30	66 23	14 26	66 61	17 80	41 97	40 27	24 80
39 14	52 18	35 87	48 55	48 81	03 44	26 99	03 80	08 86	50 42

গ্রন্থপুঞ্জি

১) Boyce, R.R. and Clark, W.A.V 1964. The concept of shope in geography. Geographical Review. 54:561-572.

২) Clarke, P.J. and Evans, F.C 1954. Distance to merest-neighbor as a measure of spatial relationship in population. Ecology. 35:445-353.

৩) Cole. J.P and king, C.A.M. 1968. Quantitative Geography. Chichester, Wiley. Dept. of Envivoment, 1987. Handling Geographical Information. London, HMSO. Ebdon, D, 1985. Statutes in Geography London: Basil Blackwell.

৪) Hammered, R. and Introduction. Oxford: Clarion.

৫) King. J.J. 1969. Statistical Analysis in Geography. England: Paretic-He LRP. 1984. Lard Reclamation Project: Report. Dhaka: LRP/BWDB.

৬) Merger, D.J. 1989. Computer in Geography. London: Long men.

৭) Net, D.S. 1966. Statistical Analysis for Spatial Distributions. Philadelphia: RSRI.

৮) Pervades, N.J. 1963. Political Geography. NewYork.

৯) Rashid. S. and Ali, M.M. 1997. Status of Gis Activites in Bangladesh: a review. Oriental Geographer. 41(1): 64-77.

১০) Rhind, D.W. 1988. Computing, academic Geography and the outside world, in: McMillan, W.I. 1981(ed). Remodeling Geography. Oxford: Basil Blackwell.

১১) Taylor, P.J. 1971. Distance within shape: an introduction to a family of finite frequency distribution. Geografiska Annular, B.53:40

১২) ইলাহী. ম. ১৯৯১। পরিসংখ্যান পদ্ধতি এবং স্থানিক বিশ্লেষণ। ঢাকা: একাডেমিক।

১৩) করিম.রে. ১৯৯৮। ভৌগোলিক তথ্য সিস্টেম পদ্ধতি। খুলনা:খ.বি.।

১৪) রউফ. কা. আ. এবং ইলাহী. ম. ১৯৯৩। সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ। ঢাকা: সুজনেষু।

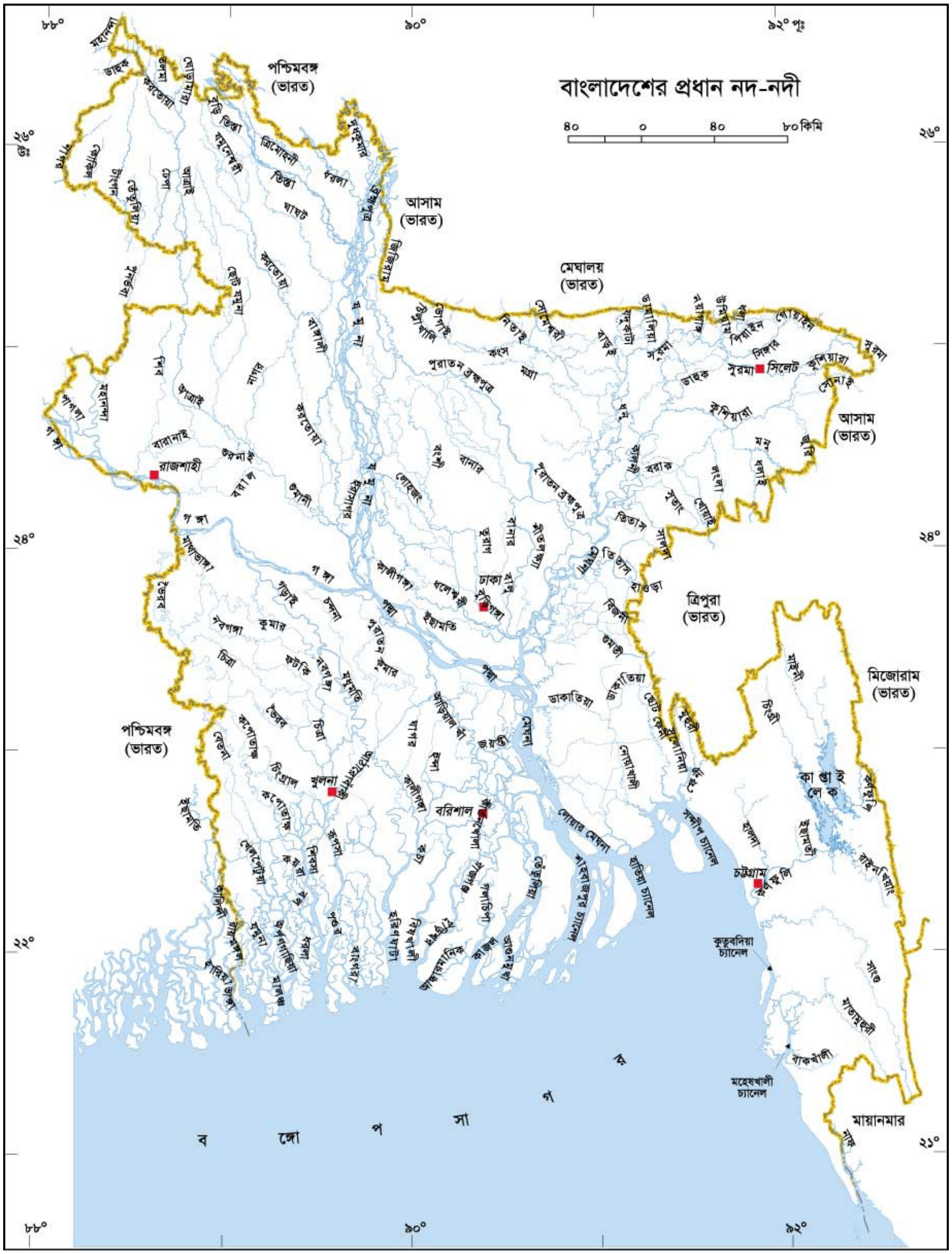
বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী
৪০ ০ ৪০ ৮০কিমি
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
মেঘালয় (ভারত)
ত্রিপুরা (ভারত)
মিজোরাম (ভারত)
মায়ানমার
রাজশাহী
সিলেট
ঢাকা
খুলনা
বরিশাল
চট্টগ্রাম
কাপ্তাই লেক
কুতুবদিয়া চ্যানেল
মহেষখালী চ্যানেল
ব ঙ্গো প সা গ র
৮৮°
৯০°
৯২° পূঃ
২৬° উঃ
২৪°
২২°
২১°